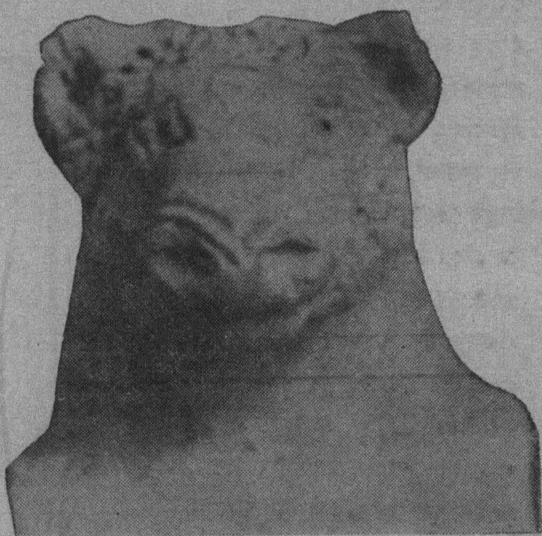
বাদ্য ও সংস্কৃতি

বাঘ ও সংস্কৃতি



চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির
ব্যাঘ্রমূর্তি [খৃঃ পূঃ ২য়-১ম শতক]

'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



ভাণ্ডারণী বা ভাণ্ডাণী ॥ উত্তরবঙ্গের অরণ্যদেবী

বাদ্য ও সংস্কৃতি

: মুখবন্ধ :

ড. নীহাররঞ্জন রায়

শ্রীসনৎকুমার মিত্র
অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ : নব ব্যারাকপুর

সম্পাদিত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯



গাজী ও বৈষ্ণবের যুদ্ধ। গাজীরপট।



সোনারায় ॥ মালদহ।

প্রথম প্রকাশ :
বড়দিন ১৯৮০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
শ্রীতপন কর

মানচিত্র ও রূপসজ্জা :
শ্রীমতী মহুয়া মিত্র

'পুস্তক বিপণি'-র পক্ষে শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার কর্তৃক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক ১৩।১ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বাঘের পিঠে গুণিন। ঝাঁপান, বাঁকুড়া।



ফালাকাটা রাজাদ্বয়। বাঁপাশে বাঘ বসে আছে উত্তরবঙ্গ।

যাঁদের কাছ থেকে সহোদর অগ্রজের অধিক

স্নেহ-ভালোবাসা ও আশিস্ পেয়েছি

ড. শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্ত

ও

ড. শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত

করকমলেষু



বীরুবাগ। উত্তরবঙ্গ।

● সম্পাদকের লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থ ●

: প্রকাশিত : রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ॥ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা ॥ কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস [সম্পাদিত] ॥ আসন্ন-প্রকাশ : পশ্চিমবঙ্গের লোক-সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র ॥ বাংলা গ্রাম্য-নাট্য ॥ *Folk Life and Lore of West Bengal.*



যাজিদণ্ড বাঘ মুখ॥ উপর থেকে দ্বিতীয়।

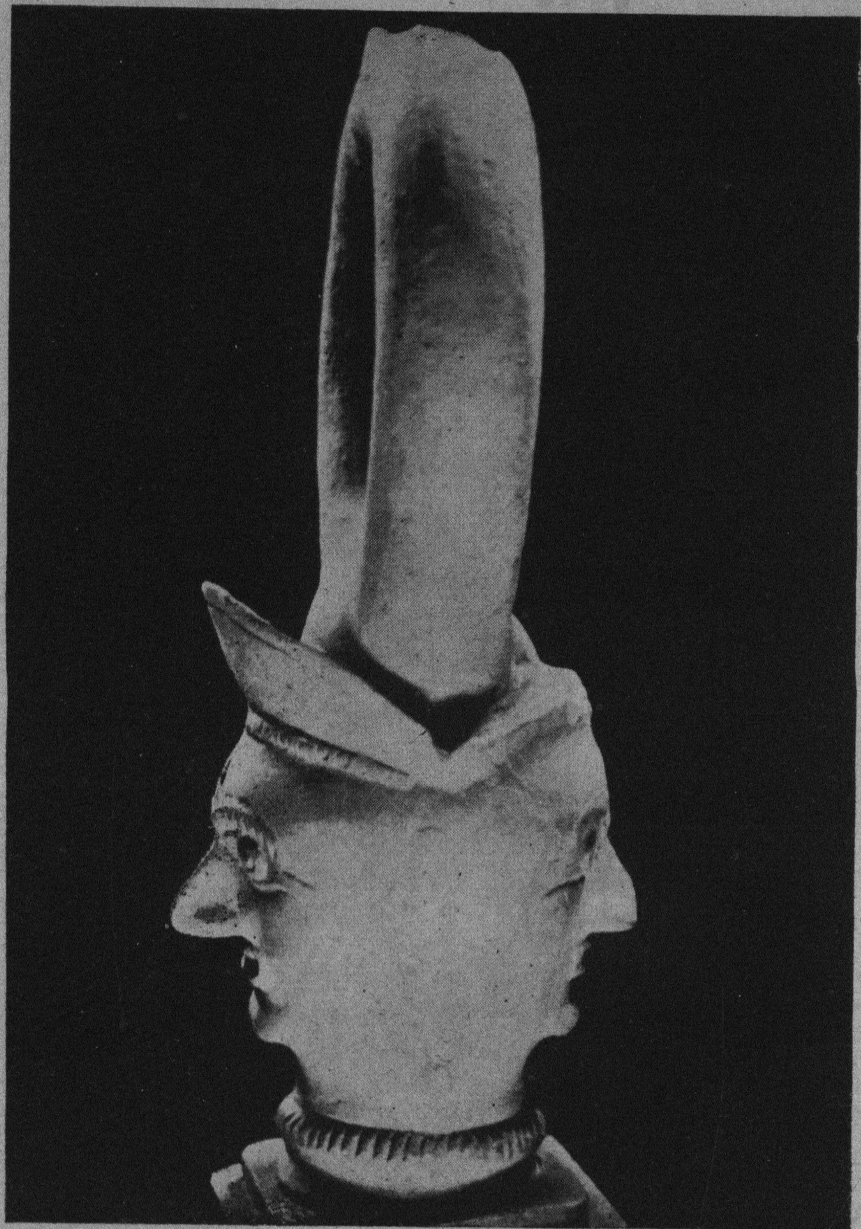
সম্পাদকের কথা

অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে অবশেষে 'বাঘ ও সংস্কৃতি' প্রকাশিত হলো। এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ। এই সংকলনটিকে সম্পাদনা করার কাজ হাতে নিয়ে দেখতে পেরেছি যে বাঘ-নিয়ে কাজ করার সুপ্রচুর উপাদান ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এমন একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় নিয়ে একক বা যৌথ উদ্যোগে সর্বতোভাবে কাজ করার কথা ইতোপূর্বে আর কেউ ভাবেন নি। ফলে, এ-বিষয়ে পরিকল্পনা-মাফিক যত অগ্রসর হয়েছি ততই এর অভিনবত্ব ও মৌলিকত্বে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এত করেও সাধ ও সাধ্যে মেলানো গেলো না। ফলে, সংকলন সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও মনে হচ্ছে যে বঙ্গের ব্যাঘ্র-বিষয়ক বিশ্বাস নিয়ে নতুন ভাবনা উদ্রেককারী আরও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতো। এই অতৃপ্তি আগামী ভবিষ্যতে পূরণ করবো—এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এই সামগ্রিক দুর্যোগের দিনে আর কি-ই বা করা যেতে পারে।

এই সংকলনকে মূলত দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমাংশে রয়েছে বেশ অনেক দিন আগে থেকে বাঘ কি ভাবে আমাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে আবিষ্ট করে রয়েছে তার আলোচনা—যা পূর্ব-প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত-মনীষাজাত। পরবর্তী অংশে সুহৃদ গবেষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্ষেত্র-গবেষণা থেকে যা পেয়েছেন তাকেই যুক্তি-ঋদ্ধ করে উপস্থিত করেছেন।

'বাঘ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক এই পরিকল্পনা ও তার ছাপা ফাইলগুলি নিয়ে সাহসে ভর করে শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কাছে গেলে তিনি সস্নেহে যে 'মুখবন্ধ' রচনা করে দেন তা আমাদের কাছে পরম গৌরবের ধন। এই সংকলনের সূচনায় সেটিকে মুদ্রিত করতে পারা একান্তই শ্লাঘার বিষয়।

এই গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন স্তরে নানা জনে নানা ভাবে উপদেশ এবং সাহায্যদান করেছেন। এঁদের মধ্যে আমার শিক্ষাগুরু ড. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সস্নেহ শিক্ষা এ-বিষয়ে আমাকে আরও একটি দৃঢ় পদক্ষেপ করতে অনুপ্রাণিত করলো। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ও এই কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ ও নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন।



জানুস দেবতার মুণ্ডমূর্তি [ইটালী]

সহোদর ছোট ভায়ের সম্বন্ধে যে স্নেহ-ভালোবাসা-উদ্বেগ মানুষ অনুভব করে তার চেয়েও বেশী যাঁরা আমার সম্বন্ধে পোষণ করেন সেই অগ্রজপ্রতিম দম্পতি ড. শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত এবং ড. শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্ত-এর হাতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলটিকে অর্পণ করে আজ আমার মনে বড়ই তৃপ্তি। সর্বদা শুভাকাঙ্ক্ষী ড. অরুণ বসু ও শ্রীমতী অর্চনা বসুকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রয়াত কালিদাস দত্ত-র প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় তাঁর পুত্র শ্রীঅমলকুমার দত্ত মহাশয়ের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এখানে আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ড. শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত-র সহায়তা, পরামর্শ ও আন্তরিকতাকে স্মরণ না করলে অন্যায় হবে। এই গ্রন্থ-প্রকাশের পটভূমিতে তিনি প্রায় অনস্বীকার্য। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'-র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু ও বন্ধুবর শ্রীঅসীমরঞ্জন কর তাঁদের অকৃপণ সম্প্রীতি থেকে এবারেও আমাকে বঞ্চিত করেন নি।

দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্র-সম্পৃক্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে কাজ করতে গিয়ে আমাকে বারে বারে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে। এই বিষয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৪ পরগণার বনবিভাগের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই ক্ষেত্র-গবেষণাকালে গৃহীত বেশ কিছু আলোকচিত্র অর্থকৃচ্ছ্রতার কারণে এবারে ব্যবহার করতে পারলাম না। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কিছু করার ইচ্ছে রইলো।

আমাদের কলেজের গ্রন্থাগারের তিন কর্মকর্তা শ্রীঅসিত ব্রহ্ম, শ্রীজয়দেব কর্মকার ও শ্রীহারাধন ভট্টাচার্য পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ায় তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। নবীন প্রকাশক শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যে দায়িত্ব ভারগ্রহণ করেছেন তা, এক কথায় দুঃসাহসিক। এ-জন্য তিনি সুধীজনের ধন্যবাদার্হ—আমাদের তো বটেই! শ্রীঅমলেন্দু শিকদার ও জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কসের বন্ধুবর্গের ঋণও অপরিশোধ্য।

গ্রন্থে ব্যবহৃত কয়েকটি আলোকচিত্রের জন্য আমি 'গুরুসদয় সংগ্রহশালা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'আশুতোষ সংগ্রহশালা' এবং 'লোকযান' পত্রিকার কাছে ঋণ স্বীকার করি। অন্যান্য আলোকচিত্র সম্পাদক-কর্তৃক গৃহীত।

বড়দিন ১৯৮০ শ্রীসনৎকুমার মিত্র



বনবিবি ॥ দক্ষিণবঙ্গের অরণ্যদেবী



ব্রতের আলপনা : কিশোরগঞ্জ [দক্ষিণবঙ্গের বারামুণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক]

মুখবন্ধ

পণ্ডিতেরা দেশকালবদ্ধ, পরিবর্তমান মানব-সমাজের ধ্যান-ধারণার ইতিহাসানুসন্ধানের নানা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অনেক উপায়ের মধ্যে কোন কোন পশুপক্ষীর প্রতি কোন কোন মানব-গোষ্ঠীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ কতটা, কতটা বা প্রীতি ও স্বীকৃতি বা তার বিপরীত ইত্যাদির বিচার ও বিশ্লেষণ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অন্যতম। বাঘ নামে পরিচিত বন্য, হিংস্র প্রাণীটির প্রতি ভারতীয়, বিশেষ ভাবে বাঙালী মানসের রূপকল্প, ধ্যান-ধারণা কি ছিল এ-নিয়ে কোন কোন গবেষক কিছু কিছু অনুসন্ধান করেছেন এবং নিবন্ধাকারে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধও করেছেন। প্রীতিভাজন সনৎকুমার মিত্র মশায়-সম্পাদিত 'বাঘ ও সংস্কৃতি'—গ্রন্থখানা এই ধরণের কয়েকটি প্রকাশিত, কিন্তু অধিকাংশই এ যাবৎ অপ্রকাশিত নিবন্ধের একটি সংকলন-গ্রন্থ। এ গ্রন্থের দু-টি নিবন্ধের পটভূমি সমগ্র ভারতবর্ষ, বাকী সব নিবন্ধের পটভূমি বঙ্গভূমি এবং বাংলা ভাষাভাষী বাঙালী সমাজ। কিন্তু তা'তে কিছু ক্ষতি নেই, যেহেতু পশুপূজার বিস্তৃত সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই নিবন্ধগুলি রচিত। তবু, এ-তথ্য পরিষ্কার যে, বাঙালী-মানসে বাঘের যে-প্রভাব ও বিস্তার তা বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না। কারণ যে কি, তা তো সহজেই অনুমেয়।

একথা সত্য যে, পশুরাজ বলা হয় সিংহকেই, বাঘকে নয়। তবু বোধ হয় তর্ক করা যেতে পারে যে বাঘের মত ভয়ানক ও দুর্দ্ধর্ষ অথচ একই সঙ্গে এত সুন্দর ও অভিজাত বন্য প্রাণী আর নেই, অন্তত আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে। বাঘের চলার ছন্দ রাজকীয়—তার দৌড় ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে তুলনীয়, তার উল্লম্ফন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অতিকায় স্প্রীং-এর মত। সিংহ সম্ভবত খুব আদিতে ভারতবর্ষের



দক্ষিণ রায় ॥ ধপধপি, ২৪ পরগণা



বড় খাঁ গাজী ॥ ২৪ পরগণা

অধিবাসী ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতার কালে, অর্থাৎ আজ থেকে আনুমানিক ৭৫০০ হাজার বছর আগে এদেশে সিংহ ছিল, এমন প্রমাণ নেই, কিন্তু বাঘ যে ছিল সে-প্রমাণ বিদ্যমান; শ্রীমান পল্লব সেনগুপ্ত-এর নিবন্ধটিতেই সে-সাক্ষ্য আছে। মনে হয়, সিন্ধু-সভ্যতা বিলুপ্তির পর কোন এক প্রাচীন কালে, খুব সম্ভব আফ্রিকা অঞ্চল থেকে, বর্তমান ভারতীয় সিংহের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসে থাকবে। তবে, তার রাজকীয় আকৃতি-প্রকৃতি ও অমিত পরাক্রম ভারতীয় মানসে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করতে খুব একটা সময় নিয়েছিল বলে মনে হয় না। বিক্রমশালী পুরুষের পুরুষসিংহ বলে পরিচয়, শাক্যকুলের গৌরব গৌতমের শাক্যসিংহ বলে পরিচয়, সিংহাসন, সিংহদ্বার-প্রভৃতি পদের ব্যবহার ইত্যাদি তো খ্রীস্টপূর্ব প্রায় পাঁচ-ছ' শ'বছর আগেকার ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যেই পাওয়া যায়। তা-ছাড়া, পার্থিব ও ধর্মীয় শক্তি ও প্রভুত্বের প্রতীক হিসেবে যে-সব বন্য প্রাণীর মর্যাদা সম্রাট অশোকের আগেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার ভেতর সিংহ ও ষাঁড়ই প্রধান; সে-তালিকায় বাঘের স্থান নেই। সর্বত্র দেখছি সিংহেরই জয়জয়কার। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতিতে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমায় সিংহই প্রায় সর্বত্র পরিকীর্তিত, সংস্কৃত সাহিত্যে তো বটেই। বাঘের স্থান এ-সব ক্ষেত্রে স্বল্পই, আপেক্ষিক ভাবে প্রায় নেই বললেই চলে।

অথচ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে লোক-সাহিত্যে-গাথায়, ছড়ায়, প্রবাদে, লোকায়ত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, গল্প-কাহিনীতে অহরহ যে বন্য প্রাণীটির সাক্ষাৎ মেলে সেটি সিংহ নয়, বাঘ। এই বাঘই যেন লোকায়ত বাঙালীর কল্প-মানসকে ছেয়ে আছে। তাকে আশ্রয় করে ভয়ভীতি যেমন, হাস্য-পরিহাসও তেমনই। আর, এই বাঘকে নিয়েই চাষবাস থেকে সুরু করে ব্রতাচার পূজার্চনা পর্যন্ত জীবনের যত ক্রিয়াকর্ম। একটি, বন্য, হিংস্র পশুকে এমন করে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ



যুগ্ম বাবা ॥ ২৪ পরগণা



আফ্রিকার আদিম জাতির মুখোশ।

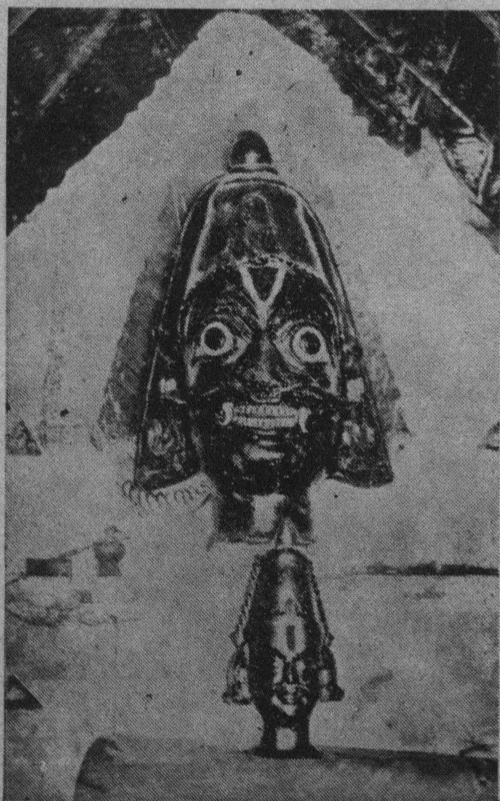
করা, এ-ধরণের দৃষ্টান্ত মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব বেশি নেই। আর, এই জীবন ছড়িয়ে আছে উত্তরতম বঙ্গভূমি থেকে শুরু করে দক্ষিণতম সমুদ্রশায়ী গ্রাম পর্যন্ত।

এই সংকলন-গ্রন্থটিতে ব্যাঘ্রাশ্রিত এই জীবনেরই একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে। ইতি

কলকাতা
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮০



প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইস্টার দ্বীপের মুণ্ডরূপী যুগ্ম দেবতা।



কুট্টন দেবর ॥ তামিল নাড়ু।

● সূচীপত্র ●

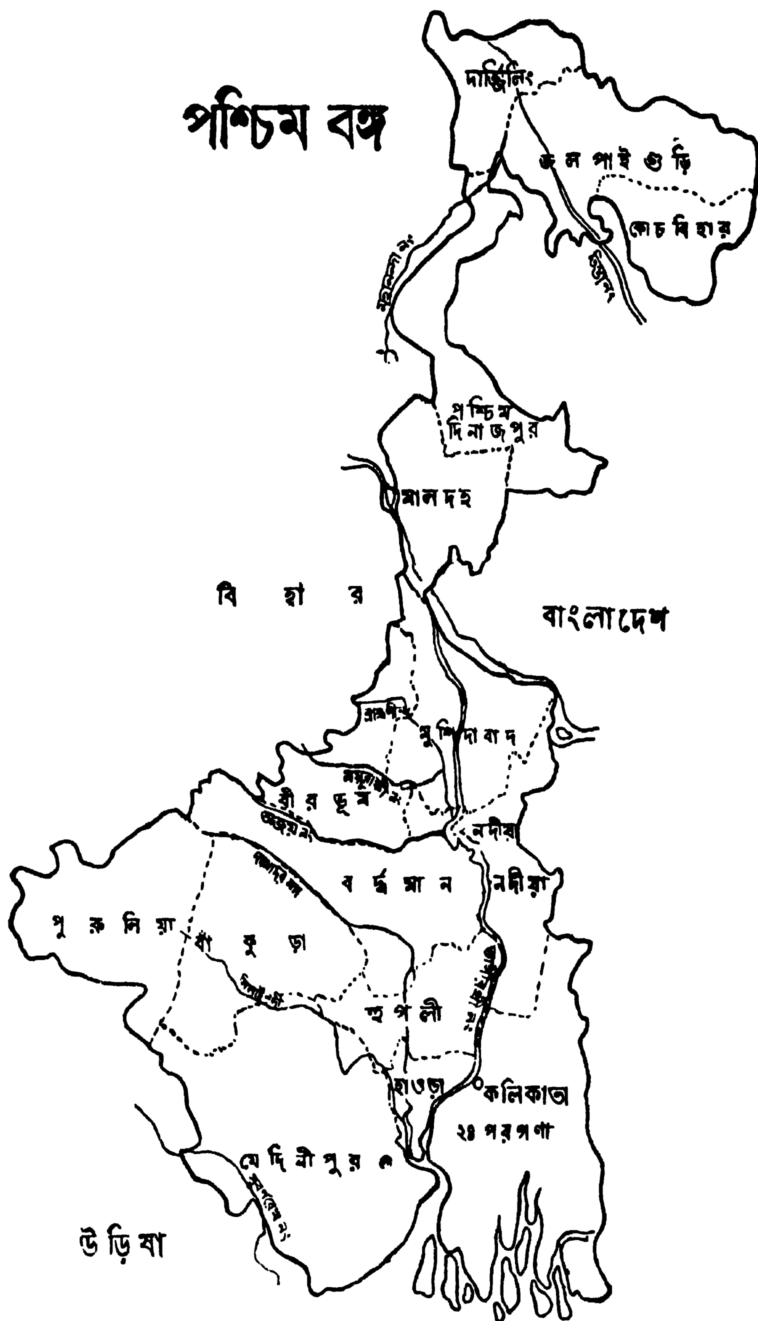
পূর্বসূত্র : এক থেকে ছাপান্ন

অনুসূত্র : ১-২৬০

পরিশিষ্ট : ২৬১-২৭৮

চিত্রসূচী

পূর্বসূত্র


পশ্চিম বঙ্গ
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
বিহার
বাংলাদেশ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
নদীয়া
বর্দ্ধমান
নদীয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
২৪ পরগণা
মেদিনীপুর
উড়িষা

পশুপূজা: বাঘ

উইলিয়ম ক্রুক [১৮৪৪—১৯২৬]

এক.

উত্তর ভারতের লোক-কাহিনীতে বাঘ তার স্বভাববশেই বহুক্ষেত্রে সিংহের উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেছে। তুলনামূলক লোক-পুরাণবেত্তাদের মতে, প্রচ্ছন্ন সূর্য-সদৃশ সিংহের মতই বাঘ এবং চিতাও অনেক সময়েই বিচিত্র সব অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়। যেমন: দিওনিস্যুস ও শিব—এঁরা দু-জন পরিপূর্ণভাবে শিশ্ন দেবতার প্রতীক হিসেবেও গৃহীত হয়ে আসছেন।[১] এটা সত্য যে, শিব যোগীবেশ ধারণ করে ব্যাঘ্রচর্মের ওপর আসীন,—সচরাচর এ-ভাবেই তিনি উপস্থাপিত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁব স্ত্রী দুর্গা স্বয়ং এই প্রাণীটিকেই নিজের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সূর্য-সংশ্লিষ্ট পৌরাণিক মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিশ্বাস আছে যে, ডাইনীরা বহু সময়েই ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে, তাদেরকেও ঐ জন্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করতে হয়।

টোটেম বা কুলকেতু পূজার উৎস থেকেই সম্ভবত ব্যাঘ্র উপাসনার সূচনা। যেমন, বাঘেলী রাজপুতেরা বংশ-পরিচয় সূত্রে দাবী করেন এবং তাঁদের ঐ গোষ্ঠী-পরিচয়ের উৎসে রয়েছে তাঁদেব কুলকেতু বাঘ। মধ্য ভারতের এই জাত কোন সময়েই ঐ প্রাণী নিধন করেন না। অনুরূপে, একমাত্র আত্মরক্ষার্থে বা ব্যাঘ্রকর্তৃক কোন বন্ধু বা আত্মীয় সদ্য-নিহত না হলে, কোন পরিস্থিতিতেই একজন সুমাত্রাবাসী বাঘকে আঘাত বা হত্যা করতে প্রয়াসী হন না। যখন একজন য়ুরোপীয় ওদের দেশে বাঘের জন্য ফাঁদ পাতেন, শোনা যায় যে তখন নাকি আশে-পাশের লোকেরা রাত্রে সেখানে যান এবং বাঘকে উদ্দেশ করে বলেন যে, তাঁরা এই ফাঁদ পাতেন নি, এবং এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে তাঁদের মতও এই ক্ষেত্রে নেওয়া হয় নি। ভীল এবং রাজপুতানার 'বঘ্রাবত্' বংশীয়রা ব্যাঘ্র-বংশজাত বলে দাবী করেন।[২]

বাঘ-পূজা সম্পর্কে আরও একটি ধারণা আছে যে সে নাকি কোনো মানুষকে খেয়ে ফেলবার পরে তার আত্মাকেও বহন করতে থাকে। এ-জন্যেই

মানুষ-খেকো বাঘ নাকি মাথাটা ঈষৎ বাঁকিয়ে চলে ; কারণ, নিহতের অশরীরী আত্মা তাকে তখন ভর করে এবং তারই ভারে সে ন্যুব্জ হয়ে যায়।[৩] বদমেজাজী যাদুকরও নাকি বাঘের ছদ্মবেশে ঘোরে—এমন বিশ্বাস বহুল প্রচলিত। য়ুরোপের লোক-বিশ্বাসে মানুষ-নেকড়ে সম্পর্কিত লৌকিক ধারণারও ভিত্তি ঐ একই। মানুষ-নেকড়ের উদ্ভব সংক্রান্ত বৃত্তান্তের কোনোটির সঙ্গেই অন্যটি মেলে না। একটি বর্ণানুসারে দেবতার উদ্দেশে বলি-প্রদত্ত মানুষ ও পশুর অন্ত্র-সংমিশ্রণ করে উপাসকরা তার সবটুকুই খেয়ে ফেলবার সময় যে লোকটি অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্ত্র ভক্ষণ করে সে-ই নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়। অন্য একটি বর্ণনানুসারে একটি পরিবারের সকলের ভাগ্য পরীক্ষাকালে যার ওপর নিয়তির দৃষ্টি পড়ে, সেই হয় নেকড়ে-মানুষ। কেউ যদি কোনো পার্বত্যহ্রদের পাশে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে একটি ওক গাছে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে সেই হ্রদে ডুব দেয় এবং সাঁতরে ওপারের বিজন ভূমিতে চলে যায়, তবে সে নেকড়েতে রূপান্তরিত হয় এবং নেকড়েদের সঙ্গে ন-বছর থাকে। আর যদি এই ন-বছরের মধ্যে কখনও মানুষের রক্ত আস্বাদন করে, তবে তার আর কখনও নেকড়ে জীবনের অবসান ঘটে না। অন্যপক্ষে, যদি এই ন-বছরের মধ্যে সে কোনও মানুষ শিকার না করে তবে দশম বছরে সে আবার মানুষের স্বরূপে ফিরে আসে। কঙ্গোর খাঁড়িতে একটি নিগ্রো পরিবার আছেন যাঁরা নাকি এমনই শক্তিধর যে বনের ঘনান্ধকারে আপনা থেকেই নেকড়েতে রূপান্তরিত হতে পারেন। নেকড়ে-রূপে তাঁরা মানুষকে ধরাশায়ী করতে পারেন, কিন্তু কোন ক্ষতি করেন না। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যদি নেকড়েরূপে একবার রক্তলেহন করে, তা-হলে তাদের চিরকালই নেকড়ে-রূপেই থেকে যেতে হবে।[৪]

ঠিক এই রকম কারণেই ভারতের বনবাসী, অ-সভ্য মানুষেরা পথে বাঘের দেখা পেলেও তার নাম কখনও উচ্চারণ করেন না,—'গিধর', 'জানওয়ার' প্রভৃতি স্তুতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করেন। নেকড়ে ও ভাল্লুক সম্পর্কে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই এমনটি করে থাকেন এবং যদিও তাঁরা নিজেরা এই প্রাণীহত্যায় দ্বিধা করেন, কিন্তু শিকারীদের দ্বারা ধ্বংস করতে এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করেন এবং হত্যার পর আনন্দোল্লাস করেন। একজন শিকারী যাবার সময় রাস্তায় একটি ডাল ভেঙ্গে বলবেন: 'তোমার প্রাণ যেমন বহির্গত হলো, তেমনি বাঘেরও তাই হোক'। বাঘকে শিকার করবার পর তারা কিছু মদ

নিয়ে প্রাণীটির মাথায় ঢালবে আর বলবে: 'মহারাজ! আপনি জীবৎকালে গবাদিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, কোন মনুষ্য-প্রজাকে আহত করেননি ; এখন আপনি মৃত, আমাদের রক্ষা করুন ও আশীর্বাদ করুন'। অকোলা-র মালীরা, বাঘ বা নেকড়ে তাদের বাগিচার মধ্যে আশ্রয় নিলেও, সে সংবাদ তাঁরা কোন শিকারীকে দিতে চায় না। কারণ, তাঁদের একটি সংস্কার আছে যে, যে মুহূর্তে সেখানে এর কোন একটি প্রাণীর বিনাশ ঘটবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাবে। জাপানের উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী 'আইনো' [Aino]-রাও ভাল্লুক ধরা পড়লে বা তীরের দ্বারা আহত হলে অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করে থাকে।[৫]

নেপালে বাঘকে উপলক্ষ করে 'বাঘযাত্রা' নামে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়,—এখানে উপাসকেরা বাঘের ছদ্মবেশ ধারণ করেই নৃত্য করে।

দুই. বন্য জাতি-সমূহের ব্যাঘ্রপূজা

স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন বন্যজাতির মধ্যে বাঘপূজা খুবই ব্যাপকরূপে প্রচলিত আছে। যেমন মির্জাপুরের বন্যজাতির মধ্যে বাঘ-দেবতা 'বাঘেশ্বর'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে ; তেমনি, সাঁওতালরা তাঁর পূজা করেন এবং কিষাণরাও তাঁকে মানেন 'বনরাজ' বা বনের অধিপতিরূপে। তাঁরা তাঁকে হত্যা করেন না, এবং বিশ্বাস করেন যে, ভক্তির বিনিময়ে তিনি তাঁদের রক্ষা করবেন। এই উপজাতির আর একটি শাখা তাঁর পূজা করেন না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁর নামে শপথ নিয়ে থাকেন। অন্যপক্ষে, ভূঁইয়ারা তাঁর প্রতি কোনই সম্ভ্রম দেখায় না, নিজেদের প্রয়োজনে সুযোগ পেলেই তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করেন। জুয়াং-রা বল্মীকস্তূপ বা বাঘের চামড়ার ওপরে দাঁড়িয়েই তবে কোন শপথ নেয়। বল্মীকস্তূপ খড়িয়াদের কাছে পবিত্র বস্তু এবং হো বা সাঁওতালদের শপথ নেওয়াবার সময় বাঘের চামড়া আনা হয়। পূর্বাঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যে বাঘ পূজিত হয়, কিন্তু রামগড়ে একমাত্র যাঁরা পশুর হিংস্রতার ভুক্তভোগী তাঁরাই বাধ্য হয়ে তার পূজা করেন। বাঘ যদি একটি মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, 'বাঘ-ভূত' তখনই পূজিত হন' এবং বাঘের চামড়া নিয়ে শপথ করা তখন একটি অতি পবিত্র-কর্ম'বলে গণ্য হয়।[৬]

তিন. ব্যাঘ্র-উপদেবতা : 'বাঘদেও'

আরও পশ্চিমে হোসঙ্গাবাদ-এর কুরকু-রা ব্যাঘ্র-উপদেবতা 'বাঘদেও' [Bagh Deo]-এর পূজা করেন,—বেরারে যাঁর পরিচিতি 'ওয়াঘ [=বাঘ] দেও' [Wāgh Deo] রূপে। বেরার-এর পেত্রিতে ব্যাঘ্রদেবী ওয়াঘাই [বাঘাই] দেবীর এক ধরণের পূজা-বেদী আছে। এ-স্থানটিতে এক সময়ে কোন এক গোন্দ্ নারী বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বলা হয় যে : কোনো অলৌকিক শক্তিবলে সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং যে সমস্ত গোন্দ্ কোন বন্য-প্রাণীর হাত থেকে নিরাপত্তা পেতে চান, তাঁরা গরু ও তন্নিম্ন স্তরের সমস্ত রকমের প্রাণীকে সেই বেদীতে উপচার হিসেবে উৎসর্গ করেন। একজন গোন্দ্ সেই মন্দিরে পৌরোহিত্য করেন এবং পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

হোসঙ্গাবাদ-এ ভোমকা [Bhomka] হলেন 'বাঘদেও'-র পুরোহিত। "তাঁর ওপর বাঘকে গ্রাম-সীমানার বাইরে রাখার ভয়ঙ্কর দায়িত্ব বর্তায়। বাঘ কখনও গ্রামে প্রবেশ করলে, ভোমকা বাঘদেও-র শরণ নিয়ে, দেবতার উদ্দেশে পূজোপচার নিবেদন করেন এবং তিনি সমগ্র গ্রামবাসীর হয়ে প্রতিশ্রুতি দেন যে আগামী অনেকগুলি বছরই তিনি এই ধরণের পূজোপচার নিবেদন করে যাবেন এবং তা-এই শর্তে যে, বাঘ-দেবতা যেন এই রকম ভাবে গ্রামে আর প্রবেশ না করেন। বাঘও তার দিক থেকে, দেবতার সমান সম্মানে উপনীত,—বিধিসম্মত শর্ত রক্ষা করার কাজ থেকে বিরত থাকেন না। কারণ, সে হলো যথার্থই বিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণ সম্মাননীয় পশু, 'অধিকন্তু সৎ'—ম্যাণ্ডেভিল [Madeville]-এর ভাষায়—নেকড়ের মত অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসঘাতক নয়, যাকে কোন শর্তই বাঁধতে পারে না। আরও শক্তিশালী যাদু বিশ্বাসী কিছু ভোমকা অবশ্য বাঘের প্রচলিত মান্যতার ওপর নির্ভর করতে না পেরে বাঘদেওর প্রতি আরও মনঃসংযোগ করে থাকে এবং এই রকম ভোমকাকে দেখা গিয়াছে যে, যার সামনে যথার্থই ভালমানুষের মত দুই বা তিনটি বাঘ গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে, আর সে বিড়্‌বিড়্ করে তার জাদুমন্ত্রোচ্চারণ করছে। কালীভীত্ ভোমকার [এখন (১৮৯৬) বিগত] শক্তি এর চাইতেও অলৌকিক ছিল। ব্যাঘ্রকুলের লুই নেপোলিয়ন—এই প্রজাতির সবচেয়ে রক্তপিপাসু একটির ওপর ভ্রমক্রমে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করার মাশুল স্বরূপ তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, নিহত হন। তাঁর একটি সুন্দর সাজ [Sāj] গাছ ছিল, যার মধ্যে, যখন সে মন্ত্রোচ্চারণ করত, একটি পেরেক বা নখ ঢুকিয়ে

দিত। বাঘ এসে এর ওপর তার বিশাল থাবার ছাপ দিয়ে চুক্তিটির বৈধতা সম্পন্ন করত। এই ভাবেই সেই 'খঞ্জ তৈমুর' তার পাশবিক চিহ্নের ছাপ এঁকে দিতে গিয়ে তার শক্ত থাবাটি ঐ ভোমকার রক্তে রঞ্জিত করেছিল"।[৭]

ঠিক এই ভাবেই মধ্যপ্রদেশের আরেকটি অঞ্চলে গ্রামীণ জাদুকরেরা বলে থাকেন যে,—তাঁরা বন থেকে বাঘ ডেকে নিয়ে এসে, তাদের কাণ ধরে, এবং কাণে কাণে কথা বলে, তাদের লোভ নিয়ন্ত্রিত করে—গ্রামের কাছে না আসবার নির্দেশ দিতে পারে অথবা তারা এক ধরণের শিকড়ের কথা জানেন বলে ভাণ করেন যা পুঁতে দিয়ে বন্য পশুদের মানুষ বা গবাদি পশু ভক্ষণ করা থেকে বিরত করতে পারে। সেই একই লক্ষ্য নিয়ে তারা পালঙ্কের একটি প্রতিরূপ বা অন্য কিছু রাস্তায় রাখে, এই বিশ্বাসে যে, এগুলোর সম্মোহন শক্তি বাঘের আসার পথকে বন্ধ করবে।

চার. মৃত বাঘের যাদু শক্তি

বাঘের মৃত্যুর পর তার ওপর সমস্ত রকম যাদু বিশ্বাস আরোপিত হয়। তার দাঁত, নখ, গোঁফ ইত্যাদি যাদু শক্তির জন্যে মূল্যবান্। এ-গুলি প্রণয়োদ্দীপক এবং অশুভশক্তি, কু-দৃষ্টি, রোগ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রতিষেধক রূপে গণ্য হয়। বাঘের দুধ মূল্যবান্ ঔষধ এবং কোন নায়ককে যাচাই করবার জন্যে—ঈগলের ডানা, মৃত্যুকূপের জল, দানো বা রাক্ষস পরিবৃত অলৌকিক গরু প্রভৃতি প্রচলিত অসম্ভব বস্তুর মত, সেটি সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়।[৮] বাঘের চর্বি, বাত এবং অনুরূপ ব্যাধির মূল্যবান্ ঔষধরূপে গণ্য করা হয়। হৃদ্‌যন্ত্র ও মাংস বলবর্ধক, উত্তেজক এবং কামোদ্দীপক, এবং যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের শক্তি এবং সাহস সঞ্চারিত হয়। আসামের মিরি-রা বাঘের মাংস পুরুষের উপযুক্ত খাদ্যরূপে গণ্য করে—এটি তাঁদের শক্তি ও সাহস জোগায়; কিন্তু এটি নারীর পক্ষে ব্যবহারযোগ্য নয়, কারণ, এই খাদ্য তাদের অত্যন্ত কঠোরমনা করবে।[৯] গোঁফ তার অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে, খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত হলে, তা ধীরগামী বিষ রূপে মনে করা হয়; এবং বিস্ময়করভাবে অপরিণত কণ্ঠাস্থিসমূহ 'সন্তোখ' বা 'সুখ' নামে অত্যন্ত মূল্যবান কবচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, প্রতি বৎসরই বাঘের যকৃতে একটি

করে নতুন ভাঁজ পড়ে। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য, জনপ্রিয় কবচ হিসেবে বাঘ বা চিতার গোঁফ ও নখের মিশ্রণের সঙ্গে কিছু মন্ত্রপূত শিকড় বা ঘাস, তামার মাদুলিতে ভরে, গলায় বা হাতে ঝুলিয়ে রাখারও প্রচলন আছে। শিশুর জন্মের পরেই নাকি এটির প্রয়োগে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঘের মাংসও একটি শক্তিশালী ঔষধ এবং যাদু-দ্রব্য বিশেষ; গবাদি পশুর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে গোয়ালে এটিকে দগ্ধ করা হয়। বাঘের মাংস, যদি তা পাওয়া সম্ভব না হয়,—তখন শেয়ালের মাংস চাষের ক্ষেতে পোড়ান হয়, শস্যের রোগ দূর করবার অভিপ্রায়ে।

পাঁচ. ব্যাঘ্র: প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান

কিছু বাঘ বিনয়ীর আচরণে তুষ্ট হয় বলে মনে করা হয়। কাশ্মীরী একটি উপকথার নায়ক বাঘের দুধের সন্ধানে শর নিক্ষেপ করে এবং বাঘিনীর একটি স্তনের বোঁটা ভেদ করে ফেলে। তারপর তাকে এই ব্যাখ্যা দেয় যে সে [নায়ক] আশা করেছিল যে, এর ফলে সে [বাঘিনী] তার শাবকদের কম ঝঞ্ঝাটে স্তন্যপান করাতে পারবে। অপর একটি কাহিনীতে দেখি, 'খুড়ো' সম্বোধনে বাঘ শান্ত হয়ে যায়।[১০] কর্ণেল টড বর্ণনা দিয়েছেন, কেমন ভাবে একটি বাঘ তার শিবিরের কাছ থেকে একটি বালককে—নেপালী লোকশ্রুতির হিংস্র রাক্ষসের মত, আক্রমণের পর, তাকে 'খুড়ো' সম্বোধন করায় ছেড়ে দিয়েছিল।[১১] "বাঘ, যার অন্য একটা পরিচয়, কালা পাহাড়ের অধীশ্বর,—মোরওয়ানের এক পুরোনো 'স্বার্থবণিক'—কালা পাহাড় তার শক্তির কেন্দ্র এবং সেখান থেকে মাগাওয়ার পর্যন্ত তার এলাকা বিস্তৃত,—এখানে সে তার গবাদি প্রজাকুলের ওপর অসংখ্য আক্রমণ চালিয়েও দীর্ঘ কয়েক বৎসর অপ্রতিহত শক্তিতে রাজত্ব করেছে। বস্তুত তাকে উত্ত্যক্ত করবার দু-রাত্রি পূর্বেও সে মোরওয়ানের একজন দরিদ্র তেলীর মহিষটি উদরস্থ করেছে। বাঘ, মোরওয়াদের মোরি প্রভুদের মূর্তরূপ ঐতিহ্য একথা না বললেও কিন্তু, বন্দুক, তীর বা বল্লম কদাপি তার বিরুদ্ধে ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, এই ধৈর্যের প্রতিদানে, সে কখনও কোনো মানুষ হত্যা করেনি, যদি বা কাউকে ধরেও থাকে সুমধুর 'খুড়ো' সম্বোধন করে সামান্য একটু অনুনয় বিনয় করলেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে"।[১২]

ছয়. গোন্দ-দের ব্যাঘ্র উপাসনা

গোন্দদের মধ্যে ব্যাঘ্র উপাসনা এক অস্বস্তিকর রূপ নিয়েছে। তাদের বিবাহ অনেকটা যেন ভয়ঙ্কর এক ভূতুড়ে ব্যাপার—ব্যাঘ্রদেবতা বাঘেশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তির সেখানে আবির্ভাব ঘটে। তারা হিংস্র শিকারীর মত ব্যা-ব্যা-ধ্বনিরত ছাগল ছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দাঁত দিয়ে চিবাতে থাকে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হচ্ছে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপ্টেন স্যামুয়েলস্ বলেন : 'যে ভাবে দুটি লোক ছানা দুটিকে দাঁতে কামড়ে ধরে হত্যা করে, তা পশুদের খাদ্য পরিবেষণের সময়ে একমাত্র চিড়িয়াখানা বা বন্যপ্রাণী সংগ্রহশালাতেই দেখা যায়'।[১৩]

সাত. মানুষের ব্যাঘ্রে রূপান্তর

কর্ণেল স্লীম্যানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একটি সাধারণ বাঘ এবং একটি মানুষ ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হলে দৃশ্যত তাদের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে, ঐ ব্যাঘ্র-রূপী নরের কোনো লেজ থাকে না। বলা হয়ে থাকে, দেওড়ির সন্নিহিত জঙ্গলে এক ধরণের শিকড় পাওয়া যায়, তা যদি মানুষ খায়, তবে সে সেখানেই ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় ; এবং যদি এই অবস্থায় [অর্থাৎ ব্যাঘ্ররূপে] অপর এক জাতের শিকড় খায়, আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়। কর্ণেল স্লীম্যানের নিযুক্ত একজন সংবাদদাতা বলেছেন : 'এ-রকম এক বিষাদময় ঘটনা ঘটেছিল, তাঁর শৈশবে, তাঁর নিজেরই পরিবারে। তাঁদের ধোপা রঘু, অন্যান্য অনেক ধোপার মতই ছিল অতিশয় মদ্যপ। একজন মানুষ ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হলে কেমন লাগে সেইটি উপলব্ধি করবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে একদিন বনে গিয়ে দু-ধরণের শিকড় সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তার একটি স্ত্রীকে দিয়ে অনুরোধ করে তার কাছেই রাখতে, এবং বলে, যে মুহূর্তে সে ব্যাঘ্র রূপ ধারণ করবে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শিকড়টি যেন তার মুখে ঠেসে দেয়। রঘুর স্ত্রীও এতে সম্মত হয় এবং রঘু নিজের শিকড়টি খেয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘ হয়ে যায়। এদিকে তার স্ত্রী এমনই ভয় পেয়ে যায় যে, সে সেই প্রতিষেধকটি নিয়েই দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বেচারি রঘু, বাধ্য হয়ে বনে আশ্রয় নেয় এবং অতঃপর সে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের তার নিজের অনেক বন্ধুদের খেয়ে ফেলে। এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গুলি করে মেরে

ফেলা হয়। কোনো লেজ না থাকায় তাকে শেষ পর্যন্ত নাকি চেনাও গিয়েছিলো। যদি কখনও আপনি শুনতে পান যে কোন বাঘের লেজ নেই, তা-হলে, আপনি এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হতে পারেন যে, এ-কোন এক হতভাগ্য ব্যক্তি যে সেই শিকড় খেয়েছে এবং সমস্ত বাঘদের মধ্যে তাকেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করতে হবে'।[১৪]

এ-হলো বাঘের লেজ সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদের এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য—যা নিতান্তই কষ্ট-কল্পিত। একটি ভারতীয় প্রবাদে বলে যে, বাঘের লেজের চুল কারুর প্রাণবিয়োগের কারণ হতে পারে। এর সঙ্গে অধ্যাপক দ্য'-গুবারনেতিস্ তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে 'তেসিয়াস' [Ktesias] কথিত আত্মরক্ষার জন্যে ছোঁড়া তীরের পেছনে বাঘের লেজের চুল আটকানো থাকে।[১৫]

একটি নেপালী লোককথায় বর্ণিত হয়েছে যে কেমন করে কয়েকটি শিশু মাটি দিয়ে বাঘের প্রতিকৃতি তৈরী করে। কিন্তু তখনও তার জিভ তৈরী করে দেওয়া হয়নি। এই জিভের অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্যে তারা গাছের পাতা সংগ্রহ করতে যায়। কিছু পরে তারা ফিরে এসে দেখে যে ভৈরব সেই মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ভেড়াটিকে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করেছে। বাঘ-ভৈরবের সেই মূর্তি এবং দেবত্ব-আরোপিত শিশুদের এখনও সেই জায়গায় দেখা যায়। আমরা এই তিনটি কাহিনী 'পঞ্চতন্ত্র' এবং সোমদেবের গল্পেও পেয়ে থাকি:—যেখানে চারজন ব্রাহ্মণ একটি বাঘকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এই নব-জীবনপ্রাপ্ত বাঘ তাদেরকে খেয়ে ফেলে।[১৬]

বাঘ কেমন করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছে এ-রকম বহু উদাহরণ লোক-কাহিনীতে আমরা পেয়েছি। মির্জাপুরের 'মাঝি'দের বলা একটি কাহিনীতে বাঘের আস্তানায় একটি ছাগল, তার ছানাদের নিয়েছিল, এবং যখন সে [বাঘ] আসে, সে তার ছানাদের তারস্বরে চিৎকার করতে বলে এবং সে তাদের কাছ থেকে কিছু বাঘের মাংস চায় এই ভাণ করে।[১৭] একটি পাঞ্জাবী উপকথায় কৃষক রমণী ঘোড়ায় চড়ে বাঘের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে: 'আশাকরি এই ক্ষেতে একটা বাঘ অন্তত খুঁজে পাব। পরশু দিন তিনটি বাঘ মারবার পর থেকে, আমি এই ক-দিন বাঘের মাংস খাইনি।' —এই শুনে বাঘ পালিয়ে যায়। ভারতীয় লোককথায় সর্বজন বিদিত সেই কাহিনী যাতে

বিবৃত হয়েছে, কেমন করে একটি শেয়াল, বাঘকে পুনরায় তার খাঁচায় পুরতে সক্ষম হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেছিল।[১৮]

অনুবাদক : শ্রীদিলীপকুমার নন্দী

---

১. ভ্য গুবারনেতিস : জুলজিক্যাল মিথলজি : ১৮৭২ : [২য়]-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬০।

২. ফরসাইথ : হাইল্যাণ্ডস্ অব সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া [১৮৮৯], পৃঃ ২৭৮; টড : অ্যানালস্ অ্যাণ্ড অ্যাণ্টিকুইটিজ অব রাজস্থান [১৮৮৪] [২য়] পৃ. ৬৬০; রোনী : ওয়াইল্ড ট্রাইব্স্ অব ইণ্ডিয়া [১৮৮২], পৃঃ ১৩৯; ডাল্টন : ডেসক্রিপ্টিভ এথ্নোলজি অব ইণ্ডিয়া [১৮৭২] পৃঃ ২১৪; ফ্রেজার : গোল্ডেন্ বাউ [১৮৯০] [২য়], ১১০।

৩. ট্রামবুল : ব্লাড কভেনাণ্ট [১৮৮৭]. পৃ. ৩১২; টাইলর : প্রিমিটিভ্ কালচার [১৮৭৩], [১ম] পৃ. ৩০৯; স্লীম্যান : র‍্যাম্ব্লস্ অ্যাণ্ড রিকলেকশুনস্ অব অ্যান ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল [১৮৯৩], [১ম] পৃ. ১৫৫ ও তৎপরবর্তী অংশ।

৪. ফোক-লোর [১ম], পৃ. ১৬৯; লায়াল : এসিয়াটিক স্টাডিজ : ১৮৮২, পৃ. ১৩; স্পেনসার : প্রিন্সিপিল্স্ অব সোসিওলজি : ১৮৮৫, [১ম], পৃ. ৩২৩; কনওয়ে : ডেমনোলজি অ্যাণ্ড ডেমনলোর : ১৮৭৯, [১ম], পৃ. ৩১৩ ও তৎপরবর্তী অংশ; স্কট : লেটারস্ অন ডেমনোলজি অ্যাণ্ড উইচক্র্যাফট : ১৮৮৪, পৃ. ১৭৪।

৫. বেরার গেজেটিয়ার : ১৮৭০ : পৃ. ৬২; রাইট : হিস্ট্রি অব নেপাল ১৮৭৭, : পৃ. ৩৮; ফ্রেজার : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০১।

৬. ডালটন : পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি : পৃ. ১৩২, ১৩৩, ১৫৮, ২১৪।

৭. বেরার গেজেটিয়ার : ১৮৭০ : পৃ. ১৯১ ও তৎপরবর্তী অংশ; হোসঙ্গাবাদ সেটল্মেণ্ট রিপোর্ট : ১৮৬৭ : পৃ. ২৫৫ ও তৎপরবর্তী অংশ।

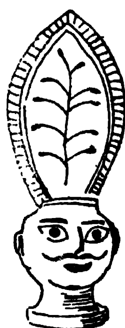
৮. উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য : নোলেস : কাশ্মীর ফোক-টেল্স্ : ১৮৮৮ : পৃ. ৩, ৪৫, ৪৬।

৯. ডাল্টন : পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ৩৩।

১০. নোলেস্-উদ্ধৃত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ৪৭; ক্যাম্বেল : সাঁওতাল টেল্স্ : ১৮৯১ : পৃ. ১৮।

১১. রাইট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ১৬৯।
১২. টড ঐ, পৃ. ৬৬৯।
১৩. ডালটন : ঐ, পৃ. ২৮০।
১৪. স্লীম্যান : ঐ [১ম] : পৃ. ১৫৪ ও তৎপরবর্তী অংশ।
১৫. দ্য গুবারনোতিস : পূর্বোক্ত গ্রন্থ [১ম] : পৃ. ১৬০ ও তৎপরবর্তী অংশ।
১৬. রাইট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ১৬১ ; টনী : কথাসরিৎসাগর : ১৮৮০, [২য়] : পৃ. ৩৪৮ ও পরে।
১৭. নর্থ ইণ্ডিয়ান্ নোটস্ অ্যাণ্ড কোয়েরিস্ [৩য়] : পৃ. ৬৫।
১৮. টেম্পল্ : ওয়াইড এওয়েক স্টোরিস্ : ১৮৮৪ : পৃ. ১১৬ ; ক্যাম্বেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ৪০ ; ক্লৌস্টন : পপুলার টেলস্ অ্যাণ্ড ফিকশ্যন : ১৮৮৭ : [১ম] : পৃ. ১৪৬।

* এই নিবন্ধটি William Crooke কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত *The Popular Religion and Folklore of Northern India* নামক বিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের [১৮৯৬] ২১০-২১৮ পৃষ্ঠার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।



বৃষ্টির দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মিত্র [১৮৬৩-১৯৩৮]

দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে যে সমস্ত দেব-দেবী পূজা পেয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দক্ষিণরায় [অর্থাৎ 'দক্ষিণের প্রভু']। ইনি দক্ষিণ ঠাকুর [অথবা 'দক্ষিণের ঠাকুর'], দক্ষিণদার এবং কালুরায় দক্ষিণদার ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

এমনও বিশ্বাস করা হয় যে এই দেবতা দক্ষিণ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সব বাঘেদের ওপর প্রভুত্ব করেন এবং তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর দ্বারাই। দক্ষিণরায়ের ভক্তরা আরও বিশ্বাস করে থাকেন যে, তাঁর পূজা করলে হিংস্র দৈত্যের তুল্য বাঘের হাত থেকে মানুষ এবং তাঁদের গৃহপালিত পশুদেরও তিনি রক্ষা করেন। এই কারণেই যে সমস্ত জেলা সুন্দরবনের এলাকার অন্তর্গত সেই সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের পূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের লীলাভূমির মধ্যে আবার ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর এবং বাদা অঞ্চলের পারিপার্শ্বিকেই দক্ষিণরায়ের আধিপত্য অধিক। এবং যেহেতু এই সমস্ত এলাকা বাংলার দক্ষিণে অবস্থিত, সে-কারণে এই দেবতা 'দক্ষিণের অধীশ্বর বা দেবতা'—ইত্যাদি যুগল-অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।

এই দেব-পূজার বিবর্তন-ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত বিশ্লেষণ করার ফলে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেটি হলো : সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে যে সমস্ত 'ব্রাত্য'-বাঙালী বাস করেন তাঁদের বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণরায় এখানকার ব্যাঘ্র সমাজের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার 'শক্তি, উৎপাদন এবং উদ্দেশ্যের একটি শরীরী প্রকাশ মাত্র'।

আমি এমন অভিমতও পোষণ করি যে ইনি [এই দক্ষিণরায়] আর্যবলয় বহির্ভূত দেবতা। অধিকন্তু এও বলতে হয় যে দক্ষিণরায় দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গ্রাম-দেবতা। তা-ছাড়া নিচের তথ্যগুলি থেকে এ-কথাই বোঝা যাবে যে, ইনি হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসে গড়া নিম্নতমস্তরের দেব সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি।

ক. তাঁর কোন ঘর বা মন্দির নেই। সাধারণত গ্রামের উপান্তে একটি ফাঁকা জায়গাতেই তাঁর পূজা হয়ে থাকে।

খ. পুরাণ-নির্ভর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের পূর্বে অব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারাই নিশ্চয় এঁর পূজা হতো। কিন্তু ঐ পৌরাণিক অভ্যুত্থানের পরে এই দেবতা গোঁড়া হিন্দুয়ানীর চৌহদ্দির মধ্যে আশ্রয় পান এবং একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত যেমন এঁর পূজা-কার্যে নিযুক্ত হলেন, তেমনি এঁর জন্ম-বৃত্তান্ত নির্ণয়ের জন্যে একটি পৌরাণিক গল্পেরও উদ্ভব ঘটানো হলো।

গ. এই দেব-পূজা-পদ্ধতি যে অনার্য উৎস থেকেই জাত তা বোঝা যায় এঁর জন্যে যখন হাঁস বলির ব্যবস্থা হয়। এমন মনে করার একটি কারণ এই যে, কোনো গোঁড়া হিন্দু দেবস্থানে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষীজাতীয় কোন কিছুই কখনও বলি হিসেবে উৎসর্গ করা হয় না।

ঘ. বেদ অথবা পুরাণে এই দেবতার নাম কখনও উল্লেখিত হয়নি।[১]

কিন্তু সম্প্রতি জনৈক লেখক এমন কথা বলেছেন যে [অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, লেখক যেমন নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন নি, তেমনি কোন অঞ্চলে এমনটি হয়ে থাকে তারও উল্লেখ করেন নি] দক্ষিণরায় বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির দেবতারূপে পূজিত হয়ে থাকেন। এবং তাঁর দৈবশক্তি একদিকে যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ধরিত্রীকে অনন্ত শস্যশালিনী করে, তেমনি অন্যদিকে সেই শস্য-সম্পদকে শূকর বা ঐ ধরণের বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষাও করে। ঐ লেখকের এই সব ধারণা নিম্নলিখিত তথ্যানুসন্ধান থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এই লেখাটি কোলকাতার 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে :

"আর একজন দেবতা আছেন, যাঁর পূজা কৃষকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তিনি হলেন, ক্ষেত্রদেবতা দক্ষিণরায়। ইনি একান্তভাবেই একক এবং এঁর মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের ধারণাটি বিজ্ঞাপিত হয়। গমের শীষ এবং স্ফুটনোন্মুখ শস্যের সঙ্গে এঁর গঠনগত সাদৃশ্যের বিস্ময়কর একটি মিল দেখা যায়।

এই দেবতার মূল কর্তব্য হচ্ছে বৃষ্টির ব্যবস্থা করা, ঋতু-অনুযায়ী সু-শস্যের উৎপাদন ঘটানো এবং শূকর ইত্যাদি বন্য পশুরা যাতে ঐ সমস্ত ফসলের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তা লক্ষ্য রাখা। এই শেষ ব্যাপারটিতে ইনি বিশেষ ভাবেই কৃতকার্য হয়েছেন ; কারণ, তাঁর ভীষণ-দর্শন মূর্তি একটি সার্থক 'কাক-তাড়ুয়া' রূপে গণ্য হতে পারে। দক্ষিণরায়ের প্রধান পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি

বছরের ১৫ই জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তিতে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই সময় নাগাদ খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে থাকে। ঘটনাক্রমে যদি এই সময়ে বৃষ্টি না হয় তাহলে ঐ দেবতার মূর্তিকে গ্রামের বাইরে, খোলা জায়গায় প্রখর রোদের মধ্যে এনে রাখা হয়; এ-যেন এক ধরণের মৃদু সংকেত। ফল-ফসল-ফুল এবং কখনও কখনও মুরগীও উপচার হিসেবে এঁর পূজায় ব্যবহৃত হয়। কোনো বিশেষ উপলক্ষে, যেমন প্রচুর ফসল ঘরে ওঠায় গ্রামে যদি উৎসবের বন্যা বইতে থাকে, তখন দক্ষিণরায়ের মূর্তিটিকে আপাদ-মস্তক তাড়ি দ্বারা চুবানোর মধ্যে দিয়ে তাঁকেও যেন ঐ পান-ভোজনের আনন্দোৎসবের অংশীদার করে নেওয়া হয়। উৎসবের শেষে যাঁদের পূজা সারা বছরের মধ্যে মাত্র একবারই কোনো এক সময়ে হয়ে থাকে—সেই সব গ্রাম্য দেবতাদের মতো দক্ষিণরায়ের কপালেও এক প্রবল উপেক্ষা লেখা থাকে। ফসল কাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঁর কথা সবাই ভুলে যায় এবং তাঁর প্রতিমূর্তিটি শূন্য ক্ষেতের 'শোভা' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে যায়। অথবা [আহা রে!] ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে ঢিল-পাটকেল ছোঁড়ার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে!"

ওপরের ঐ তথ্য সন্নিবেশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণরায় দু-ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন। যেমনঃ ১. ব্যাঘ্র দেবতা এবং ২. বৃষ্টির দেবতা। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি বাঘের ওপর প্রভুত্ব করেন ও তাদের কার্যকলাপ এবং গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি সুবৃষ্টি দান করে মানুষের জন্যে প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপাদনে সাহায্য করেন। এই বিচারে মিস্ সি. এস. বার্ণ কথিত 'সক্রিয় দেবতা' [*Functional Deity*]-দেরই পর্যায়ভুক্ত হচ্ছেন আমাদের এই দেবতাটি।

হিন্দু পুরাণ থেকে এমন অনেক দেবতার পরিচয় আমরা পাই যাঁদের এই ধরণের দ্বৈত কার্য ও দায়িত্ব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা ঘণ্টাকর্ণের উল্লেখ করতে পারি। এই ঘণ্টাকর্ণ তাঁর ভক্তদের যাতে ফোঁড়া ও চুলকানি থেকে রক্ষা করেন এই মানসে বাংলা দেশে ফাল্গুন সংক্রান্তিতে [ফেব্রুয়ারী-মার্চ] তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই দেবতাই উত্তর ভারতের হিমালয় অঞ্চলের বৈদ্যনাথে সমস্ত শৈব মন্দিরগুলির কোতোয়াল বা প্রধান রক্ষক হিসেবে পূজা পেয়ে থাকেন।

আবার দেখছি যে, বাংলাদেশে মনসা সাপের দেবী হিসেবে ভয়-ভক্তি লাভ করে থাকেন এবং ভাদ্র সংক্রান্তিতে [আগস্ট-সেপ্টেম্বর] এঁর পূজা হয়।

কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন যে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অংশে যখন কলেরা মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন ঐ কালব্যাধির আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেও মনসার পূজা করা হয়।

পুনরায় লক্ষণীয় যে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় মহারাজা নামে এক দেবতা আছেন যিনি ঐ অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত রোগের মহামারীর সময় রক্ষাকর্তা রূপে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পূজা পেয়ে থাকেন। আবার এই দেবতাই ঐ একই লোকেদের কাছ থেকে বর্ষণের দেবতারূপেও পূজা পেয়ে থাকেন। কারণ, ইনি সন্তুষ্ট হলে যেমন সুবৃষ্টি দান করবেন, তেমনি প্রচুর ফসলে তাদের গোলাও ভরে উঠবে। অধিকন্তু, ভূত-প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হিসেবেও ইনি ভক্তিলাভ করে থাকেন।[২] এই ক্ষেত্রে আমরা এমন এক দেবতার পরিচয় লাভ করলাম যিনি তিনটি শক্তির অধিকারীরূপে কাজ করেন এবং ত্রিস্তরে তাঁর অধিকার বিস্তৃত।

দক্ষিণরায় যে অনার্য দেব-সম্ভূত তা এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন: ১. এঁর উদ্দেশে কুক্কুট জাতীয় প্রাণী উৎসর্গীকরণ এবং ২. তরল মাদক দ্রব্যের অর্ঘ্য নিবেদন।

আমি আগেই বলেছি যে দক্ষিণ বঙ্গদেশে দক্ষিণরায়কে যখন ব্যাঘ্র দেবতা হিসেবে পূজা করা হয় তখন তাঁর কাছে হাঁস বলি দেওয়া হয়। এটাও দেখা গেছে যে যখন এই দেবতা বর্ষণের দেবতা হিসাবে পূজিত হন এবং গ্রামবাসিগণ সুবর্ষণের জন্য তাঁকে প্রসন্ন করতে চান তখনও মুরগী বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আগেই বলেছি যে গোঁড়া হিন্দুদের দেব-স্থানে হাঁস বা মুরগী বলি হিসেবে কখনই উৎসর্গ করা হয় না।

সব শেষ বক্তব্য হলো এই যে: এই দেবতার পূজা উপলক্ষে দেবমূর্তি আপাদমস্তক তাড়ি দিয়ে এমনভাবে স্নান করানো হয় যে, —'দি ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার লেখকের ভাষায়—ইনি যেন মত্ততাদায়িকা মাদকের মধ্যে ডুবে আছেন।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় কৃষকদের এক আঞ্চলিক ঠাকুর আছেন, যাঁর নাম 'কাণ্ডী'। ইনি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তাঁদের গবাদি পশুসমূহের রক্ষাকর্তা এবং ঐ সমস্ত পশুদের যন্ত্রণাদায়ক রোগের পরিত্রাতারূপে গণ্য হন। এখন এই দেবতাকেও প্রসন্ন করার জন্য গাঁজা দেওয়া হয় এবং যাতে তিনি ধূমপান করতে পারেন তার জন্য হুঁকা এবং ছিলিমও[৩] নিবেদন করা হয়।[৪]

ঠিক একই ভাবে 'মাদুরাই ভিরণ' নামে দক্ষিণ ভারতের এক গ্রাম্য দেবতাকেও তাড়ি এবং চুরুট উৎসর্গ করা হয়।[৫]

দক্ষিণরায়ের পূজা প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে বাকী আছে: ওপরে দেখানো হয়েছে যে যখন এই দেবতা বাঘের দেবতা হিসেবে পূজিত হন তখন তাঁর পূজা হয়ে থাকে মাঘ মাসে—যা ইংরাজী ১৬ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই ফেবরুয়ারীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার লেখক বলেছেন যে এই দেবতাটির বর্ষণের অধিকর্তা হিসেবে পূজা লাভের সময় হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারী—যা, সচরাচর বাংলা পৌষ সংক্রান্তিতেই পড়ে। অথচ বর্তমান অভিজ্ঞতায় আমাদের পক্ষে কোন মত প্রকাশের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যে কেন এই দেবতার পূজার দিনের মধ্যে এমন ধরণের তফাৎ হলো।[৬]

অনুবাদক: শ্রীরূপশো মিত্র

---

১. এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য পঠিতব্য মদ্‌কৃত প্রবন্ধ: 'দক্ষিণ বঙ্গের দেবতা দক্ষিণরায়': 'হিন্দুস্থান রিভিয়্যু': জানুয়ারী ১৯২৩: পৃ. ১৬৭-৭১ দ্রষ্টব্য।

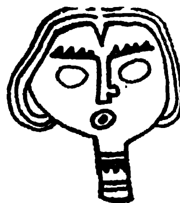
২. এই প্রসঙ্গে আমার লেখা প্রবন্ধ দেখুন: 'উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য দেবতা-সমূহ': 'হিন্দুস্থান রিভিয়্যু': ফেবরুয়ারী ১৯২২; পৃ. ১৪৬-৫৮।

৩. মনে হয় প্রবন্ধকার এখানে 'ছিলিম' অর্থে কল্কেকে বোঝাতে চেয়েছেন। —সম্পাদক।

৪. দ্র. ২নং টীকা: পৃ. ১৫৩-৪।

৫. ঐ ঐ : পৃ. ১৫৪।

৬. ইংরাজীতে লেখা এই প্রবন্ধটি ৫ই নভেম্বর ১৯২৪-এ পঠিত হয়। এবং 'জার্ণাল অব দি এ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি অব বোম্বাই'তে মুদ্রিত হয়। খণ্ড ১৩: সংখ্যা ২।



বারা ঠাকুর

কালিদাস দত্ত [১৮৯৫-১৯৬৮]

প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র আদিম মানবগণ জনকল্যাণে দেবতার সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে যাবতীয় পার্থিব ঘটনা অদৃশ্যে বহু অবাস্তব জীবগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং মানবগণের জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং রোগ, অকালমৃত্যু ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রভৃতি বিপদ-আপদে পরিত্রাণ উহাদের তুষ্টি সাধনের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য তাঁহারা ঐ সকল বাস্তব অ-জীবনের নানা প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার কাল্পনিক প্রতীক নির্মাণ করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ, প্রার্থনা, ক্রন্দন ও জীববলি প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির দ্বারা তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতেন। তৎকালে ঐ উদ্দেশ্যেই, আদিম সংস্কারানুযায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উক্তরূপ দেবতাদের অসংখ্য মূর্তি পূজা-পদ্ধতির উদ্ভবের সহিত বহুবিধ উপায়ে নানা প্রকার জীববলিরও প্রচলন হয়।

আর্যজাতির আগমনের পূর্বকালে ভারতবর্ষেও ঐ শ্রেণীর বহু দেবতা উল্লিখিতরূপে আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত হইত। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে উহার অনেক বিবরণ আছে। কিছুকাল পূর্বে মহেঞ্জোদারো, হরোপ্পা ও চাণুদারো প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ভ খননে উহার নানা প্রকার চাক্ষুষ নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্যাধিকারের পরে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রথমে ঐ সকল দেবতা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ-কল্পনাজাত বৈদিক ও তৎপরে পৌরাণিক দেবদেবীর সৃষ্টি হইলে উপরোক্ত আদিম দেবতা সমূহের অধিকাংশের বিলোপ ঘটে ও অবশিষ্টের কিয়দংশ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং কিয়দংশ অপ্রধান দেবতারূপে আর্যেতর জাতি অধ্যুষিত পল্লী অঞ্চলে টিকিয়া থাকে। সে-কারণ আজিও ভারতের পল্লী সমূহের নানাস্থানে জনসাধারণের মধ্যে উহাদের লৌকিক দেবতারূপে পূজিত হইতে দেখা যায়। তন্নিমিত্তই উহারা কোথাও ব্রাহ্মণদের দেবমন্দির মধ্যে স্থান পায় নাই এবং সর্বত্র মাঠে ঘাটে—হয় বৃক্ষতলে, নতুবা বিভিন্ন গৃহে বা আচ্ছাদন মধ্যে রক্ষিত হয়।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় নিম্নবঙ্গেও ঐ শ্রেণীর কতকগুলি আদিম দেবতা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে পূজিত বারাঠাকুর নামক একটি দেবতার কথা আমি এখানে আলোচনা করিতেছি। ঐ দেবতাটির আদিম বৈশিষ্ট্যাদির বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে আমি উহার আকার ও পূজা-পদ্ধতির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

আকারে উহা দুইটি নরমুণ্ডের অনুরূপ। ঐ মুণ্ড দুইটি ফাঁপা ও গোলাকার দুইটি মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের রং সাদা ও শিরোভূষণ বৃক্ষপত্রের ন্যায়। উহাতে বন্যলতাপাতা অঙ্কিত থাকে। কোন কোন স্থানে উক্ত দুইটি মুণ্ডের মুখে গোঁফ ও দাড়ির নীচে গাল-পাট্টা প্রদর্শিত হয়। আবার কোথাও একটিকে গোঁফবিহীন দেখা যায়। শেষোক্ত মূর্তি বারাঠাকুরের জননী নামে প্রসিদ্ধ। উহার নাসিকা ও কর্ণে কিন্তু নারী মূর্তিব ন্যায় কোনরূপ অলঙ্কার থাকে না; অধিকন্তু মুখের নীচে উল্লিখিত পুরুষ মূর্তিটির অনুরূপ গালপাট্টা প্রদর্শিত হয়।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কুম্ভকারগণ, পরম্পরাগত প্রথায়, ঐ দেবতাটির উক্তরূপ শত শত মূর্তি, পূজার জন্য নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করেন এবং ঐসকল মূর্তি সচরাচর দিবসে, আবার কোথাও রাত্রিকালে প্রতি গ্রামে হিন্দু গৃহস্থদের দ্বারা পূজিত হয়। উহার রাত্রিকালের পূজাটি জাঁতাল নামে অভিহিত। উহাতে ঐ মূর্তি দুইটিকে খেজুর গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া উহাদের নিকট আমিষ নৈবেদ্য ও দেশী মদ উৎসর্গ করা হয় এবং ছাগ ও হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। পূজার সময় সর্বত্র একটি মৃত্তিকার বেদীতে ছড়ির দ্বারা সবার উপরে দুইটি মূর্তিকে পাশাপাশি বসান হয়। সাধারণতঃ ১লা মাঘ, আবার কোন কোন স্থানে মাঘ মাসের মধ্যে অন্যান্য তারিখেও, বৎসরে একদিন মাত্র, গ্রাম্য লৌকিক দেবতার আস্তানায় অথবা লোকের গৃহাদি সংলগ্ন মাঠ, ঘাট ও উঠানে জনসাধারণ উল্লিখিতরূপে উহার পূজা সম্পন্ন করেন। পূজান্তে এ সমস্ত মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। পূজার স্থানগুলিতেই পরিত্যক্ত থাকিয়া উহারা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দেবতাটি সম্বন্ধে আজিও কোন প্রাচীন গাথা বা প্রবাদাদি পাওয়া যায় নাই। সেকারণ, উহা কোন্ শক্তির প্রতীক এবং কি উদ্দেশ্যে উহার পূজা হয় তাহা অজ্ঞাত।

উহার বারা নামের অর্থ কি তাহাও অজ্ঞাত। উক্ত শব্দটি যে আর্যেতর

ভাষামূলক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো ও কুরকু প্রভৃতি আদিম জাতিদের ভাষায় বারেয়া, বারিয়া ও বার শব্দ আছে। উহাদের অর্থ তুই।[১] ঐ সকল শব্দের কোন একটির অপভ্রংশে উক্ত দেবতা যুগ্ম বলিয়া, উহার বারা নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। চব্বিশ পরগণা জেলায় বারা শব্দ যুক্ত কয়েকটি গ্রামের নাম আছে; যথা, বারাতলা, বারাসাত, বারাগোলা গ্রাম, থানা উলুবেড়িয়া, হাওড়া ইত্যাদি।

বারা নাম ব্যতীত দক্ষিণদার নামেও ঐ দেবতাটি প্রসিদ্ধ। ঐ নামের তাৎপর্য অজ্ঞাত। উহা লইয়া অনেকে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল মতের সমর্থনে এখনও কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কেহ কেহ আবার উহাকে দক্ষিণরায় নামেও অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় উহারা উক্ত নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান যুগের বিখ্যাত লৌকিক দেবতারই উহা বিভিন্ন রূপ। এই অভিমতের সমর্থনে তাঁহারা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত, কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহাতে কথিত আছে যে একদা আঠার ভাঁটি দেশের অধিকার লইয়া দক্ষিণরায়ের সহিত বড খাঁ গাজি নামক একজন পীরের যুদ্ধ ঘটে। তাঁহারা উভয়েই ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। সে কারণে সেই যুদ্ধে উক্ত গাজি দক্ষিণরায়ের বুকে আঘাত করিলে তিনি মায়ামূর্তি ধারণ করেন। পরে গাজির খড়্গাঘাতে সেই মায়ামূর্তির মস্তক দেহচ্যুত হইলে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেন এবং তদবধি সেই কাটা মুণ্ডের প্রতীক বারা নামে পূজিত হইতেছে। কৃষ্ণরামের ঐ উক্তিটি এইরূপ:

'শুনচ্ছ্যা বড় খাঁ গাজি পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাটির॥
দুজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়োহুড়ী মহাযুদ্ধ লাগে॥
অধিকার বড় ধন সবে নিতে চায়।
ভাই ভাই বিরোধে কতেক ঠাঞী যায়॥
দক্ষিণরায়ের বড় বুকে মারে গাজি।
পড়িয়া উঠিল রায় রহে মায়া বাজি॥
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাঁহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার॥

বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তারপর দোস্তানি পাইল দোহাকার॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে।
কোনখানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে' ॥[২]

প্রাচীনকালে লোকের বারা ঠাকুরের মতো অস্বাভাবিক মূর্তির প্রকৃত তাৎপর্য জানা সম্ভব ছিল না। সে কারণ সেই সময় অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী লোকে যে উহার ঐ প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণরায়ের দেবত্ব প্রতিপাদনও ঐরূপ ব্যাখ্যা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কেহ উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই এবং অনেকে আজও দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর অভিন্ন এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

দক্ষিণরায় যে বারাঠাকুর নন তাহার কয়েকটি প্রমাণ আমি এখানে প্রদান করিতেছি।

কৃষ্ণরামের পূর্বোল্লিখিত বিবরণমধ্যে দেখা যায় যে বড়খাঁ গাজি ও দক্ষিণরায়ের দিব্য [স্বাভাবিক] মূর্তি, আবার কোথাও কাটামুণ্ড মূর্তি পূজিত হইতেছে। এক দেবতা হইলে উহাদের পূজা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই একপ্রকার হইত। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। দক্ষিণরায়ের মূর্তি যুগ্ম নয় এবং উহার আকার স্বাভাবিক মনুষ্যের ন্যায়। উহা কোথাও অশ্বের উপর, কোথাও ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট। সর্বত্রই ঐ সকল মূর্তি যোদ্ধবেশী। উহাদের হস্তে কোথাও তীরধনুক, কোথাও তরবারী, আবার কোথাও বন্দুক দেখা যায়। ঐ সকল মূর্তির নিত্য পূজা হয় ও তজ্জন্য কোন কোন স্থানে ভিন্ন গৃহও আছে।

বারাঠাকুরের মূর্তির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উহার কিন্তু কোথাও নিত্য পূজা হয় না এবং তজ্জন্য কোন স্থানে কোনরূপ নির্দিষ্ট গৃহও নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বৎসরের মধ্যে মাঘ মাসে একদিন মাত্র লোকের গৃহসংলগ্ন মাঠ ঘাট, বাগান ও উঠান প্রভৃতি স্থানে অথবা গ্রাম্য লৌকিক দেবতাদের গৃহ বা আচ্ছাদন মধ্যে উহার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে জাঁতাল নামে উহার যে পূর্বোক্ত রূপ পূজা হইয়া থাকে দক্ষিণরায়ের তদ্রূপ পূজা কোথাও হয় না। অনেক গ্রামে বারাঠাকুরের যুগল মূর্তির মধ্যে একটি গোঁফ-বিহীন মূর্তিকে উহার জননী নামে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া পূজা করা হয়। উহা বারাঠাকুরের শক্তি নামে অভিহিত। দক্ষিণরায়ের উল্লিখিত স্বাভাবিক

মূর্তিগুলি কিন্তু একক এবং উহাদের সহিত কোথাও কোন নারী মূর্তি থাকে না।

এই সমস্ত প্রমাণ ভিন্ন বারাঠাকুর যে দক্ষিণরায় নন তাহা আরও বুঝা যায় অন্যান্য দেশে আদিম জাতিদের মধ্যে বারাঠাকুরের মত মুণ্ডরূপী যুগ্ম-দেবতার পূজার প্রচলন দেখিলে। আমি এখানে কয়েকটি ঐরূপ মূর্তিরও পরিচয় দিতেছি।

দক্ষিণ ভারতে কুট্টনদবর নামে প্রস্তর খোদিত এক মুণ্ডরূপী দেবতা আজিও তামিল জাতির মধ্যে পূজিত হয়। হোয়াইটহেড সাহেব তাঁহার দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্যদেবতা নামক পুস্তকে উহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন: 'A deity, called Kuttandavar is worshipped in many parts of Tamil country, especially in the south Arcot district. The image consisted of a head, like a big mask, about three feet high, with a rubicurd face, strong features, moustaches turning up at the end, lions teeth projecting downwards outside the mouth from the angles of the upper jaws, and a tall conical head-dress. Below this stone there was a small store head, which was miniature of the larger figure···The pujari said the images represented Kuttandavar. [৩]

উক্ত গ্রন্থে ঐ দেবতাটি ব্যতীত বিসলমরী [Bisalmari] নামে প্রসিদ্ধ অন্য একটি প্রস্তরে খোদিত, মুণ্ডরূপী যুগ্ম-দেবতার চিত্রও আছে। ঐ দুইটি মুণ্ডও বারাঠাকুরের মত পাশাপাশি বসাইয়া পূজিত হয়।[৪]

দক্ষিণ ভারতের এই সকল মূর্তি ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইস্টার দ্বীপেও এক প্রান্তরে, প্রস্তরে খোদিত, মুণ্ডরূপী একটি যুগ্ম-দেবতার অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা ঐ সকল মুণ্ডমূর্তিও পাশাপাশি বসাইয়া পূজা করিত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বারাঠাকুর যে একটি আদিম দেবতা তাহা বুঝা যায় উহার অস্বাভাবিক মুণ্ডরূপী যুগ্ম-মূর্তি দেখিলে। তদ্ভিন্ন আর্যেতর ভাষা-মূলক উহার বারা নাম, রাত্রিকালে উহার পূজারও ঐরূপ ভাষামূলক জাঁতাল নাম এবং উক্ত পূজাতে অনুষ্ঠিত আদিম পদ্ধতিগুলিও ঐ প্রকার অনুমানের সমর্থক। এখানে আমি উহার আকারগত অন্যরূপ একটি আদিম বৈশিষ্ট্যের

উল্লেখ করিতেছি। উহার মুখমণ্ডলের নিম্নাংশে প্রদর্শিত গালপাট্টা। ঐ ধরণের গালপাট্টা মানুষের মুখমণ্ডলের নিম্নাংশে প্রদর্শনের রীতি আদিম জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন দেশেও প্রচলিত ছিল। উহার নিদর্শন-স্বরূপ আফ্রিকার একটি আদিম জাতির একখানি মুখোশ পোলাণ্ডের Warshaw Museum-এর Primitive Culture of Central and East Africa বিভাগে রক্ষিত আছে।

বারাঠাকুরের বর্তমান মূর্তিতে এখনও উক্তরূপ আদিম বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কাল প্রভাবে উহাতে যে পরিবর্তন [sophistication] ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যায় উক্ত মূর্তির চোখ, কান ও মুখের স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় আকার হইতে। উহার আদিম আকৃতি কিরূপ ছিল তাহা অজ্ঞাত। কিছুদিন পূর্বে উহার মত পত্রাকার শিরোভূষণযুক্ত একটি আদিম পোড়ামাটির মূর্তি ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে, হুগলী নদীর ভাঙ্গনে, নব্য প্রস্তর যুগের অনুরূপ বহু হাড় ও প্রস্তরের আয়ুধের সহিত আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৫] উহার মুখমণ্ডল কিম্ভূতকিমাকার [grotesque] ও পক্ষীর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট। উহা বারাঠাকুরের [prototype] হওয়া সম্ভব।

পুরাতন বাঙালা সাহিত্য-পাঠে জানিতে পারা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে গাজিসাহেব, ওলাবিবি ও বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদের সহিত দক্ষিণরায়েরও আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি হইতে প্রতীতি হয় যে পূর্বে বর্ণিত দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য দেশের যুগ্ম-মুণ্ড-পূজক আদিম জাতিদের মত ধর্মভাবাপন্ন মানবগণের দ্বারাই, মুসলমান আমলের বহু পূর্বে বারাঠাকুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সকল মানব কাহারা ছিলেন এবং নিম্নবঙ্গের এই প্রদেশে কোন সময় তাহাদের আবির্ভাব ঘটে তাহাও অজ্ঞাত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বারাঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্য আজও জানা যায় নাই। দক্ষিণ ভারতে কুট্টনদবর প্রভৃতি মুণ্ডরূপী যুগ্ম দেবতাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবাদাদি প্রচলিত আছে তদ্সমুদয় হইতেও ঠিক কিছু নির্ধারণ করা যায় না। মহীশূর রাজ্যে বিসলমরীর পূজাপদ্ধতি দেখিয়া হোয়াইটহেড সাহেব উক্ত বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন: 'The system as a whole is redolent of the soil, and evidently belongs to a pastoral and agricultural community. The village is the centre round which

the system revolves, and the protection of the villages the object for which it exists.'[৬]

বারাঠাকুরের পূজাও ঐরূপ উদ্দেশ্যমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।*

১. P. O. Bodding : *A Santal Dictionary* : Vol I. pt. 1.

২. ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' [১৩৬৩] : পৃ. ১৭।

৩. Rev. Whitehead : The Village Gods of South India : pp 26-7.

৪. Ibid ; plates XV and XVI.

৫. Kalidas Dutta : *Some Primitive Antiquities of the Sundarban* : 'Science and Culture', June, 1961.

৬. দ্র. ৩নং টীকার গ্রন্থ।

* প্রবন্ধকার-পুত্র শ্রীঅমলকুমার দত্ত মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ড. প্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত 'ভারতীয় লোকযান' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হলো।



প্রসঙ্গ ঃ রায়মঙ্গল

ড. সুকুমার সেন [১৯০০—]

রায়মঙ্গলের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৩ ব্যোমকেশ মুস্তফী। তখন থেকেই রচনাটি প্রাচীন সাহিত্যসন্ধানীর ও লোকসংস্কৃতি-গবেষকদের কৌতূহল জাগিয়ে এসেছে।

রায়মঙ্গলের বিষয় বৈচিত্র্যশালী। বর্ণনায় নূতনত্ব আছে। কিন্তু সে নূতনত্ব এমন কিছু নয় যার জন্যে সাহিত্যরসিককে এই বই পড়তে অনুরোধ করা যায়। তবে যাঁরা বাংলাভাষার পুরানো ছাঁদ কিংবা শব্দভাণ্ডার আলোচনা করতে চান তাঁদের বইটি অবশ্য পাঠ্য। নৃতাত্ত্বিক যিনি বাংলাদেশের আঞ্চলিক 'কাল্ট্' সম্বন্ধে কৌতূহলী তিনি কিছু মালমশলা পাবেন। আর যিনি ব্যাঘ্রতত্ত্ব [জীববিদ্যার অঙ্গরূপে নয়, লোকসংস্কৃতির প্রকাশ রূপে] আলোচনা করবেন তাঁর পক্ষে এটি সাক্ষাৎ বেদসংহিতা। বয়স হলেও যাঁদের কাছে ছেলেদের উপকথা বিরস হয়ে যায় নি তারা আনন্দ পাবেন বাঘের রোল্-কলে। হুড়কোখশালে বাঘ গোয়াল ঘরের হুড়কো খুলে ছাগল বাছুর খায়। 'হিমিরা বাঘের খুড়ি উড়ান-চড়ই'—সে রাত্রিতে ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড দেয়, বাড়ির লোকে দেখতে এলে তার ঘাড় ভাঙে। কুসভ্যা সুসভ্যা বাঘ জলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে লুকিয়ে থাকে। একলা কেউ ঘাটে এলে তাকে ধরে কিংবা নৌকায় লোক কম থাকলে লাফ দিয়ে পড়ে। টংভাঙা বাঘের জীবিকানির্বাহ হয় টং ভেঙে। মাঠে ফসল পাহারা দেবার জন্যে চাষারা টং বেঁধে রাত্রিতে তার উপর শুয়ে থাকে। টংভাঙা টঙের খুঁটি নাড়া দিলে তারা পড়ে যায় অমনি ঘাড় ভাঙে। ইত্যাদি। যাঁরা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুচরিতে ছালছাড়ানো বাঘের গল্পটি পড়েছেন তাঁরা রায়মঙ্গলের ব্যাঘ্র পরিচিতি অংশ পড়লে ত্রৈলোক্যনাথের বর্ণিত ব্যাঘ্র মাহাত্ম্যের সমর্থন পাবেন।

দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা আমি বলেছি, এবং এ উক্তি আমার মৌলিক গবেষণালব্ধ নয়। সকলেই বলেছেন ও বলেন। এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি নয়। যেমন সত্যি নয় আমার আর একটি একদাতন উক্তি কালু রায়

কুম্ভীরদেবতা। 'ব্যাঘ্রদেবতা' কথাটির দুরকম মানে হতে পারে। এক. ব্যাঘ্রের দেবতা অর্থাৎ বাঘের ঠাকুর। দুই. ব্যাঘ্ররূপী দেবতা। দ্বিতীয় অর্থে দক্ষিণরায় কিছুতেই ব্যাঘ্রদেবতা নন্। প্রথম অর্থেও তাঁকে ব্যাঘ্রদেবতা বলা চলে না। দক্ষিণরায় দক্ষিণদেশের রাজা। কৃষ্ণরাম তাঁকে বলেছেন 'দক্ষিণের ভূপ'। দক্ষিণদেশ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘই প্রধান হিংস্র জন্তু, তাই স্বভাবতই বাঘ রায়ের প্রধান শক্তি। কিন্তু তাঁরা ভার্যা ও মন্ত্রী [পঞ্চপাত্র] কেউই বাঘ নন। গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে উভয় পক্ষেই [কৃষ্ণরামের মতে] বাঘ সেনা। রামচন্দ্র লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানরসৈন্য নিয়ে। তাঁকে কি কেউ বানরদেবতা বলবে? অতএব দক্ষিণরায়ও ব্যাঘ্রদেবতা নন।

দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপাল, দক্ষিণদিকের। উত্তরদিকের ক্ষেত্রপাল উত্তররায় হওয়া উচিত। হয়ত ছিলও। ছাতনায় যে পুরানো বাসলী মন্দিরের ইঁটে 'হামির উত্তররায়' খোদাই আছে তা কোন স্থানীয় রাজার নাম বলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাসলীর ভৈরব, ক্ষেত্রপালের নাম হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ উত্তরদিকের ক্ষেত্রপাল কালুবায়। ইনিই দক্ষিণরায়ের সহকারী। বাঘেও চড়েন কুমীরেও চড়েন। কৃষ্ণরাম বলেছেন 'হিজলীতে কালুবায় থানা'। পশ্চিমের ক্ষেত্রপালের নাম সাধারণত পাওয়া যায় না। একটি রচনায় পাই মহুদ্ধি [মাহুত্তা ?], আর একটি রচনায় পাই গোমুয়া [=গোমুখ]। পূর্বদিকের ক্ষেত্রপাল গোরোয়া [=গোরাব] বা গোরা, মুসলমানদের পীর গোরাচাঁদ। কৃষ্ণরামের রচনায় ইনি গাজীর সহায়ক। ধর্মপূজা সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে দিক্-ক্ষেত্রপালদের এই আহ্বান আছে :

> পূর্বে থাকিয়া এস গোরিয়া ক্ষেত্রপাল,
> সিকি ভাজার উপরে তোমার অধিকার।
> তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি,
> ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী॥
> উত্তরে থাকিয়া এস কালিয়ে ক্ষেত্রপাল,
> পাঠা বলিদান লও [আর] সুরাপান।
> তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি
> ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী॥
> পশ্চিমে থাকিয়া এস মহুদ্ধি ক্ষেত্রপাল,
> ভাজা ভুজার উপরে তোমার অধিকার।

তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি,
ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী ॥
দক্ষিণে থাকিয়া এস ঠাকুর দক্ষিণরায়,
ভাটি আর সহরে তোমার পূজা হয়।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি
ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী ॥

উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে লৌকিক ব্রত-পূজায় যে বাঘাই ও সোনাই পাওয়া যায় তার মূলে ব্যাঘ্রদেবতা অর্থাৎ ব্যাঘ্ররূপী ও ব্যাঘ্রপ্রকৃতির দেবতা। এমন ব্যাঘ্রদেবতার প্রভাব একদা পৌরাণিক দেবতার উপরেও পড়েছিল। ব্যাঘ্রমুখ বিষ্ণুর একাধিক প্রাচীন মূর্তি মিলেছে। বৃকবদন দেবী ও বিষ্ণু [বা শিব] মূর্তি পূর্বভারতে পূজিত হত। দিনাজপুরে পাওয়া একটি পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসনে 'হিমবচ্ছিখরে' কোকামুখস্বামীর দেউলের সংস্কারের ও ঠাকুরের পূজার জন্যে ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণরাম বলেছেন যে তাঁর আগে একজন দক্ষিণরায়ের পাঁচালী লিখেছিলেন। কৃষ্ণরামের পরে আর অন্তত দু-জন এ কাজ করেছিলেন। তবে তাঁদের রচনা অত্যন্ত খণ্ডিতভাবে আমাদের হাতে এসেছে। রুদ্রদেবের যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে কৃষ্ণরামের ছত্র মাঝে মাঝে উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণরামের রচনাও অখণ্ডরূপে পাই নি। তবে কাহিনী অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না। পুথি মূল রচনার প্রায় দেড়শ বছর পরেকার। লিপিকার তাঁর আদর্শ পুথির অনেক অক্ষর ধরতে পারেন নি। পুথিতে ত্রুটিও ছিল।

গাজীর উক্তি কৃষ্ণরাম হিন্দুস্থানীতে দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি বাঙালী লেখকের হিন্দুস্থানীর রচনার নিদর্শন বলে এ অংশের মূল্য আছে।[১]

১. ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে মুদ্রিত হয় [১৯৭৬]। গ্রন্থটি বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে ছাপা হয়। আমরা ড. সেনের অনুমতিক্রমে সেটি মুদ্রিত করলাম। অনুমোদন সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধটির নামকরণের দায়ভার সম্পাদকের।



নিম্নবঙ্গের ব্যাঘ্র বিশ্বাস ও সাহিত্য

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য [১৯০৯—]

পশু জগতের সঙ্গে আদিম মানব সমাজের যে সম্পর্ক ছিল, আধুনিক মানব সমাজে সেই সম্পর্ক অনুপস্থিত। প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগে পশু এবং মানুষ ছিল পরস্পর প্রতিবেশী এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার ও অস্তিত্বকে রক্ষায় ছিল সদা সচেষ্ট। কিন্তু একটা সময় এলো যখন জাগতিক পরিবর্তনের কারণে মানুষ নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে দুর্বলতা অনুভব করল; কিন্তু তবু তারা জন্তু জানোয়ারের সংস্রব ত্যাগ করে, অরণ্য-বেষ্টিত ভূ-ভাগ—যা ছিল তাদের আবাসস্থল, তা ছেড়ে বহুদূরে চলে যেতে পারল না। তাই আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ অলৌকিক শক্তির সন্ধানে সচেষ্ট হল। পরিণামে তারা বিশেষ বিশেষ জন্তুর মধ্যে অবস্থানকারী বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর অস্তিত্বের কথা কল্পনা করল এবং তত্ত্বাবধায়ক দেবদেবীর পূজার্চনার মাধ্যমে ঐ-সব ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হল।

ভারতে সুদূর অতীত কাল থেকে প্রাগ্‌ আর্য সমাজে ব্যাঘ্র পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদরো থেকে যে সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে পশুপতি মহাদেবের সঙ্গে অপর যে চারটি প্রধান জন্তুর মূর্তি খোদিত রয়েছে তাদের একটি হল ব্যাঘ্র।[১] প্রাচীনকালে ভারতের অনার্য জাতির দেবতা ছিলেন যে শিব তিনি ব্যাঘ্রছাল পরিহিত এবং ব্যাঘ্রচর্মে উপবিষ্ট। সম্ভবত, শিবের আদিমতম বাহন ছিল বাঘ। পরবর্তী কালে সমাজে যখন গরুপূজা আরম্ভ হয়, তখন থেকে শিবের বাহন হয়ে দেখা দেয় ষাঁড়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও শিবের পরিধেয় থেকে যায় ব্যাঘ্রচর্ম এবং শিবের আসন হয় কৃত্তি। ব্যাঘ্রের সঙ্গে শিবের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আদিম সমাজের ব্যাঘ্র পূজা পরবর্তী কালে শৈবধর্মের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেছে। উত্তর ভারতে আর্য সমাজের বাইরে যে সমাজ সেখানে ব্যাঘ্র পূজার যে বিশেষ প্রচলন ছিল, তার এক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল রাজপুতানার বাঘেল রাজপুত[২] নামের উপজাতি। সম্ভবত এরা ব্যাঘ্র পূজক কোন প্রাচীন উপজাতিদের বংশধর। মধ্য ভারতে ব্যাঘ্রপূজা করে এ মন এক উপজাতি আজও বিদ্যমান।[৩] এরা বাঘ পূজা করে

এবং কখনও বাঘ শিকার করে না। যদি ইউরোপীয়রা বাঘ ধরতে কোন ফাঁদ পাতে, তাহলে এরা রাত্রে বনে গিয়ে বাঘদের উদ্দেশ্য করে বলে যে তারা কখনও ফাঁদ পাতে নি, এমন কি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেও ফাঁদ পাতা হয় নি। অতএব তাদের কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। রাজপুতানার ভীলেরা মনে করে যে তারা বাঘেরই বংশধর। নেপালেও 'বাঘ যাত্রা' নামে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটাও এক ধরণের ব্যাঘ্রপূজা। এই উৎসবে পূজকেরা ব্যাঘ্র চিহ্ন ধারণ করে এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। নেপালে ব্যাঘ্র দেবতা 'বাঘ ভৈরব' নামে পরিচিত। যুক্তরাজ্যের* সিরাজপুর অঞ্চলে 'বাঘেশ্বর' নামে এক ব্যাঘ্রদেবতার পূজা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি ছোট নাগপুরের সাঁওতালদের মধ্যেও ব্যাঘ্র পূজার রীতি প্রচলিত আছে। বিহারের কৃষকেরা কোন কোন অঞ্চলে এক ধরণের ব্যাঘ্রপূজা করে থাকে—এরা ব্যাঘ্র দেবতা 'বনরাজা' নামে পরিচিত। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হোসাঙ্গাবাদের কুকু উপজাতির মানুষ 'বাঘদেও' নামে এক ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করে। বেরারেও এই বাঘদেওর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হোসাঙ্গাবাদের ব্যাঘ্র পূজকেরা 'ভোমকা' নামে পরিচিত। যদি কখনও কোন বাঘ গ্রামে প্রবেশ করে ধ্বংস কাজে মত্ত হয় তখন এই ভোমকারা ব্যাঘ্র দেবতার কাছে গিয়ে তাঁর উদ্দেশে পূজা দেয়।

দাক্ষিণাত্যেও এই ধরণের ব্যাঘ্র পূজা প্রচলিত আছে। ত্রিচিনাপল্লী জেলার একটি গ্রামে একটি ব্যাঘ্রের ওপর তিন তিনটি পুরুষ মূর্তিকে উপবিষ্ট দেখা যাবে। সম্ভবত এই মূর্তিগুলি প্রাচীনকালের কোন ব্যাঘ্র দেবতারই প্রতিনিধি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে সব উপজাতীয় শ্রেণীর মানুষ অরণ্যে বসবাস করত, তাদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে ব্যাঘ্র পূজা প্রচলিত ছিল। আর এই ব্যাঘ্রপূজার সংস্কার শুরু হয়েছিল মুখ্যত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। বাংলা দীর্ঘকাল ধরেই অরণ্য বেষ্টিত, বিশেষত সুন্দরবনের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' যা নাকি বাংলার গৌরব সেই বাঘ এখানকার দীর্ঘদিনের এক বাসিন্দা। সেই কারণেই সম্ভবত বাংলায় ব্যাঘ্রপূজার রীতি বহুকাল ধরেই প্রচলিত।[৫] অবশ্য বাংলায় যে ভাবে ব্যাঘ্রপূজা অনুষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে মধ্য ভারতের যে সব অঞ্চলে ব্যাঘ্রপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার

* বর্তমান উত্তরপ্রদেশ।

কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় যে ব্যাঘ্রপূজার নির্দিষ্ট কোন রীতি বাইরে থেকে বাংলায় প্রবেশ লাভ করে নি। বাংলার বাইরে বসবাসকারী অনার্যদের মধ্যে যাঁরা ব্যাঘ্রপূজায় বিশ্বাসী সেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সঙ্গে বাঘের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক কিন্তু সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে অনুপস্থিত। বাংলার বাইরে বসবাসকারী কোন কোন অনার্য সমাজে বাঘ টোটেম[৬] হিসেবেই শ্রদ্ধা কিংবা ভক্তি পেয়ে থাকে, কিন্তু বাংলা দেশে ব্যাঘ্র পূজার পেছনে রয়েছে মুখ্যত সাময়িক ব্যাঘ্রভীতি।

বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাঘের টোটেম সম্পর্ক নেই। শহর জীবন প্রসারলাভ করার ফলে বাঙ্গালী সমাজ থেকে ব্যাঘ্রভীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বাংলা অত্যন্ত জনবহুল স্থান। সুন্দরবন ছাড়া বাংলায় তেমন কোন বনও নেই, তাও আবার সুন্দরবনের সর্বত্র মানুষের বসবাসও লক্ষণীয়। এই কারণেই বাংলায় ব্যাঘ্র পূজার প্রসার তেমন ঘটেনি। এই সাময়িক এবং স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ পশু পূজার রীতি সম্ভবত শুরু হয়েছিল এখানে নগরজীবনের প্রসার লাভের আগে। কিন্তু এখন আর এই ধরণের পূজার্চনার কথা তেমন শোনা যায় না।

বাংলায় যাঁকে বাঘের দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, তিনি হলেন দক্ষিণরায়। যদিও দক্ষিণরায়কে দেবতার সম্মান ও পূজার্চনা লাভের অধিকারী বলে বিবেচনা করা হয় তবু উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বাঘ মোটেই আদরণীয় বলে বিবেচিত হয় না, বরং তা প্রয়োজন মতো হত্যার যোগ্য বলেই গণ্য। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলার বাঘ টোটেম সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। দেবতার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়, কারণ, ইনি হলেন বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের আরাধিত দেবতা। বাংলার দক্ষিণ দিকেই রয়েছে সুন্দরবন, আর এখানেই বসবাস করে বিখ্যাত সেই বাঘ। এই কারণেই ব্যাঘ্র দেবতাকে এখানে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের দেবতা বলে বিশ্বাস করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিকারী ছিলেন। ইনি তীর-ধনুকের সাহায্যে বহু বাঘ এবং কুমীর শিকার করেছিলেন। এবং এ-ই তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করেছে। আরও বলা হয় যে এই দক্ষিণরায় ছিলেন যশোহরের ব্রহ্মানগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। যখন থেকে ইনি নিম্ন বাংলার শাসক হন তখন থেকেই ইনি ভাঁটিশ্বর[৭] উপাধি লাভ করেন [দক্ষিণ পরগণা অথবা আঠারটি ভাঁটির শাসক]। হয়ত এইসব

গল্প-কাহিনীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে। যেমন ক্যাপ্টেন পোল নামে দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে এক ইংরেজ শিকারীর মৃত্যু হলে স্থানীয় জনগণ তাকে ভগবান জ্ঞানে পূজার্চনা দিতে থাকে ; উদ্দেশ্য, যাতে ঐ পোল সাহেবের আত্মা বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যাপারে তাদের সহায়তা করে।[৮]

দক্ষিণরায়ের পূজার স্থানের অধিকাংশই দেখা যাবে ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত। সাধারণত যে সব মানুষ এই বনে বাস করেন তাঁরা হচ্ছেন : মউল্যা, মলাঙ্গি, পোদ, বাগ্দী, বুনো, কাঠুরে, শিকারী, মাঝি ;—এঁরাই দক্ষিণরায়ের পূজা করে থাকেন। কোন কোন গ্রামে, যেখানে ভদ্রলোকের বাস, সেখানেও দক্ষিণরায়ের মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সাধারণত প্রাচীন কোন বটবৃক্ষের তলায় অথবা কোন পিপুল গাছের তলায়, অথবা নিম কিংবা বুনো আপেল গাছের তলদেশে দক্ষিণরায়ের থান দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে একটা মাটির ঢিবি, আবার কোন স্থানে সিঁদুর মাখান একটি প্রস্তরখণ্ড, আবার কোথাও বা বিচিত্র এক মুণ্ড দেব-বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দেবতা প্রায় সর্বক্ষেত্রে শুভ্র মস্তক বিশিষ্ট গাছের তলদেশে পূজিত হয়—আর এক্ষেত্রে গাছগুলির অবস্থান হয় সুন্দরবনের প্রায় প্রতিটি খাল বা নদীর তীরে। দক্ষিণরায়ের বিশেষ পূজার্চনার দিন হল মকর সংক্রান্তি। তাছাড়া বছরের অন্য যে কোন সময়েই প্রয়োজন মত অথবা মানসিক কোন বাসনা পূরণ উপলক্ষ্যে ইনি পূজিত হন। দক্ষিণ-রায়ের কাহিনীকে অবলম্বন করে এক বা একাধিক বর্ণনামূলক কাহিনী-কাব্য রচিত হয়েছে, এগুলি 'রায়মঙ্গল' কাব্য নামে পরিচিত।

দক্ষিণরায় হলেন গ্রাম বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় পুরুষ দেবতা।[৯] অবশ্য উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই ব্যাঘ্র দেবতাকে পুরুষ রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। এই দেবতা-কল্পনায় উচ্চ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বিধৃত। ইনি দৈবী বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, হাতে তীর-ধনুক এবং ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উপবিষ্ট।[১০] যদিও দক্ষিণ রায়ের এই বিবরণ আমরা তাঁকে নিয়ে রচিত কাব্য-কাহিনীগুলিতে পাই, কিন্তু বর্ণিত এই মূর্তিতে তাঁর পূজার্চনার রীতি তেমন প্রচলিত নয়। ব্যাঘ্রদেবতার এই রমণীয় কল্পনা আদিম যুগের প্রস্তর পূজায় বিশ্বাসী মানুষদের কল্পনার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত এবং উচ্চাঙ্গের। তাই মনে হয়, ব্যাঘ্র দেবতার পরিকল্পনা অনেক পরবর্তীকালের এবং তা পৌরাণিক প্রভাবমুক্ত।

বাংলার লোকসাহিত্য বাঘের গল্পে সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ণনামূলক কাব্য

ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের সঙ্গে বাঘের অনুরূপ চরিত্র কামদলের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে মানব চরিত্রের ধাঁচে বাঘের জন্ম থেকে শুরু করে তার সমগ্র জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যের কোথাও বাঘ-দেবতা দক্ষিণরায়ের কোন প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবেও উল্লেখিত হয় নি। তাই বলা চলে দক্ষিণরায়ের কাহিনী এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাহিনী এবং এই কাহিনীর উদ্ভব ও বিস্তারের ক্ষেত্র অন্যত্র। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের অসীম সাহসী ক্রিয়াকলাপ নিয়েই মধ্যযুগের কয়েকজন কবি রচনা করেছিলেন বিবরণাত্মক কাব্য 'রায়মঙ্গল'। এইসব কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন কৃষ্ণরাম দাস। কৃষ্ণরাম বলেছেন একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে স্বয়ং দক্ষিণরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে কাব্যের যে কাহিনীটি দিয়েছিলেন, তা এই:

রাজা প্রভাকর এক সাধুর মুখ থেকে অবগত হয়ে শিবের আরাধনা করে একটি পুত্র সন্তান লাভের বরপ্রাপ্ত হন। দক্ষিণরায়ই সেই পুত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। রাজা বন পরিষ্কার করে একটা নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে দক্ষিণরায় ধর্মকেতুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপর দুজনে যোগ-বলে স্থূল দেহ ত্যাগ করে চলে যান কৈলাসে। হরের বরে দক্ষিণরায় দক্ষিণের অধীশ্বর হন এবং প্রথমে এই নগরীতে পূজার্চনা লাভ করেন। দক্ষিণরায় বলছেন, 'কালু রায় আমাকে হিজলী নগরীতে পাঠান কিন্তু সেখানে রাজা আমাকে কোন, প্রকার সম্মান দেখান না। তাই আমি প্রথমে রাজপুত্রকে হত্যা করি তারপর তাকে আবার জীবিত করে তুলি। এর ফলে রাজা আমাকে নানা উপচারে পূজা করেন। বড়দহের দেবদত্ত নামে এক বণিক দীর্ঘদিন ধরে তুরঙ্গ নামে এক সহরে বন্দী ছিল। আমার নির্দেশে তার ছেলে পুষ্পদত্ত সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে পিতার সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করে। পথিমধ্যে সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে এবং রাজাকে সে এই অদ্ভুত দৃশ্যের বিষয়টি জানায়। কিন্তু পরে রাজাকে সে এই দৃশ্য আর দেখাতে না পারায় রাজা পুষ্পদত্তের মুণ্ডচ্ছেদের নির্দেশ দেন। পুষ্পদত্ত তার মৃত্যুকালে আমার শরণ নেয়। তখন আমি তাকে রক্ষা করি।[১১] আমি, দক্ষিণরায় বাঘ-সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে স্বয়ং রাজা সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে সৈন্যবাহিনী-সমেত নিহত করি। তখন রাণী আমার পূজার্চনা করেন। এতে আমি খুশী হই এবং সকলকে আবার বাঁচিয়ে তুলি। রাজকন্যার সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিবাহ হয় এবং পিতা পুত্র দুজনেই নিজেদের দেশে ফিরে আসে। পুষ্পদত্ত এরপর আমার জন্যে মন্দির

নির্মাণ করে দেয় এবং গভীরভক্তি সহকারে আমার পুজার্চনা করে। এ-বিষয়ে তিনি একটি চরণ গান করেন এবং আমিও নিজ আবাসে চলে যাই'।[১২]

এ-পর্যন্ত রায়মঙ্গলের একটি মাত্র সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে।[১৩] পূর্ব-বর্ণিত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ সম্বলিত আর কোন পুঁথি রচিত হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। দেবদত্ত এবং পুষ্পদত্তের কাহিনী আনুপূর্বিক রচিত হয়েছিল এবং তা সম্পূর্ণ রূপেই পাওয়া যায়। যেহেতু সে-কাহিনী এ-পর্যন্ত কোথাও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি, তাই এখানে তার উল্লেখ করলাম :

এক বণিক বড়দহের রতাই বাউল্যাকে বাণিজ্য তরী নির্মাণের আদেশ দেয়। এই আদেশ পেয়ে রতাই তার ছয় ভাইকে নিয়ে নৌকা করে গভীর অরণ্যে কাঠ সংগ্রহে যায়। সেখানে সে অনেক কাঠ সংগ্রহও করে। সাত-আটটি নৌকা কাঠে পূর্ণ করা হয়। তারা যখন ফিরবে বলে প্রস্তুত এমন সময়ে একটা বৃহদাকৃতির গাছ তাদের নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে গাছটাকে কেটে ফেলল। এখন এই গাছটাই ছিল দক্ষিণরায়ের আবাসস্থল। স্বভাবতঃই দক্ষিণরায় অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর অনুচর ছ-টি বাঘকে আদেশ করলেন রতাইকে এবং তার ছেলে বাদে তার ছ-ভাইকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে। সেইমত বাঘেরা রতাইয়ের ছ-ভাইকে হত্যা করল। রতাই ভায়েদের শোকে মুহ্যমান হয়ে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে তার ছেলেকে বাড়ী ফিরে যেতে বললো। সে যখন আত্মহত্যা করতে যাবে, ঠিক তখনই কেন রতাইয়ের ছ-ভাই মারা গেছে তার কারণ জানিয়ে দৈববাণী হলো। দৈববাণীতে রতাইকে আরও বলা হলো যে, সে যদি তার ছ-ভাইকে ফিরে পেতে চায় তবে তার ছেলেকে দক্ষিণরায়ের কাছে বলি দিতে হবে। সেই স্থানেই রতাই দক্ষিণরায়ের পূজা করে তার কাছে পুত্রকে বলি দিল। দক্ষিণরায় এতে রতাইয়ের উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তার ছ-ভাই এবং ছেলেকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে রতাই বড়্যাহারে ফিরে এলো। এখন যে বণিক রতাইকে নৌকা তৈরীতে নিযুক্ত করেছিল তার নাম পুষ্প দত্ত। রতাইয়ের কাছ থেকে এই পুষ্প দত্ত দক্ষিণরায়ের মহিমা এবং মহদাশয়তার কথা জানতে পারে।

নৌকা তৈরীর জন্যে একজন দক্ষ কারিগর পাওয়ার উদ্দেশ্যে পুষ্প দত্ত একটি স্বর্ণ পেটিকা নিয়ে সমগ্র নগরীতে দেখাতে লাগলেন এবং ঘোষণা করলেন যে,

যে নিজেকে দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে সে যেন এই স্বর্ণ পেটিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। এদিকে কৈলাশেশ্বর মহাদেব হনুমান এবং বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন পুষ্প দত্তের জন্যে নৌকা তৈরী করতে। এঁরা দুজনে মানুষের ছদ্মবেশে এসে সাতটি নৌকা মাত্র সাত দণ্ডের মধ্যে তৈরী করে দিয়ে বণিককে স্বপ্নে আনুপূর্বিক সব বৃত্তান্ত জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুষ্প দত্ত শ্রেষ্ঠ নৌকাটিকে যথাবিহিত পূজা করে তার নাম দিল মধুকর। তারপর দেশের রাজার কাছে গেল বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার অনুমতি গ্রহণ করতে। রাজার নাম মদন। পুষ্প দত্ত রাজাকে বলেন যে তার দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রতি বিরূপ। কেন না সে তার জন্মের পর থেকে তার নিজের পিতাকেই দেখে নি, যেহেতু রাজা তাঁকে বিদেশ থেকে মূল্যবান সম্পদ আনতে প্রেরণ করেছিলেন। যদিও পুষ্প দত্ত সুখেই নিজেদের বাড়ীতে বসবাস করে, তবু তার মনে সুখ নেই। এই কথা বলতে বলতে তার দু-চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। নিজের মার কথা বলতে গিয়ে পুষ্প দত্ত বলেন যে তাঁর অবস্থা অবর্ণনীয়। পিতার নিরুদ্দেশের দিন থেকে তিনি অন্ন পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। তাই সে পিতার সন্ধানে যেতে চায়। ধীমান রাজা যেন তাকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন।

রাজা পুষ্প দত্তকে বললেন যে, সে অনেক ছোট তার পক্ষে পিতার সন্ধানে বিপদ সংকুল পথে যাত্রা করা সমীচীন নয়। তার বাবা ঠিকই ফিরে আসবেন। সে বরং তার বাড়ী ফিরে যাক এবং সুখে বসবাস করুক। কিন্তু পুষ্প দত্ত নাছোড়বান্দা। সে রাজাকে অনেক অনুনয় করে বলল যে তাকে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিতে। সে আরও ভয় দেখালো যে তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি না দিলে সে তার জীবন আর রাখবে না। শেষে রাজা তাকে অনুমতি দিলেন।

পুষ্প দত্ত বিদেশ যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। সে তার নৌকাগুলিতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই করতে লাগল। পুষ্প দত্তের জননী সুশীলা পুষ্প দত্তের বিদেশ যাত্রার কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। তিনি দক্ষিণরায়ের পুজো করে তাঁকে নানাভাবে আরাধনা করলেন। দক্ষিণরায়কে হাতজোড় করে সুশীলা বললেন যে তিনি ছাড়া তাঁর আর আশ্রয় দাতা কেউ নেই। তাই তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর ছেলে বিদেশে বিপদে পড়লে তাকে যেন তিনি [দক্ষিণরায়] রক্ষা করেন। সুশীলা আরও বললেন যে, দক্ষিণরায়ের মুখশ্রী

ইন্দ্রকেও হার মানায়, আর সৌন্দর্য লজ্জা দেয় মদনকে। তিনি দক্ষিণের রাজা, তিনি ছাড়া তাকে আর কে রক্ষা করবে? এই একটি মাত্র তাঁর সন্তান। অতএব অনুগ্রহপূর্বক তিনি যেন তাকে রক্ষা করেন।

সুশীলার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণরায় আবির্ভূত হয়ে সুশীলাকে বললেন যে, তিনি তার ছেলেকে সব রকম বিপদ এবং অসুবিধা থেকেই রক্ষা করবেন। বিদায়কালে সুশীলা পুষ্প দত্তকে দক্ষিণরায়ের পূজার প্রসাদ দিলেন, আর বলে দিলেন যে যখনই সে কোন বিপদে পড়বে, অথবা যদি তার জীবন-হানির আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সে যেন তখনই দক্ষিণরায়ের পদযুগল ধ্যান করে। এরপর মাঝির হাতে তাকে সমর্পণ করে সুশীলা তাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেয় যে, মাঝি সর্বদাই পুষ্প দত্তের মঙ্গল দেখবে।

মধুকরে চড়ে শুভ মুহূর্তে পুষ্প দত্ত পিতার সন্ধানে যাত্রা করল। সে বড়দহ পেছনে ফেলে কল্যাণপুরে বলরামের পূজা সেরে হোগলাপাথরঘাটা অতিক্রম করে, বারাসাতে অনাদ্য শিবের আরাধনা করে খানিয়ায় গিয়ে পৌছায়। সেখানে সে দক্ষিণরায়ের পবিত্র স্থানে পূজা দেয় এবং এর ঠিক সামনের পীরের আস্তানা দেখে পুষ্প দত্ত মাঝিকে তাঁর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করে। সেখানে বেশ কয়েকজন ফকির একটা মাটির ঢিবিকে পূজা করছিল। মাটির ঢিবি ছাড়া একটি মুণ্ডাকৃতি দক্ষিণরায়েব মূর্তিও সেখানে ছিল। মাঝি তাকে বড় গাজি খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মীমাংসার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করল। একদা দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খাঁর মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ বাঁধে, কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারেন না। সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায় দেখে ঈশ্বর অর্ধ-কৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বরের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। সন্ধির সর্তানুযায়ী ঠিক হয় যে সমগ্র ভাঁটির [দক্ষিণের জেলাগুলি] অধীশ্বর হবেন দক্ষিণরায় এবং হিজলীর শাসন ভাগ পড়বে কালুরায়ের ওপর আরও ঠিক হয় যে, প্রত্যেকেই বড় গাজী খাঁকে সমান সম্মান দেখাবে। সেই থেকে একই জায়গায় বড় গাজী খাঁর মাজার ও দক্ষিণরায়ের মুণ্ড মূর্তি একই সঙ্গে পূজিত হতে দেখা যায়। এখানেও তাই বড় গাজী খাঁর মাজার হচ্ছে ঐ মাটির ঢিবিটি, মুণ্ড মূর্তিটি হচ্ছে দক্ষিণরায়ের।[১৪]

এইভাবে পুষ্প দত্ত দক্ষিণরায়ের পুণ্য পীঠস্থানের পূজার পর সেই স্থান ত্যাগ করে ছত্রভোগে উপনীত হয়ে সেখানে ত্রিপুর ভবানীর পূজা দেয়। এর পর মগরা পার হয়ে সে গঙ্গাসাগরে গিয়ে পৌছায়। সেখানে পুষ্প দত্তকে সগর

রাজার বংশের বিনাশ এবং ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত জানানো হয়। তারপর রাজা মার্তণ্ডের রাজ্য অতিক্রম করে সে উড়িষ্যার উপকূলে গিয়ে পৌছায়। এখানে জগন্নাথের পূজা সেরে সে রামেশ্বরে যায়। এখানে পুষ্প দত্ত তার সঙ্গী সাথীদের রামায়ণের গল্প শোনায়। এখান থেকে তাঁরা সদল-বলে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে শ্রীহস্তদহ, কাকদাদহ এবং জোকাদহ।

পথ অতিক্রমের সময় সমুদ্র-মধ্যে নানা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে কখনও তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, আবার কখনও আনন্দ পায়। রাজদহে পৌছে পুষ্প দত্ত একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পায়; তার মনে হয় সমুদ্র বক্ষে একটা অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুষ্প দত্ত খুব আনন্দিত হয়ে তার সঙ্গী সাথীদের এই দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার সাথীরা সামনে শুধু জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সমুদ্র অতিক্রম করে পুষ্প দত্ত অবশেষে তুরঙ্গ নামে এক শহরে গিয়ে পৌছায়। সে তার সাতটি নৌকাকে তীরে নিয়ে আসে। তাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে দেশের রাজা রাজ্যের প্রধান কোতোয়ালকে পুষ্প দত্ত সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে পাঠান। উপযুক্ত উপঢৌকনসহ পুষ্প দত্ত তীরে নামে এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে যাত্রা করে। পথে তুরঙ্গ শহরের অতুল ঐশ্বর্য তার চোখে পড়ে।[১৫] তুরঙ্গের রাজা সুরথের সামনে উপহারগুলি রেখে পুষ্প দত্ত তাঁকে আপন পরিচয় দান করে।

রাজা সুরথ সস্নেহে তাঁকে তুরঙ্গে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন পুষ্প দত্ত বলে যে সে বাস করে বড়দহ নগরীতে। তাদের দেশের রাজা বিখ্যাত মদন। তার পিতার নাম দেবদত্ত। বাণিজ্য ব্যপদেশে তার পিতা বহুদিন বাড়ী থেকে যাত্রা করে আর ফেরেন নি। সে তাই তার পিতার সন্ধানে এসেছে। তার নাম পুষ্প দত্ত।

রাজা সুরথ পুষ্প দত্তের অপূর্ব পিতৃভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, তারপর সে কি করে তুরঙ্গে এসেছে তা জানতে চাইলেন। পুষ্প দত্ত তার আগমন পথের বিবরণ প্রসঙ্গে সমুদ্র বক্ষে দৃষ্ট অপূর্ব প্রাসাদের বিষয় উল্লেখ করে। এই অসম্ভব কাহিনী শুনে রাজা পুষ্প দত্তকে তিরস্কার করেন।

পুষ্প দত্ত তখন রাজাকে বলে তিনি তার ওপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন। যদিও সমুদ্র বক্ষে তাঁকে বৃহৎ প্রাসাদ দেখান খুবই কঠিন কাজ, তবুও সে যদি তাঁকে তা না দেখাতে পারে তাহলে তিনি তার সাতটা নৌকাই বাজেয়াপ্ত

করবেন এবং তার শিরোশ্ছেদ করবেন—এতে তার কোনোও আপত্তিই থাকবে না।

রাজা বললেন বেশ, যদি তিনি সমুদ্রবক্ষে বিশাল প্রাসাদ দেখতে পান তাহলে তাঁর রাজকন্যা সহ সমগ্র রাজত্বই পুষ্প দত্তকে দিয়ে দেবেন। পুষ্প দত্তও তখন রাজাকে নিয়ে রাজদহে গেল, কিন্তু কোন ভাবেই সে তাঁকে সমুদ্রবক্ষে প্রাসাদ দেখাতে পারলো না। পরিণামে পুষ্প দত্ত বন্দী হল। রাজা প্রধান কোতোয়ালকে আদেশ দিলেন—পরের দিন পুষ্প দত্তের শিরোশ্ছেদ করতে।

কারাগারে বন্দী পুষ্প দত্ত দক্ষিণরায়ের স্তব ও বন্দনাগান করতে লাগল। পুষ্প দত্তের স্তবে দক্ষিণরায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন তিনি তাকে রক্ষা করবেন। পরদিন যখন নগর কোটাল তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলেন, হঠাৎ সেখানে বেশ কিছু বাঘ এসে হাজির এবং তাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। ব্যাঘ্রবাহিনী সমগ্র তুরঙ্গ নগরীকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে লাগলো। যারা পারল তারা পালিয়ে বাঁচলো, আর যারা ব্যাঘ্রবাহিনীর সামনে পড়ল তারা মারা পড়ল। রাজার সৈন্যবাহিনীও ব্যাঘ্রবাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বাঘেরা নগর কোটালের গোঁফদাড়ি ছিঁড়ে ফেলল, তারপর তার মাথা ভাঙ্গলো। দক্ষিণরায় নিজে রথে চড়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলেন তাঁর সেবককে রক্ষা করতে। রাজা সুরথ দক্ষিণরায়কে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত রাজা পরাস্ত হলেন।

রাণীর কাছে রাজার মৃত্যু সংবাদ পৌছাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সখীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলেন। তাঁর মাথার চুল অবিন্যস্ত, দু-চোখে জলের ধারা। যেখানে রাজার মৃতদেহ পড়ে ছিল সেখানে রাণী রক্তের স্রোত দেখতে পেলেন। তারপর মৃত রাজার পায়ের তলায় পড়ে স্বীয় শিরে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, কোন্ দেবতার সঙ্গে শত্রুতার ফলে তাঁদের এই অবস্থা হল? দক্ষিণরায় তখন দৈববাণী করলেন যে, তিনি দক্ষিণের রাজা। কিন্তু তাঁরা তাঁকে পূজা করেন না, শুধু তাই নয়, তাঁদের এতখানি ঔদ্ধত্য যে তাঁরা তাঁরই সেবিকার সন্তানের প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব এখন আর কেঁদে কি হবে? এর পর দক্ষিণরায় বললেন যে, রাণী যদি শপথ করেন যে তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে পুষ্প দত্তের বিবাহ দেবেন, রাজা যদি দক্ষিণরায়ের মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন, তবেই তিনি তাঁর স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবেন।

রাণী দক্ষিণরায়ের সর্তে সম্মত হলেন। তৎক্ষণাৎ দক্ষিণরায় অমৃত কুণ্ডের

জল সিঞ্চনে মৃত রাজা এবং তাঁর সৈনিকদের পুনরুজ্জীবিত করলেন। রাজা এবং রাণী তাঁহাদের একমাত্র কন্যা রত্নাবতীকে পুষ্প দত্তের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণরায় পুষ্প দত্তকে জানিয়ে দিয়েছেন যে পুষ্প দত্তের পিতা রাজা সুরথের কারাগারেই বন্দী। তাই সে যেন বিবাহের আগে পিতার মুক্তি চেয়ে নেয়। পুষ্প দত্ত রাজার কাছে দাবী জানাল যে, কারাগারের সমস্ত বন্দীদের দায়িত্ব যেন তাকে দেওয়া হয়। রাজাও সে দাবী মেনে নিলেন। বন্দীদের মধ্য থেকে পুষ্প দত্ত অনুসন্ধান করে তার পিতাকে খুঁজে পেল। পিতার বন্দী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবদত্ত জানালেন যে তিনি রাজদহে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখেছিলেন এবং এই রাজাকে সেই বিষয়ে বলেছিলেন। কিন্তু রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যেই তাঁকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে বন্দী হতে হয়। এরপর পুষ্প দত্ত দেবদত্তের কাছে নিজের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করল। এইভাবে পিতাপুত্র পুনর্মিলিত হল। এরপর পুষ্প দত্ত রত্নাবতীকে বিবাহ করে, পিতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করল, তারপর নিজেদের বাণিজ্যতরী নিয়ে দেশে ফিরল। রাজা মদন দক্ষিণরায়ের বীর্যবত্তা এবং অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে তাঁর আরাধনা করল। দেবদত্ত তাঁর পূজা করলেন। এইভাবে সর্বত্র দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত হল।[১৬]

এই বর্ণনার মূল অংশটুকু দক্ষিণরায় এবং বড়ো গাজী খাঁর সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া বাকি অংশটুকু চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের আদর্শে রচিত। এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য রচনা এবং যার সাহিত্যিক মূল্যও অপরিসীম। দক্ষিণরায় এবং বড়ো গাজী খাঁর কাহিনীর মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিকতা আছে বলে আমরা মনে করতে পারি। যেহেতু দক্ষিণরায়কে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করা হয়, সেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায় বড়ো গাজি খাঁরও কিছুটা ঐতিহাসিক পরিচয় রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

কয়েকজন মুসলমান কবিকেও উক্ত বিষয় অবলম্বনে কাব্য-কবিতা রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। বাঘ হিন্দুদের মত মুসলমানদের কাছেও ভীতিপ্রদ। তাই দুই সম্প্রদায়ই একই ভাবে বাঘের হাত থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হয়েছে। নিম্ন বাংলায় বিশেষত ২৪ পরগণার মুসলমান সমাজে রায়মঙ্গলের মূল অংশের অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবত উভয় সমাজে প্রচলিত কাহিনীই একই উৎসক্ষেত্র থেকে জন্মলাভ করেছে। 'বনবিবি-জহুর'[১৭] নামের একটি

কাব্যে হিন্দুদের দক্ষিণরায় কল্পনা এবং মুসলমানদের 'বনবিবি'[১৮] কল্পনার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এটি নিঃসন্দেহে রায়মঙ্গলের মুসলমান সংস্করণ। সংক্ষেপে এর কাহিনীটি এই রকম:

কলিঙ্গ নগরে এক সওদাগর বাস করত। একদিন সে মধু ও মোম সংগ্রহ করবার জন্য সুন্দরবনের দিকে নৌকা যাত্রা করল। এই যাত্রায় তার ভাইপোও সঙ্গী হল। এই বালকটির নাম দুখে। দুখে ছিল তার দরিদ্র বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠিয়ে তার মা সজল নয়নে বনবিবিকে বললো যে, তিনি হচ্ছেন বিপদহারিণী মা—তাই তিনি যেন তার একমাত্র পুত্র দুখেকে রক্ষা করেন।

এদিকে দলবল নিয়ে সওদাগর গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। দক্ষিণরায়ের পূজা করে সওদাগর নৌকা থেকে নামল, দুখে রইল নৌকার মধ্যেই। সারাদিন সওদাগর ও তার লোকজনেরা বনের মধ্যে ঘুরে এক ফোঁটাও মধু পেল না। দক্ষিণরায় ছলনা করে সমস্ত মধু গোপন করে ফেলেছিলেন। দারুণ হতাশা নিয়ে সন্ধ্যায় সওদাগর নৌকায় ফিরে এল, এবং অবসন্ন দেহে অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দক্ষিণরায় আবির্ভূত হলে সওদাগর তাঁকে তার দুরবস্থার কথা জানাল। এবং তিনি যদি তাঁকে মধু ও মোম পেতে সাহায্য না করেন তবে তাঁর চোখের সামনেই সে দেহত্যাগ করবে। দক্ষিণরায় বললেন দুখেকে তাঁর কাছে বলি দিলে সওদাগরের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। প্রথমে সওদাগর অস্বীকৃত হলেও পরে দুখেকে দক্ষিণরায়ের কাছে বলি দেবে বলেই মনস্থ করে; এতে দক্ষিণরায় প্রসন্ন হয়ে তার নৌকা মোম ও মধুতে পূর্ণ করে দিলেন। দেশে ফেরার সময় সওদাগর দুখেকে নৌকা থেকে ঠেলে জলেতে নামিয়ে দিল। দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসে। অমনি দক্ষিণরায় বাঘের রূপে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। তখন দুখে দুই চোখ বুজে বনবিবির শরণ নিল। বনবিবিও দুখের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হলেন এবং দুখেকে কোলে নিলেন। ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায় তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন। বনবিবির আদেশে তার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণ রায়কে বন থেকে তাড়িয়ে দিতে গেল। দক্ষিণ রায় তখন জেন্দা গাজির [বা বড় গাজী খাঁ] শরণাপন্ন হলেন। জেন্দা গাজি তাঁকে অভয় দিলেন। বনবিবিও তখন দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করলেন। এই কাব্যে দক্ষিণরায়ের ওপর বনবিবির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রায়মঙ্গলে বড়ো গাজি খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সন্ধি দেখান হয়েছে।

রায়মঙ্গলের পরবর্তীকালের একজন কবি কৃষ্ণরাম 'রায়মঙ্গলে'র প্রাচীনতম কবিরূপে মাধবাচার্যের নামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই মাধবাচার্যের কাব্য-কাহিনীতে সন্তুষ্ট না হয়ে দক্ষিণরায় পরবর্তীকালের একজন কবিকে স্বপ্নের মাধ্যমে এই কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনার নির্দেশ দেন। এই মাধবাচার্যই সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি মাধবাচার্য। কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত মাধবাচার্যের লেখা 'রায়মঙ্গলে'র কোন পুঁথির সন্ধান পাইনি। চট্টগ্রামে মাধবাচার্য রচিত 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য প্রচলিত আছে; কিন্তু কোথাও রায়মঙ্গলের উল্লেখমাত্র নেই।

এঁর পরেই উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণরামের, যিনি 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। বাংলায় বর্ণনামূলক লোককাব্য রচনার রীতি অনুসরণে এই কবিও তাঁর কাব্য রচনার উৎসের বিবরণ দিয়েছেন। সেটা এই রকম:

খাসপুর নামে একটা বিখ্যাত পরগণা আছে। এখানেই আছে বাদিস্যা নামে একটি জায়গা। সেখানে ভাদ্রমাসের এক কোন সোমবার কবি গিয়ে রাত্রে এক গোয়ালার গৃহে নিদ্রা গিয়েছিলেন। ভোর রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে একজন বিরাট পুরুষ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ। এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষের হাতে রয়েছে তীর ও ধনুক। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি দক্ষিণরায় এবং তাঁকে নিয়ে পাঁচালী রচনা করার নির্দেশ দিলেন কবিকে। তারপর সেই পাঁচালী নিম্নবঙ্গের জেলাগুলিতে [যা আঠারো-ভাঁটি অঞ্চল নামে পরিচিত] প্রচারিত হবে। দক্ষিণরায় বলেন যে, পূর্বে মাধবাচার্য নামে এক কবি তাঁর সম্মানে কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর পছন্দ নয়। মাধবাচার্য তাঁর কাব্যে দণ্ডদানের ক্ষেত্রটির কথা উল্লেখ করেন নি, শুধু তাই নয়, সেখানে বণিককে দিয়ে পাশা খেলান হয়েছে। কাব্যটির ভাষাও খুব শ্লীল নয়। তাঁর সম্মানে রচিত কাব্যের বিষয়ে গায়েনদেরও কোন জ্ঞান বা পরিচয় নেই। তাই তারা জাগরণ পালা গান করে, অন্যান্য পালাও গায়। গায়েনরা যতসব আজে বাজে গান গায় এবং যা নাকি মউল্যা এবং মলঙ্গিরা খুব রসিয়ে উপভোগ করে। অতএব কবি যাতে ভালভাবে কাব্য রচনা করতে সমর্থ হন, সেজন্যে দক্ষিণরায় কবিকে এক বিশেষ ক্ষমতা দান করেই অন্তর্হিত হয়ে যান। সমগ্র বাংলা লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা একটা অদ্বিতীয় ব্যাপার। দক্ষিণরায় কবিকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি কেউ তাঁর কাব্য পছন্দ না করে তাহলে কবি

যেন বাঘের সাহায্যে তাকে এবং তার সমগ্র পরিবারকে ধ্বংস করেন এবং এই ধ্বংস করার ক্ষমতাও তিনি কবিকে দেন। কিন্তু তবুও কবি নিজেকে এই কাব্য রচনার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন না; নিজেকে এক্ষেত্রে একান্ত বালক বলেই মনে করলেন। তখন দেবতা নিজেই নিজের প্রশংসাসূচক গান গাইতে থাকেন এবং কবিকে তা শোনান। এর ফলেই কবি কৃষ্ণরাম পাঁচালী রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রায়ের পাদপদ্ম শরণে দেবকার্যে ব্রতী হন।

এখানে কবি তাঁর কাব্য রচনার সময়-কালও নির্দেশ করেছেন, যা থেকে জানা যাচ্ছে যে কবি কৃষ্ণরাম তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন ১৬০৮ শকাব্দে অথবা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে।

এই কাব্যে কবি তাঁর যে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা হল এই রকম: কৃষ্ণরাম; যিনি নাকি অনন্যমনা হয়ে রায়মঙ্গল রচনা করেছেন তিনি হলেন নিমতার কায়স্থ বংশোদ্ভূত ভগবতী দাসের পুত্র! এর থেকেই আমরা জানতে পারি যে কবির বাসস্থান ছিল নিমতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই নিমতা সম্পর্কে বলেছেন যে কবি কৃষ্ণরামের বাসস্থান এই নিমতায়—কলকাতা থেকে ৪ ক্রোশ উত্তরে এবং বেলঘরিয়া রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে আধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণরাম তাঁর জীবিতাবস্থাতেই কবি হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। এখনও এমন দু-একজনের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে যারা কবি কৃষ্ণরামের কথা স্মরণ করেন এবং কবির ভিটেটাও দেখিয়ে দেন। একশ বছরের ওপর গ্রামের ঐ বাসভূমিতে কেউ বাস করে না, তবু প্রধান লোকেরা বাস্তুটি যে কবির তা বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণরামের পরিবারের কেউ নেই এবং তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কিনা তা কেউ বলতে পারে না।

কৃষ্ণরাম ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কাব্য রচনায় তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচিত সংস্কৃত শ্লোকের বাংলায় পদ্য অনুবাদে যথার্থ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবির পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যকে সরল এবং রমণীয় হতে বাধা সৃষ্টি করেনি।

এ-পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হয় তাঁরা ছাড়া এই বিষয়ে আর কেউ কিছু লিখেছেন কি না এমন আমার জানা নেই। রায়মঙ্গলের দেবতা নিছকই স্থানীয় এক জনপ্রিয় দেবতা। এই কাব্য এবং দেব-কল্পনা দুই-এর-ই উদ্ভব নিম্নবঙ্গ অঞ্চলে হয়েছিল; কারণ এই অঞ্চলেই বাঘের উৎপাত বা ব্যাঘ্রজনিত ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। সম্ভবত তাই অন্যত্র এর প্রসার ঘটতে পারে নি।

আমরা প্রাচীন কোনো হিন্দু পুরাণ অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে ব্যাঘ্র-বাহন কোন দেবতার পরিচয় পাই না। তাই এই কাব্য এবং দেবতা সম্পূর্ণরূপে বাংলা দেশের বিশেষ এক অঞ্চলের কল্পনা-ক্ষেত্রে জন্ম লাভ করেছে। এর পাশাপাশি উত্তর বাংলায় আর একজন জনপ্রিয় ব্যাঘ্র দেবতা আছেন যাঁর নাম সোনারায়, যাঁর নামে একাধিক পালা রচিত হয়েছে। মৈমনসিংহ জেলার পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এক ব্যাঘ্র দেবতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে 'বাঘাইর বয়াত' নামে যা প্রচলিত। নিম্ন বঙ্গের মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আজও বড়ো গাজি খান, কালু গাজি খান, বনবিবি প্রমুখের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের কর্তৃত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যেমন দক্ষিণরায়ের প্রভাব বিদ্যমান, তেমনি হিন্দুদের মধ্যে বড়ো গাজি খান এবং কালু গাজি খানের প্রভাব একইভাবে বর্তমান রয়েছে। সমগ্র ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে বড়ো গাজি খান, কালু গাজি খান এবং দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা রূপে হিন্দু এবং মুসলমানগণের কাছ থেকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। এই কারণেই—এই দেবতাদের নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকেই।

অনুবাদক : ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১. J. Marshal : *Mohenjo-daro and the Indus Civilization* [London 1931] : Part 1, plate XII, fig 17.

২. W. Crooke : *The Popular Religion and Folk-Lore of Northern India* [Westminister 1896] : vol. II : p. 211.

৩. দ্র. Vernier Elwin : *The Baiga* [London 1939] : p. 351 : পাদটীকা।

৪. H. Whitehead : *The Village Gods of South India* : [Calcutta 1911] : p. 98.

৫. S. C. Mitra : '*On Some Curious Cults of Southern and Western Bengal* : 'The Journal of the Anthropological Society of Bombay' : vol. XI : pp. 438-54.

৬. এই শব্দটির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : J. G. Frazer : *Totemism and Exogamy* [London 1910] : vol. I : pp 3-4.

এ-ছাড়াও ব্যাঘ্র-কৌম সম্পর্কে আধুনিকতম বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : **Verrier Elwin : *The Agaria* [Bombay 1943] : pp 78 :** পাদটীকা ; **Shamrao Hivale : *The Pardhans* [Bombay 1946] : pp 34 :** পাদটীকা ; **Verrier Elwin : *Folk-Tales of Mahakoshal* [Bombay 1944] : pp 393, 416, 424.**

৭. **S. C. Mitra : *On a Mussalmani Legand* : 'Journal of the Department of Letters' : vol. X : p 167.**

৮. **L. S. S. O' Mally : *Popular Hinduism* [Cambridge 1953] : p 174.**

৯. দ্রষ্টব্য **S. C. Mitra : *The Cult of Dakshin Ray in Southern Bengal* : 'Hindushan Review' : January 1922 : pp 167-71.**

১০. দক্ষিণরায়ের আলোকচিত্রের জন্যে ***The Journal of the Anthropological Society of Bombay* : vol. III : p 105** দ্রষ্টব্য।

১১. পুঁথিতে এ-রূপ পাঠ আছে : 'সঙ্কটে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ'। কেউ কেউ একটু পরিবর্তিত পাঠ গ্রহণ করেছেন যার ফলে সমগ্র অর্থটিই অন্য রকম হয়ে গেছে। দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' [কলিকাতা ১৯৪০] : পৃ. ৬৩৮।

১২. কৃষ্ণরাম দাস : 'রায়মঙ্গল' : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি : সং ১৭৯৮ : পৃ. ১ খ।

১৩. এই কাহিনীর জন্য ১২নং টীকার পুঁথি দ্রষ্টব্য।

১৪. নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে [কলিকাতা ১৩০৪ বঙ্গাব্দ : খণ্ড ৮ : পৃ. ২৮৯] রায়মঙ্গলের কাহিনী এখানেই শেষ করেছেন।

১৫. ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' [পৃ. ৬৪৫] গ্রন্থে বলেছেন যে এর পরবর্তী অংশের পুঁথি খণ্ডিত। কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহ যে এই পুঁথি বলতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পুঁথির কথাই বলেছেন ; কারণ তিনি রায়মঙ্গল কাব্যের আলোচনা কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিকেই প্রমাণ মেনেছেন [তুলনীয় পৃ. ৬৩৯]। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি নিজে চোখে পুঁথিটি দেখেন নি। কেননা যেখান থেকে তিনি পুঁথিটিকে খণ্ডিত বলেছেন তার পরে আরো দশটি পাতা [১৬-২৫] বা কুড়িটি পৃষ্ঠা রয়েছে। এবং উপরোক্ত যে কাহিনীসার তার সবটাই ওখানে পাওয়া

যাবে। বর্তমান আলোচনায় আমরা উক্ত পুথিটির আগাগোড়াই ব্যবহার করেছি।

১৬. পূর্ব কথিত পুঁথি এখানেই শেষ। অধিকন্তু, আমরা এ-ও দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বের কাহিনীসারে আমরা যে পুষ্প দত্ত এবং দেবদত্তের উল্লেখ করেছি তার পূর্ণাঙ্গ পাঠও এখানে রয়েছে। অবশ্য শেষের দিকে পুঁথির কয়েকটি চরণ খোয়া যেতে পারে; কারণ, শেষের দিকে অন্ত্যমিলের ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এতে কাহিনী-বর্ণনায় কোন ত্রুটি ঘটে নি। এবং এই অঙ্গহানিও উপেক্ষণীয়। এ-ছাড়া ঐ বিষয় নিয়ে আর কোন কাহিনীও রচিত হয় নি। রাজা প্রভাকর এবং কালু রায়কে নিয়ে উক্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনী কাব্যের মতো, সম্ভবত পৃথক কোন কাব্য আর রচিত হয় নি। এমনকি রায়মঙ্গলের মধ্যে তা সন্নিবিষ্টও হয় নি।

ড সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [পূর্বকথিত সংস্করণের ৬৩৯-৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দেবদত্ত রাজদহে এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করেন, কিন্তু পুঁথিতে সে-রকম কিছুই নেই। পুঁথি অনুসারে পুষ্প দত্তই রাজদহে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেন—দেবদত্ত নন। তা-ছাড়া, তাঁর মতে পুঁথি যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তার 'বিন্দুমাত্র আভাষ কাব্যটির মধ্যে নেই।

১৭. মুনশী বৈয়ুদ্দীন কর্তৃক রচিত এবং ১২৮৪ বঙ্গাব্দে [১৮৭৮ খ্রী:] ৩৩৭।২, অপার চিৎপুর রোড, কোলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮. কেউ কেউ এই বনবিবিকে অরণ্যদেবী রূপে মনে করেছেন [দ্রষ্টব্য: **S. C. Mitra : *On a Mussalmani Legend* : Journal of the Department of Letters : Vol. X. p 167**]। বনদুর্গা নামে বঙ্গীয় হিন্দুদের এক লৌকিক দেবী আছেন, যাঁর সঙ্গে ঐ মুসলমানী কাহিনীর বনবিবির গোত্রে মিল থাকলেও চরিত্রে নেই। নেপালে দুর্গা বা 'নব পত্রিকা'-র নামই বনদুর্গা।

১৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: 'কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল': সাহিত্য: ১৩০০ বঙ্গাব্দ [১৮৯৪] : পৃ. ১১২-৩।

২০. প্রবন্ধকারের অনুমতিক্রমে ***Man in India*** ত্রৈমাসিকের **Vol. XXVII. March 1947. No. I** সংখ্যার ***The Tiger-Cult and Its Literature in Lower Bengal*** প্রবন্ধটির অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হয়েছে।



পুরাতত্ত্ব ও লোককথায় ব্যাঘ্র সংস্কৃতি

হাইন্‌শ মোদে [১৯১৩—]

নিবন্ধটির শিরোনাম একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে, সেজন্য এ-নাম বাছাই-এর একটা ব্যাখ্যাও প্রয়োজন। পুরাতত্ত্বে 'সংস্কৃতি' কথাটি ব্যবহৃত হয় কোন এক বিশেষ সাংস্কৃতিক একককে অপর-সব সংস্কৃতি থেকে অনন্যরূপে দেখানোর উদ্দেশ্যে। অনেক সময় সিরিয়া মেসোপটেমিয়ার হালাফ সংস্কৃতি কিংবা উরুক সংস্কৃতির মত, নয়ত কখনো কখনো বৃহত্তর আঞ্চলিক নাম দিয়ে বোঝানো সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার মত পুরাতাত্ত্বিক খননের অঞ্চলের নামে সেই অনন্যতার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই নামটা কতকটা আকস্মিকভাবে এসেছে। অন্য অনেক সুবিধাজনক সংজ্ঞা দিয়ে সে নাম অনায়াসে বদলানোও চলতে পারতো। সেজন্য আমাদেরও ইচ্ছা হলো, ব্যাঘ্র ও সিংহ এই নাম দুটি দিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এককের অনন্যতা প্রতিপাদন, আর অন্য কিছু নয়—অন্তত যুক্তিবিস্তারের প্রথম স্তরগুলিকে তো বটেই। আরও নানা উপাদানের সাহায্য নিয়ে তবেই ব্যাপকতর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হতে পারে।

কতকগুলি সুপরিচিত ঘটনা নিয়ে আলোচনার মুখপাত করা যাক। হরপ্পা সংস্কৃতি, কিংবা সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতিতে সীলমোহরগুলির উপরে যে অসাধারণ জীবের ছাপ আছে তা হল ব্যাঘ্র, সিংহ সেখানে অনুপস্থিত। আবার ঐ সমসাময়িক মিশরের সংস্কৃতির তুলনা করলে দেখবো সেখানে সিংহ হচ্ছে রাজকীয় জীবের মর্যাদায় সমাসীন, অথচ প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতিতে ব্যাঘ্রের কোন প্রতীক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ থেকে স্বচ্ছন্দে এই তর্ক করা চলে যে মিশরীয়েরা শুধুমাত্র সিংহের পরিচয় জানত, আর পুরাকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাঘ্রই ছিল একমাত্র সুপরিচিত। হয়ত এ যুক্তি মিশরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিতরূপে সে-কথা বলতে পারি না। সে দেশে সিংহও সত্যি সত্যি থাকতে পারে, অন্তত পরবর্তী যুগে তো ঐ সব অঞ্চলে সিংহের বসবাস ছিলই।

তর্কটি আরও টেনে নিয়ে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করা যাক। পরবর্তী কালে ভারতে, অন্তত মৌর্যযুগ থেকে জীবজগতের মধ্যে সিংহকেই রাজকীয় মর্যাদা

লাভ করতে দেখা যায়। অথচ একথা অনেকেরই জানা যে বিদেশী পর্যটকেরা সকলে ব্যাঘ্রকেই ভারতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। সারনাথ স্তূপশীর্ষের যে সিংহমূর্তি আজও ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে স্বীকৃত সেই সিংহ যে ভারতের অতি দুর্লভ জীব তা খুব কম লোকই জানে—কিন্তু 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর দেখা মিলবে পৃথিবীর যে কোন চিড়িয়াখানায়। সিংহলেও সিংহ রাজকীয় মর্যাদায় মহিমময়। অথচ সবাই জানে যে এই দ্বীপে ব্যাঘ্র বা সিংহ কিছুই দেখা যায় না এবং কোনকালে তারা ছিল বলেও জানা নেই।

আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, একটি বিশেষ দেশ বা সাংস্কৃতিক অঞ্চলে সত্যি সত্যি কোন জীবের অস্তিত্বের পরিচয় থাকা আর সেই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে ঐ জীবের প্রতীকের প্রতিফলনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। এটা অবশ্য ঠিক যে একেবারে আদিতে ঘটনা কখনই এমন হতে পারে না। প্রাচীনতম যুগে যে-দেশে কোন জীবের প্রতীকী প্রতিফলনের পরিচয় পাওয়া যায় সে দেশে ঐ বিশেষ জীবটির সমসাময়িক অস্তিত্ব বর্তমান থাকতেই হবে—অনুমানের ক্ষেত্রে তো বটেই। যে সব অবস্থার কথা বলা হল তার জন্য দায়ী হচ্ছে ঐতিহাসিক উন্নতি, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য নানা সাংস্কৃতিক ঝোঁক।

এসব জীবের ছবি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পাওয়া গেলেও এদের সম্বন্ধে সাহিত্যিক নজীর যা পাওয়া যায় তা অনেক পরের—এ সবের কোনটাই পাঁচ হাজার বছর আগের পৃথিবীতে ছিল না। এর চেয়েও সাম্প্রতিক হচ্ছে লোক-সংস্কৃতি সংক্রান্ত যত দিনক্ষণ ঠিক করা নথিগত সাক্ষ্যসাবুদের উপাদান। এসব উপাদানের অধিকাংশেরই ভিত্তি হচ্ছে সাম্প্রতিক কিংবা বর্তমানকালে সংগ্রাহক ও পণ্ডিতদের যত মন্তব্য ও টোকচা। তা সত্ত্বেও এর অর্থ এই নয় যে, উপাদানগুলির উদ্ভবের কাল আর তাদের নথিভুক্ত করার সময়ের নির্দিষ্ট কাল দুটোই এক। যেসব ছবির প্রতীকের দিন ক্ষণ পুরাতাত্ত্বিক মতে স্থির করা হয়েছে তাদেরই একমাত্র প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা চলে, কেন না তাছাড়া অতি প্রাচীনতম লিখিত নজীরও তার আগের কোন শ্রুতিগত উপাদানের লিখিত পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। লোককথাগুলো যে লিপিবদ্ধ হবার অনেক আগের জিনিস এটি এখন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তেই পরিগণিত হয়েছে। তাদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ নিতে হবে আনুষঙ্গিক অন্য নানা উপাদানের সঙ্গে তুলনা করে।

দিন ক্ষণের সাক্ষ্যসাবুদের সমস্যা ছাড়াও আমাদের বক্তব্য বিষয়টি সম্পর্কে আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। শিল্প ও সাহিত্যের জীবজন্তুর আকৃতি মানুষের মাধ্যমেই অঙ্কিত হয়। সুতরাং তা সমস্তই হচ্ছে মানুষের চোখে দেখা আর প্রায়ই যা হয়, মানুষের কল্পনায় জারিত। জীবজন্তু দেখতে যেমন স্বাভাবিক আকৃতির হতে পারে, তাদের বর্ণনাও তেমনি স্বাভাবিক হতে পারে; আবার তা মানুষের আপন প্রতিভাপ্রসূত স্বাধীন আবিষ্কার হওয়াও বিচিত্র নয়। এ ব্যাপারে লোক-কথার উপাদানসমূহ হচ্ছে সবচেয়ে বোধগর্ভ উৎস; কারণ তাদের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় নানা ধরণের সম্ভাবনা। চিত্রধর্মী অনুকৃতি অনেক সীমিত। কারণ তা যেমন চেনা যেতে পারে, তেমনি নাও চেনা যেতে পারে। যদি প্রকৃত প্রতিকৃতি থেকে সে-সব চিত্র খুবই বিকৃত হয়, তাহলে টীকামূলক ব্যাখ্যা ব্যতীত তাদের সনাক্ত করার কোন উপায়ই নেই। আবার পুরাকালের সাহিত্যে এসব খুঁটিনাটি বর্ণনারও তেমন বাহুল্য নেই।

প্রাচীন সাহিত্য ও লোককথা থেকে আমরা জানি যে প্রায় সব দেশেই সিংহ পশুরাজ বলে স্বীকৃত। এ বিষয়ে জাতক, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান, প্রাচীন জার্মান ও ফরাসী পশুরগল্প ও অসংখ্য বিচ্ছিন্ন গল্প ও কাহিনীর উল্লেখ করা চলে। সিংহকে পশুরাজ বলে স্বীকার করা হলে এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত বলে ধরে নিতে হবে। প্রকৃতিতে সিংহকে দেখে অন্য জীবেরা ভয় পেতে পারে, কিন্তু সে কখনই পশুরাজ, অর্থাৎ সার্বভৌম সম্রাট বলতে যা বোঝায় তা নয়। জীব-জগতকে লোক-জগতের প্রতিফলন রূপে এক্ষেত্রে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু লোক-জগতের ইতিহাস এক দীর্ঘ বিবর্তনের; আর আমরা জানি যে এর প্রথম যুগে রাজা ও তাঁর সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই জানা ছিল না। সুতরাং এই প্রাচীন যুগে একটি জীব অপর সব জীবের উপর রাজত্ব করবে কখনই সে ধারণা জন্মাতে পারে না। আদি মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক যুগের কথা বাদ দিলে ব্যাপারটিকে সহজবোধ্য করার জন্যে বলা চলে যে মানবসমাজে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি ও নগররাষ্ট্রের উৎপত্তি অর্থাৎ সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এ ঘটনার একটা মোটামুটি দিন ঠিক করা যায় ৫০০০ বছর আগে, যেটাকে আমরা ইতিপূর্বে লিখিত নজীরের কাল বলে গ্রহণ করেছিলাম। অতএব আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে পশুরাজ রূপে সিংহের আবির্ভাব কাল কোনও ক্রমেই ৫০০০ বছরের আগে ধরা চলে না।

লোককথা-সংগ্রহ ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক নেতৃত্বের প্রতীক রূপে সিংহের রাজকীয়তা ভারতে উত্তম রূপেই স্বীকৃত। এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভারতীয় শিল্পের ভাস্কর্যে খোদিত বুদ্ধদেবের অসংখ্য সিংহাসনের কিংবা রাজারাজড়ারা ও মহান ব্যক্তিদের সিংহ দিয়ে নাম বা উপাধির উল্লেখ না করলেও চলে। ৎসিমার-এর মতে [আলটিণ্ডিসেন লেবেন, বার্লিন, ১৮৭৯, পৃঃ ৭৮-৭৯] ঋগ্বেদে সিংহের সকল অঙ্গের পরিচয় থাকলেও কোথাও তাকে পশুরাজরূপে উল্লেখ করা হয়নি। ৎসিমার বলেন, ব্যাঘ্রের বসতি বাংলার জঙ্গলে ছিল বলে ঋগ্বেদে ব্যাঘ্রের উল্লেখ নেই। [কথিত আছে যে বৈদিক আর্যেরা সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস করে, আর সুরক্ষিত নগরগুলি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একথা সত্য হলে বলতে হয় যে তারা ব্যাঘ্র সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল !—লেখক] এ বিষয়ে ৎসিমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেন না সিন্ধু উপত্যকার আদিম বাসিন্দাদের কাছে সিংহের বদলে ব্যাঘ্র বেশি পরিচিত ছিল। এখানে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সিংহ-ব্যাঘ্রের প্রশ্ন মোটেই ভূগোলগত নয়। এ হচ্ছে ইতিহাসগত ! এই জাতীয় তুলনামূলক বিচারে, চিরকাল যা ভেবে আসা হয়েছে—ব্যাঘ্র মোটেই পশ্চিমাঞ্চলের সিংহের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের প্রতীক রূপে দাঁড়ায় নি। বরঞ্চ একথাই বলা সঙ্গত যে, সিংহ পশুরাজ রূপে যেখানে পরের ঐতিহাসিক যুগে পরিচিত,সেখানে ব্যাঘ্র হচ্ছে অনেক প্রাচীন যুগের পরিচায়ক। অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে তো বটেই। অথর্ববেদে যে সিংহ অপরিচিত না হলেও তার বদলে ব্যাঘ্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই সুপরিচিত ঘটনাটিতেও এই বক্তব্যের কোন বিরোধিতা হয় না; এতে বরঞ্চ এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে অথর্ববেদে এমন অনেক কিছু আছে যা প্রাক্-বৈদিক যুগের।

আমাদের যুক্তি বিস্তার করতে হলে সাময়িকভাবে ভারতকে ছেড়ে পশ্চিম-এশিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। মেসোপটেমিয়ার আদি সুমের সভ্যতার যুগে খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সিংহকে সগৌরবে অধিষ্ঠান করতে দেখা যায়; অর্থাৎ—ঋগ্বেদের যুগের অন্তত হাজার বছর পূর্বের হবে সে ঘটনা। এই মেসোপটেমিয়ায়, সমসাময়িক মিশরের মত সিংহ হচ্ছে রাজকীয়তার পরিচায়ক; সাহিত্যগত ও ছবির নজীর থেকেই তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার ব্যাঘ্রের বেলায় কি হবে ? এতকাল পর্যন্ত একথাই বলে আসা হয়েছে যে ঐ অঞ্চলে ব্যাঘ্রের অস্তিত্ব ছিল অজানা। কিন্তু সাম্প্রতিক পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধতা করা না গেলেও, এর একটা ব্যাখ্যা

দাঁড় করানো চলে। পশ্চিম এশিয়ায় হয়ত ব্যাঘ্রের কোন ভূমিকাই না থাকতে পারে; কিন্তু এখানে তার এক অতি নিকট-আত্মীয়, যাকে হরদম তার বদলে চালিয়ে দেওয়া হয় সেই চিতাবাঘের ভূমিকার অভাব ছিল না। ভারতে যদি যথাক্রম বলতে হয় ব্যাঘ্র-সিংহ, পশ্চিম-এশিয়ায় তবে তাকে বলতে হয় চিতাবাঘ-সিংহ।

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে ১৯৬১-৬২ সালের খননকার্যের ফলে চাতল-হুইউইক অঞ্চলে খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম সহস্রাব্দের এক অত্যুজ্জ্বল ও পরম কৌতূহলোদ্দীপক সংস্কৃতির আবিষ্কার হয়েছে যা সুমেরের চেয়েও অন্তত তিন হাজার বছর আগের। [লণ্ডন ইলাস্‌ট্রেটেড নিউজ-এর ৯ই জুন, ১৬ই জুন ১৯৬২ ও ২৬শে জানুয়ারী, ২রা এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সংখ্যার বহুল চিত্রিত সংখ্যাগুলি আলোচনা করুন। —লেখক]

এখানে আমাদের চোখে পড়ে চিতাবাঘের খোদিত ভাস্কর্য ও আঁকা ছবি; আর তার চেয়েও বড় কথা হল যে, একেবারে রাজকীয় মর্যাদা না পেলেও সমাজের সঙ্গে পশুটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। চাতল-হুইউইক এবং হালিসার-এ বারংবার একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে যার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক চিতাবাঘ। মানুষের পরণে চিতাবাঘের চামড়া; এমন কি স্বয়ং সেই দেবীও পরেছেন চিতাবাঘের চামড়া।

পশ্চিম এশিয়ায় একবার চিতাবাঘের এই প্রাচীন গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অন্যত্র আরও সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আমি হরপ্পা সংস্কৃতি ও সীরীয় এবং ক্রিটো-মীসেনীয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখ করেছিলাম; আর, এখনকার চাতল-হুইউইকে এবং হাসিলার থেকে নতুন নতুন উপকরণ না পাওয়া গেলেও তখনই আদি ক্রীটের শিল্প [মাল্লিয়া কুড়াল ইত্যাদি] এবং ইরাণের শিল্পে [তেপি হিসার-এর ভাস্কর্য ও অসংখ্য ফুলদানীর গায়ে আঁকা ছবি] বর্ণিত চিতাবাঘ ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার শিল্পের সমান্তরালবর্তিতার বিষয়ে মন্তব্য করেছিলাম [মৎ-রচিত 'ইণ্ডিশে ফ্রুই কুলটুরেন', ব্রাসেল, ১৯৪৪ দ্রষ্টব্য]। এখন আমরা আরও বলতে পারি যে মেসোপটেমিয়ার টেল উকাইয়ার মন্দিরে আবিষ্কৃত কতকগুলি আদিতম চিত্রেও চিতাবাঘের

প্রতিকৃতি আছে আর সেখানেও চিতাবাঘের চামড়া গায়ে লোক দেখা যায়। বোঘাজকই-এর কাছে ইয়াজিলিকাইয়ার বিখ্যাত পর্বতে খোদাইকরা চিতাবাঘ-বাহিনী দেবী মূর্তিই এশিয়া মাইনরে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ অবধি এই ধারণার নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ বহন করছে।

চাতল হুইউইক ধরণের আদি পশ্চিম-এশিয়ার সংস্কৃতি-শিল্পে এবং ধর্ম বিষয়ে আশ্চর্যজনক উন্নতির পরিচয় বহন করলেও, বর্তমানে নগর-রাষ্ট্র গঠনের প্রথম স্তরের চেয়ে অন্য উন্নততর কিছু বলে মনে করা চলে না। পরবর্তী সুমের-নগর-রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে এখানে রাজা ও তাঁর দরবারের কোন অস্তিত্বই নেই। এঁরা যে লিপির ব্যবহার জানতেন তারও কোন চিহ্ন নেই। এ ধারণা যদি সত্য হয়, তবে চাতল-হুইউইকে পাওয়া প্রধান প্রধান দু-জাতের পশুর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, অবশ্য আমি এখানে পশুর হাড়গোড় নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না! ষাঁড় ও চিতাবাঘ দু-এরই দেবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর তা যেন উর্বরতা-বিদ্যা ও জীবজন্তুর যাদুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিকারী আর আদি-কৃষিজীবীদের প্রতীক রূপে ধরা হয়েছে একপাল পশুর-পালিকা ও উর্বরতা-বিধাত্রীরূপে দণ্ডায়মানা দেবীর মূর্তিকে! এই দু-টি ধারাই সুস্পষ্টভাবে চিতাবাঘ আর ষাঁড়—এই পশুধর্মী প্রতীক দ্বারা পৃথকীকৃত করা হয়েছে।

এই মন্তব্যগুলিকে ধর্মীয় ইতিহাসের সুপরিচিত ভাষায় অনূদিত করলে দেখা যাবে যে এই দুই দেবীমূর্তি ক্রীট, মেসোপটেমিয়া এবং ভারতেরও একই মাতৃকাদেবীর বিভিন্ন ধারা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তবে ক্রীট এবং পশ্চিম-এশিয়ার কিছুটায় চাতল-হুইউইক ধরণের নারীমূর্তিগুলি আদিরূপেই অবিকৃত থাকলেও মহেনজোদড়োতে পাওয়া শীলমোহরগুলিতে পশুপালিকা নারীমূর্তি যেন রূপান্তরিতা হয়ে পশুপতিতে পরিণত হয়েছেন। মহেনজোদড়োর শীল-মোহরের পশুর পাল পরিবৃত উপবিষ্ট মূর্তি, এবং আরও দুইটি বাঘকে শাসন করে যে দুটি মানবমূর্তি দেখা যায় তা সুস্পষ্টই পুরুষের। [এসব কাহিনী থেকে সৃষ্ট ব্যাঘ্র-কথা বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমার লেখা 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর': দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৫৯ পৃ. ১০-১৪:

পত্রে প্রকাশিত 'প্রাচীনতম ভারতীয় উৎস থেকে লোককথার বিষয়বস্তু অনুসন্ধান' নামক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

অসংখ্য পোড়ামাটির নারী ও পশুর মূর্তি থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, মাতৃকাদেবীর উর্বরতা-বিদ্যার দিকটি হরপ্পাযুগে মোটেই অবিদিত ছিল না। সেই সঙ্গে আমরা এটাও দেখি যে ভারতে চিতাবাঘের স্থান গ্রহণ করেছে ব্যাঘ্র আর ক্রীট ও পশ্চিম-এশিয়ায় পশু-পালিকা দেবী পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতের পশুর সঙ্গে জড়িত হয়েছেন—কখনও কখনও সিংহের সঙ্গেও।

এ থেকে সংক্ষেপে বলা চলে যে চিতাবাঘ ও ব্যাঘ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সিংহের চেয়ে প্রাচীনতর, এবং আদিতে তারা জড়িত ছিল কোন দেবীর সঙ্গে। সুতরাং তাদের তাৎপর্যও ছিল ধর্মীয়। অপর পক্ষে সিংহ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিষয়ে নবীনতর, আদিতে সে ছিল রাজকীয় প্রতীকস্বরূপ, কখনো কখনো মাত্র চিতাবাঘ-ব্যাঘ্রের ধর্মীয় তাৎপর্যের স্থান তাকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। পুরাতাত্ত্বিক উপকরণের ভিত্তিতে বিচারলব্ধ এই ফল এখন লোককথা সংক্রান্ত উপাদানের বিচারে ব্যবহার করা চলতে পারে। এখানে আমরা ইওরোপীয় লোককথার কথা ছেড়ে দিতে পারি; সেখানে সিংহ পশুরাজরূপেই অবস্থান করছে—তবে স্পষ্টতই পূর্বাঞ্চল থেকে সে ধারণা ইওরোপে গিয়েছে। কি সিংহ, কি চিতাবাঘ, কি বাঘ কোনটাই স্থানীয় জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের সমস্যা সম্পর্কে ভারতের লোককথা থেকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক উপকরণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোককথাগুলির আলোচনা করলে আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারবো যে শ্রুতি-কথায় ব্যাঘ্রের ভূমিকা বিরাট; আর শাস্ত্রীয় যুগ থেকে বিখ্যাত ও রচনাভঙ্গীতে অপূর্ব যত কাহিনী তার সমস্তগুলিতে সিংহের প্রাধান্য বেশি।

বিশেষ খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়েও গোড়াতে আরও দুটো মন্তব্য করা চলে। অনেক সময়েই সিংহ ও ব্যাঘ্র উভয়ে উভয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে যেসব লিখিত কাহিনী অবলম্বনে শ্রুতি-কথা রচিত হয় তাতে সিংহকে ব্যাঘ্রের আদর্শে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। এসব কাহিনীতে আর একটি মজার মিল হচ্ছে যে, যে সিংহের সঙ্গী কিংবা বিরোধী সে ব্যাঘ্রেরও সঙ্গী বা বিরোধী। এই ভূমিকাতে আবার পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য দুটি পশু

পাই—শেয়াল আর খেঁকশিয়াল। অবশ্য এই পশু দুটি যেভাবে অদলবদল হয় তাতে চিতাবাঘ আর ব্যাঘ্রের সঙ্গে যতটা তুলনা করা চলে সিংহ আর ব্যাঘ্রের সঙ্গে ততটা নয়। আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে সিংহ বা ব্যাঘ্র একটি ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে উল্লিখিত হয়; আর শেয়াল-খেঁকশিয়াল কিংবা চিতাবাঘ-ব্যাঘ্র একই বিষয়বস্তুর প্রতীক, এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে গল্পের কথকের কাছে তারা একই।

তর্ক উঠতে পারে যে খেঁকশিয়ালকে সিংহ কি ব্যাঘ্রের সঙ্গী রূপে কল্পনা করা চলে না এই জন্য যে পশুদুটিকে প্রকৃতিতে কখনই একসঙ্গে দেখা যায় না। অথচ শেয়াল মৃতদেহ ভক্ষণে অভ্যস্ত বলে শোনা যায় এবং সেজন্য বৃহৎ পশুর সঙ্গী রূপে থেকে তাদের সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট মৃতদেহ ভক্ষণে এরা বেশ রপ্ত। ইওরোপের কথাগুলিতে সিংহ আর খেঁকশিয়ালের সম্পর্ক পাওয়া যায়; তা হচ্ছে আমাদের এক অজানা পশুর সঙ্গে একটি পরিচিত পশুর বন্ধুত্বের ঘটনা। খেঁকশিয়ালের বাসভূমির সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে বুঝতে পারি যে এই একসঙ্গে থাকার অর্থ এই নয় যে তারা কোন পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে—এসব গল্প বন্ধুদের পারস্পারিক মিলনের কোন কাহিনী নয়; তাদের বরঞ্চ পশুর ভিতর মানবসমাজের প্রতিফলন রূপে কল্পনা করা যায়—মানব সমাজের রাজা ও তাঁর উপদেষ্টা মন্ত্রীর ছবিই দেখি এদের মিলনের মধ্যে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে প্রকৃতিতে সত্য সত্যই শেয়াল সিংহের সঙ্গী বলে মূল শেয়ালের পরিবর্তরূপে খেঁকশেয়ালীর উল্লেখ হয়েছে। তবে আমি এই সব পশুর অভ্যাস ও আচার সম্বন্ধে যে খুব বেশি ওয়াকিবহাল, তা নয়। কিন্তু ভারতের গল্পকথার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমার মনে হয় যে প্রকৃতিতে যদি আদৌ দুটি পশুর মধ্যে কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তা আদিতম সম্পর্ক ছিল ব্যাঘ্র ও শেয়ালের মধ্যে।

ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়্যারীতে সার রিচার্ড টেম্পল বলেছেন যে, সাধারণের মতে ব্যাঘ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শেয়াল তাদের শিকারের সন্ধান যুগিয়ে দেয় আর সে শ্রমের প্রতিদান স্বরূপ তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের অধিকার লাভ করে। প্রত্যেক ব্যাঘ্রেরই এক একটি বিশিষ্ট শেয়াল থাকে। এ থেকেই সংস্কৃতে শেয়াল ব্যাঘ্রনায়ক বা ব্যাঘ্রের চালক বলে বর্ণিত। [ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়্যারী, ১৮৮২ সালের নভেম্বর সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

আমার ধারণা পণ্ডিতদের তরফে এখনো বিষয়টির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এ দায় অর্পিত হয়েছে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের উপরে; তাঁদের কাজ হল ভারতের কথা ও কাহিনীতে খেঁকশিয়াল আর শেয়ালের ভূমিকা অনুশীলন। শাস্ত্রীয় সংস্কৃতে এই দুই জীবের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা হয়েছে; কিন্তু বাংলার বেলায় মোটেই তা হয়নি—সেখানে দেখেছি একই নামে পশু দুটিকে ডাকা হয়। কোনও দিন হয়ত একথা প্রমাণিত হবে যে শেয়ালের আদি ভূমিকা থেকেই ঐ সব কাহিনীর ব্যাঘ্রের আদি ভূমিকার প্রমাণ মেলে; তবু যতদিন ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র থেকে সমস্যাটির সমাধান না হচ্ছে ততদিন সঙ্গী পশুটির সমস্যাকে আমি দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বই আরোপ করে আসব।

ভারতের কাহিনীগুলিতে যেখানেই সিংহের উল্লেখ আছে সেখানেই সে রাজকীয় মহিমায় সমাসীন। সাধারণত সে ভয়ংকর, অকুতোভয়, আবার কখনো কখনো বেজায় বোকা, সঙ্গীসাথীর পরামর্শের উপর একান্ত নির্ভরশীল। এই সব বোকামী আর অন্যের পরামর্শে চলার বিষয় নিয়েই কতকগুলি কাহিনীতে সিংহ আর ব্যাঘ্রের গুণাবলীর সংযোজন ঘটেছে। আগে যে কথা বলেছি, ব্যাঘ্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলবত্তা; কিন্তু সে নিঃসঙ্গ জীব। আপন পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে মাত্র তার সামাজিকতা সীমাবদ্ধ; তবে প্রয়োজন হলে কোন বৃহত্তর কারণে আপন জাতির সাহায্যের উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যাঘ্রের সঙ্গেও সে মিলিত হয়ে থাকে।

এখানেও আমরা ঐতিহাসিক অনুক্রম লক্ষ্য করতে পারি। ব্যাঘ্র স্পষ্টতই আদিতম সমাজের সভ্যরূপে কল্পিত—সত্যিকার সভ্য পশুজগতে মানব আচরণের প্রতিফলন মাত্র নয়। সমাজের অন্যান্য সভ্যের থেকে সে সামাজিক কার্যকলাপের জন্য পৃথক বলে বিবেচিত হয় না, অসাধারণ বীর্যবত্তার জন্যেই সে স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে। আর নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে তার পার্থক্য বয়স ও যৌনবিচারে। কি মানুষ কি পশু সমাজের এই সব বিভিন্ন জীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন যাতে সিংহের মত প্রভুত্ব ও বশ্যতাবাদীর সামান্যতম রেশও নেই —সম্প্রসারিত গোষ্ঠীজীবনের মধ্যেই সমস্ত সম্পর্ক সীমাবদ্ধ। শেয়াল তাকে 'মামা' বলে ডাকে, এমনকি মানুষও ঐ একই পারিবারিক সম্পর্ক পাতায় তার সঙ্গে। এর শ্রেষ্ঠ ও পরিণততম উদাহরণ হচ্ছে বাংলার 'মালঞ্চমালা' কাহিনীটির সদাশয় ও উপকারী ব্যাঘ্র পরিবারটি।

ব্যাঘ্র যে ঈশ্বরপ্রতিম বা অলৌকিক শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত তা খুবই স্বাভাবিক। যদি তাকে আদিম সমাজের অন্যতম সভ্যরূপে কল্পনা করা হত, তা হলে সে এমন এক পরাক্রমশালী ও বলিষ্ঠ সভ্য হয়ে দাঁড়াত যার শক্তি বাড়িয়ে না দেখে উপায় থাকত না। এই জন্যেই ব্যাঘ্র শিবের সঙ্গে যুক্ত— শিব ব্যাঘ্রাসনে ধ্যান করেন, আবার দুর্গাও। দেবীর কাহিনীতে ও ছবিতে সিংহ ও ব্যাঘ্র উভয় পশুরই উল্লেখ আছে; তবে শিবের সঙ্গে ব্যাঘ্রের সম্পর্ক থেকে হয়ত একথা বলা চলে যে দেবীর সঙ্গেও আগের সম্পর্ক ছিল ব্যাঘ্রেরই।

বাংলার কাহিনীগুলিতে বাঘ কখনো কখনো দেবতারূপে দেখা দেয় [ব্রাড্‌লী বার্টঃ 'বেঙ্গল ফেয়ারী টেলস্', লণ্ডন ১৯২০, ত্রয়োদশ সংখ্যক কাহিনী 'লক্ষ্মীর দান' দ্রষ্টব্য]; এমন কি দক্ষিণরায় নামে দেবতারূপে পূজাও পেয়ে থাকে। আদিবাসীদের লোককথায় ব্যাঘ্রের স্থান আরও উঁচুতে, আর এটাও লক্ষণীয় যে সাঁওতাল লোককথাদির মত অনেকক্ষেত্রে তাকে আর চিতা বাঘকে স্থান বদলাবদলি করা হয়। [দ্রষ্টব্যঃ শরৎচন্দ্র মিত্রের নিম্নলিখিত তিনটি নিবন্ধে এবিষয়ে অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে—জার্ণাল অব দি এ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অফ বোম্বে, তৃতীয় খণ্ড, ৫-৬০ পৃঃ, তৃতীয় খণ্ড ১৫৮-১৬৩ আর জার্ণাল অফ এ্যাসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—৬৫তম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ ১-৮ পৃ.]।

সচরাচর লোককথাগুলির বাঘ বলিষ্ঠ হলেও বোকা; সেজন্য সহজেই চালাক মানুষ কিংবা তার সঙ্গী ধূর্ত শেয়ালের কাছে সে জব্দ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে,উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর লেখা টুনটুনির বই-এর 'বুদ্ধুর বাপ' লোককথাটিতে একজন চালাক গ্রামবাসী একটি বাঘকে বেদম প্রহার করে; এমন কি সে একটি লেজ হারিয়েও লোকটিকে দেবতা বলে মনে করে। কখনো কখনো এসব কাহিনীতে ব্যাঘকে বোকা রাক্ষসের সঙ্গে স্থান বদলাবদলি করা চলে। যেখানেই রাক্ষস আর ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে সেখানেই গল্পের মধ্যে বাঘ্রকে প্রাচীনতর চরিত্র বলে মনে হয়। যেমন, কয়েকটি বাঘ গাছের উপরের একজন লোককে ধরতে চাইলে একের পিঠে অন্যে চড়ে উঁচু হবার চেষ্টা করে; আবার রাক্ষসেও যে অমন ভাবে চেষ্টা করছে তার গল্পও আছে। তবে একথা ভাবতে কষ্ট হয় যে রাক্ষসেরা সোজাসুজি গাছে না উঠে কেন ঐভাবে একের পিঠের উপর অন্যে উঠতে যাবে।

বাঘ ও শেয়ালের সম্পর্কের বিষয়ে একটা কথা বলা চলে যে, প্রয়াত অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, বাংলায় লোকে ব্যাঘ্রের নাম ভয়ে উচ্চারণ না করে শেয়াল বলে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত।

এ পর্যন্ত আমরা যে নেতিবাচক সাক্ষ্য পেলাম তা আর ইতিবাচক ফলাফল এ দুই-এর সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। এসমস্ত লোককথাতেই আমরা কোথাও ব্যাঘ্রকে পশুরাজের ভূমিকাতে দেখতে পাই না। আমরা এই পশুটিকে পাই কোন না কোন দেবদেবীর সঙ্গে জড়িত নয়ত স্বয়ং দেবতারূপেই। ব্যাঘ্রকে আমরা ক্রমে ক্রমে মানুষের এক অতি পরাক্রমশালী ও ভয়ংকর—তবে নির্বোধ—শত্রুরূপে দেখতে পাই—যে অতি সহজেই তার কাছে হার মানে; আর শেষে দেখি তাকে সদাচারী, উপকারী জীবরূপে—যে অযোগ্য শত্রুদের হাত থেকে ন্যায়পরায়ণ মানুষকে রক্ষা করে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সিংহের উপরে আরোপিত বিশিষ্টতাগুলির থেকে বিপরীত। এসমস্ত হচ্ছে আদিম সমাজ-মানসের বিশিষ্ট চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশ; সেখানেই এগুলি সিংহের উপর আরোপিত বিশিষ্টতা থেকে প্রাচীনতর। সিংহের বিশিষ্টতাগুলি হচ্ছে উচ্চতর সভ্যতার প্রতীক।

আমরা যদি লোক-কথার সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদির সঙ্গে পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য প্রমাণাদি মেলাই তাহলে একথা বলা সম্ভব হবে যে পশ্চিম-এশিয়ায় প্রাচীন যে সব উপকরণের কথা বলা হয়েছে—তার প্রাগৈতিহাসিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যাঘ্র-উপাখ্যানের মিল আছে। ব্যাঘ্রকে কোন বিশেষ সংস্কৃতির প্রতীক রূপে ধরলে বলা চলে যে, শুধুমাত্র পশ্চিম-এশিয়াতেই নয়, ভারতেও পুবাকালের সংস্কৃতির পূর্বে একটি প্রাচীনতর চিতাবাঘ-ব্যাঘ্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

ঐ একই কারণে আমরা হরপ্পা সংস্কৃতিকে সুমের সংস্কৃতির চেয়ে প্রাচীন বলে উল্লেখ করতে পারি। উভয়েই নগর-রাষ্ট্রভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতা একথা ঠিক, কিন্তু সাংস্কৃতিক বংশানুক্রমে হরপ্পার সংস্কৃতি সুমের সংস্কৃতির তুলনায় চাতল-হুইউইক সংস্কৃতির নিকটতর। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই বক্তব্যে সঠিক সন তারিখের কোন অদলবদল ঘটছে না। যে কোন দিন নতুন পুরাতাত্ত্বিক উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে—তা থেকে আমরাও নতুনতর কোন সংযোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারি।

'মালঞ্চমালা' কাহিনীটি সবেমাত্র একশ বছরেরও কম দিন হল লিপিবদ্ধ হয়েছে ; সেইজন্য মৌর্য-সিংহকে তার চেয়ে প্রাচীনতর বলা চলে না। যারা প্রাচীনত্বকে, তথা লোককথার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিকে, উপেক্ষা করতে চান তাঁরা যেন হরপ্পার ব্যাঘ্র দেখে সতর্ক হন ![1]

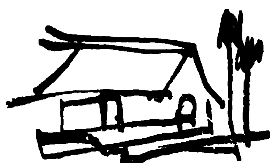
অনুবাদক : শ্রীঅরুণকুমার রায়।
শ্রীগিরীন চক্রবর্তী।

---

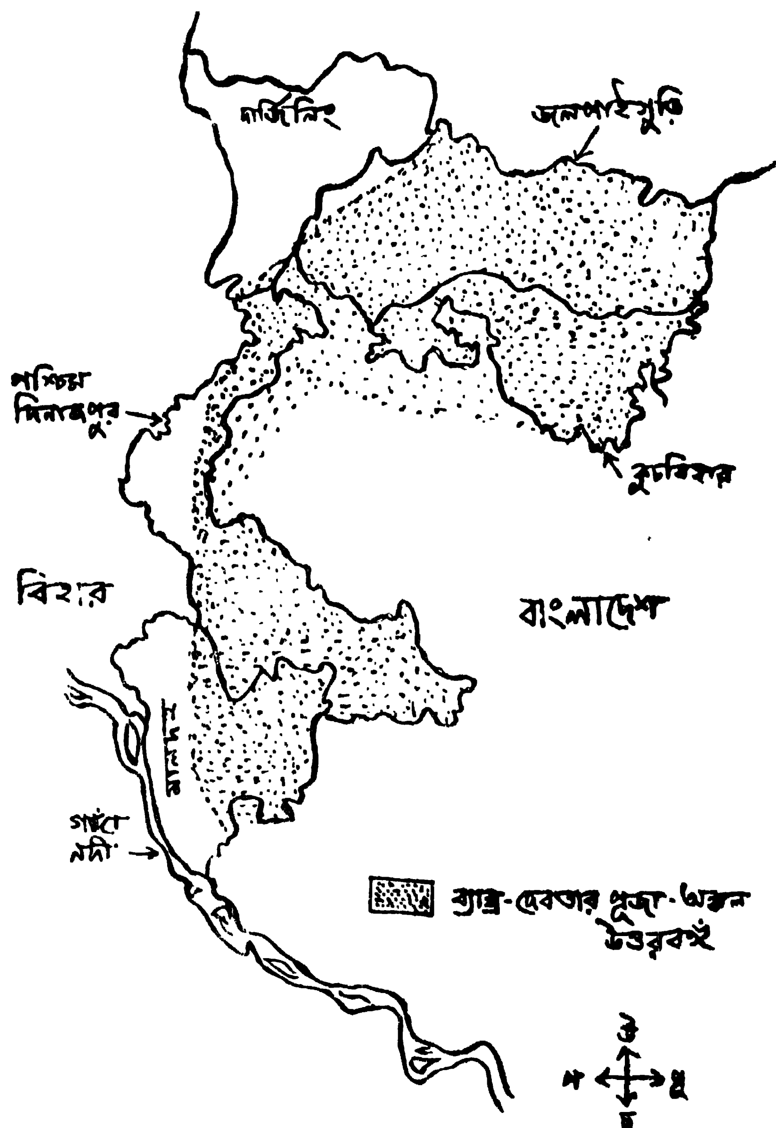
১. মূল জার্মান ভাষায় এই প্রবন্ধে লেখা হয়। সেখান থেকে ইংরাজীতে প্রবন্ধকার স্বয়ং ভাষান্তরিত করেন এবং সেই ভাষান্তর থেকে ১৩৭০ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় শ্রীঅরুণকুমার রায় ও শ্রীগিরীন চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক অনূদিত হয়।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'চতুষ্কোণ'-এ যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার শীর্ষনাম ছিলো 'পুরাতত্ত্ব ও লোককথায় সিংহ এবং ব্যাঘ্র সংস্কৃতি'। কিন্তু আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থের মূল ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত শিরোনাম থেকে 'সিংহ' শব্দটিকে পরিত্যাগ করেছি। বিদগ্ধ পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করার পর লক্ষ্য করতে পারবেন নিশ্চয়ই যে, এই বর্জন প্রবন্ধকারের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যকে আদৌ বিপর্যস্ত করে নি।

এই প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করার ব্যাপারে আমরা শ্রীঅরুণকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।



অনুসূত্র



এই মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত দেবদেবীর পূজাঞ্চলকে দেখানো হয়েছে।

পশু পূজায়-বাঘ

শ্রীমানিক সরকার

বাংলায় নানা প্রকারের পূজার মধ্যে পশু-পূজা [animalism] অন্যতম এবং লৌকিক-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত পশু-পূজা, পরবর্তী কালে পশু-দেবতার পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। পশু দেবতাগুলির মধ্যে ব্যাঘ্র-দেবতা অন্যতম। বক্ষমান আলোচনা ব্যাঘ্র-দেবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বর্তমান কালে একক পশু বা প্রাণী হিসাবে সাপ, গরু, হনুমান প্রভৃতিরা পূজা পেয়ে আসছে, অন্য পশুদের কোন দেবতার বাহনরূপে দেখা যায়। আদিতে বাহনের ভূমিকা হয়তো তাদের পালন করতে হয় নি। প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রায় মানুষের পশু-ভীতি ছিল ; সে ভয় দূর হবার পর পশু-পালনের উদ্ভব হয়। পশু-পূজার সঙ্গে পশু-ভীতি এবং পশু পালনের নিবিড় সম্পর্ক আছে। সম্ভবত পশুচারণ জীবনযাত্রায় পশু-পূজার আবির্ভাব হয়। সমাজ-ইতিহাসে পূজা করার ধারাটি পরে এসেছে। পূজারও ইতিহাস আছে। পূজা প্রবর্তনের আগে যাদু-বিশ্বাসজাত ক্রিয়াকলাপ ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানাদির পাঠ ছিল।

কৃষি-চারণ-পর্বে পশু মানুষের নিকট পরাভূত হয়। মানুষের প্রয়োজনে সে নিয়োজিত হয়। মনে হয় কৃষি-চারণ জীবন-যাত্রায় পশু বিভিন্ন দেব-দেবীর বাহন হতে আরম্ভ করে। পশু মানুষের সৃষ্টি নয়, কিন্তু সকল দেবদেবীই মনুষ্যসৃষ্ট। তাঁদের মাহাত্ম্য মানুষেই প্রচার করেছে, অদৃশ্য শক্তির যে অলৌকিকতা তা মানুষেরই কল্পনা। পশুর অবস্থান্তরও মানুষের জন্য হয়েছে। মানুষ সর্বশক্তিমান। শক্তিধর মানুষ এক পর্বে পশুকে ভয় করেছে। কিন্তু ভয়ই তার শেষ কথা নয় ; অন্যপর্বে ভয়কে সে জয় করেও চলেছে, পশুকেও সে জয় করেছে। তার জয়ের শেষ নেই।

কিন্তু প্রশ্নটি শুধু ভয় ও জয়ের নয়, প্রয়োজন বলে একটি অতি জরুরী বিষয় আছে। এই প্রয়োজন থেকেই বিরোধ এসেছে, এসেছে

গ্রহণ ও বর্জন। অবশ্য মানুষের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু বিরোধ, বর্জন, ভয় ও ধ্বংসের ইতিহাস নয়। বিরোধের সঙ্গে সমন্বয়, ভয়ের সঙ্গে জয়, বর্জনের সঙ্গে গ্রহণ, ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি পাশাপাশি রয়েছে। পশুর পূজা করা এবং পূজিত পশুকে দেবতার বাহন করার মধ্যে সমাজের কোন এক অজ্ঞাত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সে ইতিহাসের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চিত্র আছে। ধর্ম-কর্ম, পূজা-পাবণের মধ্যেও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। পশু দেবতার পূজা বহু অতীতের ইতিহাস বহন করে চলেছে। মানব সমাজের প্রবল বহন ক্ষমতার জন্য কত অতীত ইতিহাসই না সে বহন করে চলেছে। অতীতের সঙ্গে এই আত্মীয়তা মানুষের জীবনে বড় বেশী প্রকট। পশুদেবতার পূজা সেই অতীতকালেরই ধারা। এ কালে নতুন কোন পশুদেবতার আবির্ভাব হয় নি। বিজ্ঞান-বুদ্ধি দেব-দেবী আবির্ভাবের পরিপন্থী। একমাত্র বিজ্ঞানই দেবদেবীর নতুন জন্মকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলে পূজা বন্ধ হয় নি।

তবু এযুগে দেবদেবী নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। দেব-দেবীর জন্মের পেছনে মানুষের কামনা, বাসনার পরিচয় আছে—কোথাও পরোক্ষে, কোথাও প্রত্যক্ষে। মানুষের কামনা-বাসনা তার জীবন-চর্যার অতীত নয়। তাই অতীত জীবন-চর্যাকে বর্তমান চর্চার পরিধির মধ্যে দেব-দেবীকেও নিতে হয়। সেই দেব-দেবীর বস্তুনির্ভর আলোচনায় পশুদেবতার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।

বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি দেব-দেবীর সঙ্গে একটি করে পশু অথবা পাখী আছে। দুর্গার বাহন সিংহ, বিশ্বকর্মার বাহন হাতী, শিবের বাহন বৃষভ, গণেশের বাহন ইঁদুর, ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল, শীতলার বাহন গর্দভ, বড়গাজি খাঁর বাহন অশ্ব ইত্যাদি দেখা যায়। পাখীর মধ্যে শনির বাহন শকুন, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হাঁস, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর প্রভৃতি। দক্ষিণ রায়, সোনা রায়, বন বিবি, বনদুর্গা, ভাণ্ডানী প্রমুখ দেব-দেবীর বাহন বাঘ। বাঘ একাধিক দেব ও দেবীর বাহনের মর্যাদা পেলেও কোন শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক দেবতার বাহন বাঘ হতে পারে নি; বাঘ প্রধানত লৌকিক স্তরের লোক-দেব-দেবীর বাহন রয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী দেবতার নয়, উভয়ের বাহন সে হয়েছে। বৃষভের মধ্যে কৃষিচারণ জীবনযাত্রার স্মৃতি রয়েছে, বাঘের সঙ্গে অরণ্যচারী জীবনযাত্রার সম্পর্ক আছে।

লৌকিক দেব-দেবীর চলচ্ছক্তি প্রবল। এক বনবিবির কত রূপ। কোথাও তিনি বাঘের উপর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন; কোথাও বা শুধু সন্তান কোলে নিয়ে আছেন। অনুরূপ ভাবে নারী হয়েও ব্যাঘ্র-দেবী ভাণ্ডানী বন বিবির হুবহু প্রতিরূপ নয়। ব্যাঘ্র-দেবতা বাঘ রায় চণ্ডীর সঙ্গে বনবিবি বা ভাণ্ডানীর বিশেষ কোন মিল নেই। বাঘ রায় চণ্ডীর কোন মূর্তি নেই। উত্তরবঙ্গের সোনা রায় এবং দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায় উভয়ে পুরুষ দেবতা হিসাবে অভিন্ন হয়েও এঁরা দুজনে পুরোপুরি এক নয়। আঞ্চলিকতার প্রভাবে এঁরা সকলেই স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হলেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকাচারে ব্যাঘ্র দেবতার প্রভাব রয়েছে।

ব্যাঘ্র দেবতা বাঘ রায় চণ্ডীর প্রসঙ্গ আলোচনায় ডঃ অমলেন্দু মিত্র মহাশয় বলেছিলেন, 'বীরভূমে শত শত গ্রামে এই দেবীর পূজা হয় ধান কাটার পর। স্বভাবতই মনে হবে এই দেবী শস্য দেবী ছাড়া কিছু নন। অথচ লোকবিশ্বাস, বাঘ এই দেবীর বাহন, [রাঢ়ের সংস্কৃতি, পৃ. ৩৪]। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায় সম্পর্কেও অনুরূপ একটি মত আছে। দক্ষিণ রায়কে ক্ষেত্রপাল রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'সোনা রায়ের পূজাও পৌষ সংক্রান্তির দিনে হয়' [শ্রীসুনীল পাল]। মতান্তরে, 'সোনা রায় ঠাকুরের পূজা শিব চতুর্দশী তিথির দিনে হয়ে থাকে' [ডঃ গিরিজাশংকর রায়—'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ'] শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় উল্লেখ করেছেন, মহাকাল, দক্ষিণ রায়, সোনা রায় প্রভৃতি দেবতার পূজা অরণ্যচারী মানুষের ব্যাঘ্র ভীতি থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে [*The Tiger Cult and its literature in Lower Bengal* : **MAN IN INDIA. XXVII, 1947, Pages : 45-55**].

লোক-দেবদেবীর উদ্ভবের পশ্চাতে যাদু-বিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের যোগসূত্র ও প্রভাব আছে, অশুভ শক্তিকে পরাভূত করবার ঋজু দৃঢ় মানসিকতা আছে। এরূপ মানসিকতা মানুষের নিজস্ব শক্তিকে জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। এ জাতীয় ক্রিয়াকর্মে মনুষ্য শক্তির জয়গান ছিল, স্বনির্ভরতার প্রবণতা ছিল। কিন্তু পূজা বস্তুত নির্ভরতা সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনে ধর্মীয় পূজার আবির্ভাব পরে হয়েছে। ধর্মীয়-পূজা পর্বে মনুষ্য শক্তি খর্বিত হয়েছে, দেব-নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছে। বিশেষ করে শাস্ত্রীয়

দেবদেবীর প্রবক্তারা দৈব শক্তির উপর মানুষের নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলছে। এর পেছনে 'শ্রেণীগত নিগ্রহের' ক্লেদাত্মক ইতিহাস আছে। সমাজ ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের 'পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব'কে 'আদিম যৌথ জীবন ও আদিম সাম্যবাদী যৌথ জীবনই খর্বতা সাধন করেছিল' [ভি. আই. লেনিন—'ধর্ম' পৃঃ ৮৭]। আদিম যৌথ জীবনের ঐতিহ্য লোকধর্মে ও তার ক্রিয়া কর্মে আছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় দেবদেবী এর বিপরীত। শাস্ত্রীয় দেবদেবী দাসত্বের ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়ীভূত। তা নিগৃহীত শ্রেণীর নর-নারীকে দেব-বিশ্বাসের বাঁধনে আবদ্ধ করে অত্যাচারী নিপীড়কদের নিকট বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে। লোক-দেব-দেবী এর বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ করেছে। সেইজন্যই তাঁরা শাস্ত্রীয় মর্যাদা পায় নি। শাস্ত্রীয় মর্যাদা না পেলেও লোক-জীবনে তাদের প্রভাব খর্বিত হয় নি। টিঁকে থাকার জন্য লৌকিক দেবদেবীরা সমাজ কাঠামোর এবং আর্থিক বনিয়াদের কৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রূপান্তরিত হয়েছে। পশু টোটেম থেকে পশু দেবতা, পশু দেবতা থেকে কৃষি দেবতা, কৃষি দেবতা থেকে সব ব্যথা-বেদনা নিরসনের দেবতায় রূপান্তরিত হবার ঘটনা অপ্রতুল নয়। লৌকিক শিবকে কত রূপেই তো দেখা যায়। ব্যাঘ্র দেবতা সোনা রায়ের গানের অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হতে পারে:

'সত্যঠাকুর সোনা রায় গারস্তক দে তুই বর।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরিচন্দ্র দিবাঙ্কর॥
গইলে বাড়ুক গাই গরু গোলাও বাড়ুক ধান।
দেওয়ানে দরবারে পাউক বাটাভরা পান॥
গইলে বাড়ুক গাইগরু জাঙ্গালে বাড়ুক নাউ।
গিরিঘরের শত্রু দুষমন বনের বাঘ খাউক॥'

[ডঃ গিরিজাশংকর রায় কর্তৃক সংগৃহীত]

এই গানে সোনা রায়কে উপলক্ষ্য করে কৃষি নির্ভর দরিদ্র মানুষের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। ভক্ত সোনা রায়ের কাছে ধনসম্পদ বৃদ্ধি, গোয়াল ঘরে গাই-গরু বৃদ্ধি, ধানের গোলায় ধান বৃদ্ধি, তার সঙ্গে 'গিরি ঘরের শত্রু দুষমন বনের বাঘ'কে নিপাতের কামনা করেছেন। এ কালের গান এটি। তাই এ গানে বনের বাঘ নিপাতের সঙ্গে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির কথা আছে। এখনো সোনা রায় ব্যাঘ্র দেবতা, আবার কৃষি দেবতাও বটেন। সোনা রায়ের 'মূর্তিটি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে সমাসীন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাভার, সঙ্গে কোমরে

গঞ্জিকা সেবনের কন্কে, পরণে ব্যাঘ্র চর্ম এবং সর্প ভূষণ, এক হস্তে ত্রিশূল অন্য হস্তে বরাভয়' ['কোচবিহারের ইতিহাস']। মূর্তি পরিকল্পনায় পরিবর্তন ও সংযোজন হয়, সোনা রায়ের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। ভক্তরা সোনা রায়কে মহাদেবের পর্যায়ভুক্ত করবার অভিপ্রায়ে মহাদেবের বেশভূষার অনুরূপ বেশ-ভূষায় তাঁকে সজ্জিত করেছেন।

ব্যাঘ্র বাহন সোনা রায় পুরুষ দেবতা; উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্র বাহন নারী দেবতা আছেন—তাঁর নাম ভাণ্ডানী। আরও দুটি নামে তিনি পরিচিতা: ভাণ্ডারনী ও ভাণ্ডালী। এই লোক-দেবীর সম্পর্কে একাধিক লোক-শ্রুতি আছে। তার মধ্যে একটি নিম্নরূপ: 'একদা নহুস নামে জনৈক রাজা রাজপ্রাসাদে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন করে শিকারে বের হন। তিনি বনের মধ্যে শিকারের আনন্দে দুর্গা পূজার কথা বিস্মৃত হন। এদিকে রাজপ্রাসাদে যথারীতি পূজার পর বিজয়া দশমীতে দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু রাজার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ না করে মর্ত্য ত্যাগ করতে ইচ্ছা না থাকায় দেবী ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করে বন মধ্যে গমন করেন। তিনি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং দেবী তার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা বনমধ্যে বনের ফুল দ্বারা দেবী-পদে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং রাজার নির্দেশে তাঁর রাজ্যে ভাণ্ডানী দেবীর পূজার প্রচলন হয়·····।'

ভাণ্ডানী দেবী প্রাচীন হলেও এ ধরনের লোকশ্রুতি অর্বাচীন। কিন্তু অর্বাচীন হলেও কয়েকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় ১. শিকার কালে এই পূজা, ২. বনের মধ্যে বনফুল দ্বারা পূজা ৩. ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে দেবীর আবির্ভাব, ৪. রাজা কর্তৃক পূজার দ্বারা দেবীকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার প্রয়াস।

ব্যাঘ্র-বাহিনী এই দেবীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়, বামহস্ত কোলের উপর স্থাপিত। সর্বক্ষেত্রেই দেবী পশ্চিমমুখিন। অবশ্য ভাণ্ডানী দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায়ও রূপান্তর ঘটেছে, এখন কোথাও কোথাও দুর্গার অনুরূপে তাঁকে দেখা যায়। ভাণ্ডানী পূজার মন্ত্রাংশে শোনা যায়:

'ডোলবন্দ, ভুলিয়া বন্দ, বন্দ কাটাকাটি।
গোটে গোট বন্দ এই থানের ডাইনী·যোগিনী॥
বন্দিনু দুই ঠোঁট হে মা ভাণ্ডানী।
এই থানের ডাইনী যোগিনী॥
চেট গোয়া মাং লাগে দাঁত কপাটি।'

'ডাইনী-যোগিনী' অর্থাৎ ডাকিনী-যোগিনীর বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়। তন্ত্রাচারের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তরবঙ্গে ভাণ্ডানী, সোনা রায়, সোনা রায়ের অনুষঙ্গ রূপা রায়, মহাকাল ছাড়াও 'ব্যাঘ্রগুরের' পূজা হয়। প্রবন্ধ লেখক ক্ষেত্র-গবেষণা করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ভাটিবাড়ি গ্রামের সন্নিকটে 'ব্যাঘ্রগুর' পূজা লক্ষ্য করেছেন। ব্যাঘ্রগুর বাঘের পিঠে বসা পুরুষ দেবতা। দুইহস্ত বিশিষ্ট মূর্তি। মাটির মূর্তি তৈরী করে গ্রামের মধ্যে দলবদ্ধভাবে পূজা হয়। ব্যাঘ্রগুরের ভাসান হয় না। পূজার স্থানেই রেখে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীর বিশ্বাস ব্যাঘ্রগুর গ্রামে অবস্থান করলে বাঘের কোনপ্রকার উপদ্রব হবার সম্ভাবনা থাকে না। সমগ্র গ্রামকে হিংস্র বাঘের আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা করে থাকেন।

উত্তরবঙ্গের মতো দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বাঁকুড়া রায়, বনবিবি, বড় খাঁ গাজী, কালু রায় প্রভৃতিকে ব্যাঘ্র দেবতা বলে গণ্য করা হয়। দক্ষিণ রায় সুশ্রী এবং সুপুরুষ আকৃতির দেবতা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার উপর মুকুট, কানে কুণ্ডল, চোখ দুটি গোলাকার ও বিশাল একটু রক্তাভ, নাক টিকালো, গোঁফ আকর্ণ-বিস্তীর্ণ, পরণে যোদ্ধার বেশ, বর্ণ হরিদ্রা। হাতে তীর-ধনুক, পিঠে ঢাল ও তূণীর। তিনি ব্যাঘ্রের উপর উপবিষ্ট। কোথাও কোথাও দক্ষিণ রায়ের অনুষঙ্গ হিসাবে কালু রায়কেও দেখা যায়। দক্ষিণ রায়ের মন্ত্রাংশে পাওয়া যায়ঃ

'চন্দবদন চন্দ্রকায়।
শার্দুল বাহন দক্ষিণ রায়॥

অথবা

সাগর সঙ্গম সুন্দরকায়।
ঘোটক বাহন দক্ষিণরায়॥'

ধান কাটার পর নবান্নের সময় দক্ষিণ রায়ের ব্যাপক পূজা হয়। কেহ কেহ দক্ষিণ রায় 'মৌলিক তাৎপর্যে আদিম উর্বরতা সহায়ক কর্তিত নৃমুণ্ড পূজার অবশেষ—কৃষিদেবতা' বলে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র কৃষিযুগেই কৃষি-দেবতার উদ্ভব সম্ভব। কিন্তু কৃষিযুগের আগে অরণ্যচারী যুগ ছিল। অরণ্যচারীযুগেই পশুপূজা বা **animalism**-এর উদ্ভব হয়েছে। পশু পূজার আগে টোটেম পর্ব ছিল। ব্যাঘ্র টোটেম বা কুলকেতু থেকে ব্যাঘ্র দেবতা বা দেবীর উদ্ভব, এই

তত্ত্ব মেনে নিলে কৃষি দেবতার চেয়ে পশু দেবতার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর হয়েছে। উৎসে কৃষি-দেবতা না ধরে পশু-দেবতা ধরলে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের ক্রিয়াকর্মের ধারা প্রাচীনতর হয়ে পড়ে। আদিমতা মেনে নিলে দেবতা মেনে নেওয়া যায় না, তা মেনে নিলে 'সোনার পাথরের বাটির' মতো দেখায়। কারণ আদিমকাল কোন দেব-দেবী ছিলেন না। আদিম ধারা মেনে নিলে কৃষি-যুগের আগে অরণ্যচারী যুগে যেতে হয়। এ কালের পশু দেবতাগুলি নিয়ে সেই অরণ্যচারী যুগের ভেতরে যেতে হয়। আমাদের সকল দেব-দেবীর মধ্যেই বিভিন্ন ধারা ও উপধারার যোগ-বিয়োগ ঘটেছে, দক্ষিণ রায়ে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অরণ্যচারীর পর্ব থেকে বর্তমান কালের আধা-শাস্ত্রীয় পর্যায়ে আসতে দক্ষিণ রায়কেও বহু গ্রহণ-বর্জন, বিরোধ-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে।

বিরোধ ও সমন্বয়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বনবিবির গানে পাওয়া যায়। "বনবিবি বাংলার লৌকিক দেবী, ইনি সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে তিনি পূজিতা। ভক্তদের কাছে তিনি 'অবতার', তিনি 'গরীবের মা জননী', তিনি 'জগতের মাতা' ['বাদাবনের লৌকিক পালাগান—বনবিবির গান', শারদীয়া 'নতুন বাংলা', ১৩৮১, পৃঃ ২১।]। সুন্দরবনে বা ভাটির দেশে বনবিবির পূজা প্রচলনের প্রাক্কালে দক্ষিণ রায় বনাম বনবিবির বিরোধ হয়। সে বিরোধ যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। বনবিবির পালাগানে দক্ষিণ রায়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—তিনি দণ্ডবক্ষ মুনির পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী। তাঁর ডাকিনী, যোগিনী, কালভূত দেড় লক্ষ সোমার, সাঁইত্রিশ কোটি কুহকি ছেপাই লসকর ছিল। দক্ষিণ রায় 'অত্যাচার করে খায় মানুষ ধরিয়া', 'বাদাবনে মানুষের দেখা যদি পায়। বাঘের ছুরত হইয়া পাকাড়িয়া খায়॥' দক্ষিণ রায়কে ওই বর্ণনায় 'রাক্ষসের জাত' বলা হয়। কাহিনীতে আরও দেখা যায়, ধনবান দোনা ও মোনা দক্ষিণ রায়ের ভক্ত, কিন্তু দরিদ্র সন্তান দুখে বনবিবির ভক্ত। ধনবান দোনা-মোনা দক্ষিণ রায়কে নরবলি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে সাত ডিঙ্গা মোম ও মধু সংগ্রহ করে দেশে ফেরে। সেই বাঘরূপী দক্ষিণ রায়ের ভয়াল গ্রাস থেকে বনবিবি দুখেকে রক্ষা করেন, দক্ষিণ রায়কে পরাভূত করেন। বর্ণিত এই কাহিনীতে দক্ষিণ রায় বনাম বনবিবির বিরোধের অন্তরালে শোষক বনাম শোষিতের বিরোধ প্রত্যক্ষ ভাবে রয়েছে। এই বিরোধের অবসানে দক্ষিণ রায়কে বিলুপ্ত করা হয়

নি, বড়গাজি খাঁর মধ্যস্থতায় উভয়েই ভাটিদেশে শান্তিতে বাস করতে থাকেন। বহু স্থানে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বনবিবি, বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণ রায়কে পূজা করা হয়। একক থেকে একাধিক দেব-দেবীর একই সঙ্গে পূজা পরবর্তীকালের সংযোজন। একই দেবী বা দেবতার মধ্যে বহুর মিলন লৌকিক ধর্ম চিন্তায় সমন্বয় সাধন-প্রক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লৌকিক ধর্ম লোক সমাজের উপরিসৌধের সম্পদ। সচল সমাজের মৌলিক বনিয়াদ.তার আর্থিক কাঠামো। আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরিসৌধের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে প্রবল। তাই একদা পশু টোটেম, পরবর্তী পর্যায়ে পশু দেবতার রূপ নেয়; পশু দেবতা, বনদেবতা হয়; বনদেবতা, কৃষিদেবতায় রূপান্তরিত হয়। আবার এই সব দেবতা সর্বপ্রকার অমঙ্গলের পরিত্রাতা রূপে পূজা পায়।

আমাদের দেশের লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে সমাজের বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণী বিভাজনের কিছু পরিচয় আছে। লৌকিক দেব-দেবীরা সাধারণ ভাবে সমাজের ধারক অথচ নীচুতলার তথাকথিত 'অন্ত্যজ' এবং শ্রমজীবী নর-নারীর মধ্যেই তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। উচ্চবর্ণের অন্দরমহলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন নি। লৌকিক দেবী মনসাকে রাখালিয়াদের দেবী হয়ে বাংলার মধ্যযুগীয় বণিক সমাজে ওঠবাব জন্যে কত যে সাধা-সাধনা করতে হয়েছিল, তা মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণের শ্লোকগুলির মধ্যে ধরা আছে। এ কালে ব্যাঘ্রবাহন 'দক্ষিণ রায় বহুস্থানে শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা' আংশিক ভাবে পেয়েছেন। তবুও 'কাহারও গৃহদেবতারূপে বা ব্যক্তিগতভাবে পূজিত হন না' [শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—'বাংলার লৌকিক দেবদেবী', পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃ ১৫৫]। সোনা রায়ের পূজাও পাথার বাড়িতে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে হয়ে থাকে। বাঘ রায় চণ্ডীর পূজা গ্রামের কোন গাছতলায় কিংবা ধানের মাঠে হতে দেখা যায়। বনবিবি, ভাণ্ডানীও কোন গৃহে উঠতে পারেন নি। অবশ্য এ কালে ভাণ্ডানীকে দুর্গার অংশ বা বোন হিসাবে গ্রহণ করে সজ্জিত মণ্ডপে বিশেষ সমারোহে পূজা করা হচ্ছে। এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজারীরাও নীচুতলার মানুষেরাই হয়ে থাকেন। দক্ষিণ রায়ের পূজায় ব্রাহ্মণেতর জাতিকে পৌরোহিত্য করতে দেখা যায়। বাঘ রায় চণ্ডীর পূজার পূজারী তপসীল সম্প্রদায়ের লোকেরাই হয়ে থাকেন। ভাণ্ডানী এবং সোনা রায়ের পূজা রাজবংশীরা কবেন। বনবিবির পূজা মৌলে, জেলে প্রমুখেরা করে থাকেন। এর একটি নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে,

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও কম তাৎপর্য পূর্ণ নয়। মানুষেরই শ্রমে সমাজের সম্পদ বাড়ে। সেই শ্রমদানকারী শ্রমজীবী মানুষেরা শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নীচু-তলায় পড়ে থাকেন। তাঁদেরই শ্রমে গড়ে ওঠা সম্পদের চূড়ায় শ্রম-আত্মসাৎ-কারীরা বসে থাকেন। তাঁরা হন 'উচ্চবর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন' নর-নারী। তাঁদের কাছে নীচু তলার মানুষেরা অচ্ছ্যুৎ, অচ্ছ্যুৎ নর-নারীর দেবদেবীরাও তাঁদের কাছে তাই অচ্ছ্যুৎ। শাস্ত্রীয় দেবদেবী এবং লৌকিক দেব-দেবীর পূজা অর্চনায়, ক্রিয়া কর্মে, সমাজ জীবনের অভ্যন্তরের মৌলিক বিরোধ-বিসম্বাদের প্রচ্ছন্ন চিত্র আছে। পাণ্ডিত্যের মূঢ়তায় এ চিত্র উপেক্ষিত হলেও সমাজ বিজ্ঞানে তা অনুপস্থিত নয়।

দক্ষিণ রায়, সোনা রায়, ভাণ্ডানী এবং বাঘ রায় চণ্ডী প্রমুখ দেব-দেবীর পূজায় বলিদান প্রথা বিদ্যমান। পাঁঠা, মুরগী, পায়রা বলি দেওয়া হয়। বনবিবিকে অর্ঘ্য হিসাবে বলির পরিবর্তে জঙ্গলে মুরগী ছেড়ে দেওয়া হয়। ভাণ্ডানী পূজাতে কোথাও কোথাও বলির পরিবর্তে পায়রা আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমূর্ত বাঘ রায় চণ্ডীকে মুরগী বলি দিতে দেখা যায়। বলিদান প্রথা আদিম কালের প্রথা কিনা জানি না, কিন্তু এই প্রথা অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে নরবলির প্রশ্নটি এসে পড়ে। আদিম কালের যৌথ জীবনে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নরবলির উদ্ভব হয় নি। সমাজে গোষ্ঠীগত এবং পরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের কালেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মানুষে-মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভব হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে জয়-পরাজয় এবং প্রভু-দাস তথা রাজা-প্রজা সম্পর্ক। সম্পত্তির লোভে যুদ্ধ ও হানাহানি নরহত্যার ধারা বয়ে এনেছে। নরহত্যার মধ্যে যে 'পশু' ভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব তা আদিম সাম্যবাদী যৌথ জীবনে ছিল না। প্রবল পশুর দেবতাকে অন্য এক নিরীহ ও দুর্বল পশুর রক্ত দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রবল গোষ্ঠীপতির কাছে দুর্বল ও পরাভূত গোষ্ঠীর নর-নারীকে হত্যার দ্যোতক কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গের আলোচনায় কেউ কেউ বলেন; কৃষিতে উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য আদিম কালে যাদু-বিশ্বাসজাত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম থেকে নরবলি প্রথার উদ্ভব হয়েছে। যাদু-বিশ্বাসজাত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম মুখ্যত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ জাত। কিন্তু নরবলি দাসত্ব-পর্বের হিংস্রতার দৃষ্টান্ত। এই হিংস্রতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে যাদু বিশ্বাসকে যুক্ত করলে 'শ্রেণীগত নিগ্রহের' তাৎপর্যটি উপেক্ষিত হয়। ক্লাশ বা

গোষ্ঠিগত এবং পরবর্তীকালে শ্রেণীগত নিগ্রহ থেকেই নরহত্যার উদ্ভব হয়েছে কিনা, নতুন করে তার আলোচনা হওয়া দরকার। নরহত্যাকে বা নরবলিকে নিষ্কলুষ বা নিষ্পাপ করবার জন্য যাদু-বিশ্বাস আরোপিত হতে পারে। তাই আরোপ কার্যকে উদ্ভব বলা সঙ্গত নয়।

বাংলায় শুধু ব্যাঘ্র দেবতার পূজা নেই, ব্যাঘ্র নিয়ে পালা গান আছে। ব্যাঘ্রকে নিয়ে লোক-নৃত্যাভিনয় বর্ধমান জেলার ভৈটা গ্রামে হতে দেখা যায়। একাধিক কুশীলব এখানে থাকে। তার মধ্যে বেদে, ওঝা, মোড়ল, চৌকিদার, বেদের স্ত্রী এবং তুটি ব্যাঘ্র চরিত্র প্রধান।

এই নৃত্যাভিনয়ে ছড়া কাটা হয়, গান গাওয়া হয়, নাচ হয়। বাদ্য হিসাবে ঢাক, ঢোল, শানাই ব্যবহার করা হয়। বাঘকে পরাভূত করা সমগ্র নৃত্যাভিনয়ের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। ছড়াটি লক্ষণীয়ঃ

'এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা—
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ—
এই বার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগরে বাঘার দাঁত কপাটি।
ছাঁচি কুমড়ো বেড়াল পোড়া
ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদিরে বাঘ নড়িস-চড়িস
খ্যাকশেয়ালীর দিব্যি তোকে।'

এই নৃত্যাভিনয়ে বাঘের আক্রমণের অভিনয়ও আছে। বাঘের আক্রমণে আহতকে আরোগ্যের জন্যেও ছড়া কাটা হয়, কখন কখনও সেই ছড়া গানে প্রকাশ করা হয়। নেচে নেচে গান হয়। ছড়া বা সুরেল ছড়াটি নিম্নরূপঃ

'এনার কাঠি বেনার বোঝা,
আমার নাম ঠনঠনে ওঝা।
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা,
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা।
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি পান,
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কান।

ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি মুড়ি,
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে ভুঁড়ি।
ঝাড়লাম-ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুঁকড়ো,
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে বুঁকড়ো।
ঝাড়লাম-ঝুড়লাম না পারলাম রাখতে,
কল্সী-কোদাল যোগাড় কর যম এসেছে নিতে।
ঝাড়লাম-ঝুড়লাম শোয়ালাম খাটে,
রাত পোহালে দেখি ছোড়াকে নিমতলার ঘাটে।'

বাঘের আক্রমণে প্রায় মরা ছোকরাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়। তার জন্যে ছড়া কাটা বা নেচে নেচে গান গাওয়া হয়ঃ

'আল গুড়াগুড় যায়রে মৌয়ো, [বাঘের বিষ] গায়ে এলো জ্বর,
এক লাফে যায় মৌয়ো যম-রাজার ঘর।

[বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫০-৫১]

আমাদের দেশে লৌকিক ব্রত-ছড়ার সঙ্গে আদিম কালের ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পূর্বোক্ত ছড়ায় সেই ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের কিছু কিছু রেশ রয়েছে। বাঘ-কেন্দ্রিক লোক-নৃত্যাভিনয় ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস-জাত এই ধরণের ছড়া বাঘ পূজা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতার আদিম রূপের বিপুল স্মৃতির ভগ্নাংশ হয়তো বহন করছে।



ব্যাঘ্রবাহন দেবতা সোনা রায়

ড. ফণী পাল

এক.

'বাঘের সংগে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' বাঙালীর জীবন যাত্রার গৌরব গাথায় বাঙালী-বীর্যের কবির এই প্রবাদ বাণী হয়তো আজ অনেকের কাছেই উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ কালের গতিতে বাংলার শ্বাপদ শ্রেষ্ঠ 'বাঘ' আজ মানুষের করুণার পাত্র হয়ে পড়েছে। তাই ব্যাঘ্র পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের ক্ষীণ বংশধারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। কিন্তু একথা ঐতিহাসিক সত্য, এমন একদিন ছিলো যখন সত্যই বাংলার মানুষকে বাঘের সংগে যুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হতো। বৃহৎ ভারতের আরও কোনো কোনো প্রদেশে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেলেও সংখ্যায়, আকৃতিতে এবং হিংস্রতায় বাংলার বাঘ জগৎ-বিখ্যাত। 'রয়াল বেঙ্গল টাইগারে'র নাম মানুষের মনে আতঙ্ক জাগায়।

পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন আর্যেরা নাকি বাংলাদেশে প্রবেশ করার পূর্বে বাঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেনি। প্রাচীন আর্য-সাহিত্যে বাঘের কোনো উল্লেখ না থাকা তাদের মতকেই সমর্থন করে। কিন্তু আর্যরা এদেশে যখনই আসুন না কেনো, আর্যরা এদেশে না আসার আগে থেকেই এই দেশে বাঘ ছিলো এবং আর্যরা এদেশে প্রবেশের পূর্বে যে সমস্ত আর্য-পূর্ব আদিম অধিবাসী বাংলাদেশে বাস করতো তারা নিশ্চয়ই বাঘের সংগে পরিচিত ছিলো। এবং একথাও আমরা ধরে নিতে পারি বাঘের সংগে পাশাপাশি বাস করতে গিয়ে তাদের বাঘের হিংস্রতার সংগে লড়াই করতে হয়েছে। প্রতিবেশী বাঘের সংগে ঘর করতে প্রায়ই তাদের বাঘের হিংস্রতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একথা সত্য যে আদিম মানুষ যখনই কোনো প্রাকৃতিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে, তাদের বলবীর্য ও বুদ্ধি দিয়ে যখন তারা সেইসব শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেবতা বলে মেনে নিয়েছে।[১] যদি একথা গ্রহণযোগ্য হয় তবে

আমাদের একথাও মেনে নিতে আপত্তি থাকে না যে আর্যরা এই দেশে আসবার আগেই হয়তো আর্য-পূর্ব বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের আদি-বাসীরা অন্যান্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির মতোই বাঘের কাছে পরাভব মেনে তাকে দেবতার স্বীকৃতি দিয়েছিলো।

ভারতবর্ষে বাঘ পূজার প্রচলন বহু প্রাচীন। আর্য-পূর্ব যুগেই বাঘ পূজার প্রচলন যে ছিলো একথা বলবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত বাঘ আকৃতির মূর্তি, এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মৃৎফলকে অঙ্কিত বাঘের মূর্তি, প্রাচীন ভারতে বাঘের পূজা প্রচলনকে সমর্থন করে। এছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকেও আমরা প্রাচীন ভারতের বাঘ-পূজা প্রথার সমর্থন পাই।[২]

বাংলাদেশ, ব্যাঘ্র-উপদ্রুত এবং ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত; প্রায় সবত্রই এই বাঘ পূজার প্রচলন যে ছিলো তা অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। পরবর্তী-কালে সভ্যতা এবং নগর জনপদের প্রসারের ফলে বাংলাদেশে ব্যাঘ্র অথবা ব্যাঘ্র বাহন দেবতার পূজা অপেক্ষাকৃত জঙ্গলাকীর্ণ দুই প্রান্তীয় সীমায় গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। দক্ষিণ বাংলায় বাঘ-দেবতা বা ব্যাঘ্র-বাহন দেবতার নাম দক্ষিণ রায়। সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের শক্তি, প্রতাপ ও মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত 'রায়মঙ্গলকাব্য' ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণ রায়ের জনমানসে আধিপত্য ও বিস্তৃতির কথাই ঘোষণা করে।

বাংলার উত্তর অঞ্চলে ব্যাঘ্রবাহন বাঘদেবতার নাম সোনা রায়। সমগ্র উত্তর বাংলা, আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রংপুর, রাজসাহী, পাবনা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলা এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সোনা রায়ের পূজার প্রচলন আছে।

অন্যান্য লোকায়ত দেবদেবীর মতো সোনা রায়ের পূজার প্রচার ও জাঁকজমক অনেক কমে এসেছে বটে, কিন্তু সোনা রায় ঠাকুর এখনো তাঁর অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন নি। উত্তর বাংলার গ্রাম-প্রান্তরে গো-পালক, রাখাল ও কৃষকদের মধ্যে এখনো সোনা রায় স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। প্রতিবছর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন ভক্তেরা এবং উপাসকেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সোনা রায়ের পূজা করে থাকে। কোথাও কোথাও শিব চতুর্দশীর দিনেও সোনা রায়ের পূজার প্রচলন লক্ষ্য করা গেলেও, পৌষ সংক্রান্তিতেই সোনা রায়ের পূজার বিধান উত্তর বাংলার প্রায় সর্বত্র। সারা পৌষ মাস ধরে সোনা রায়ের

ভক্তরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা ও অর্থ সংগ্রহ করে। চাঁদা বা অর্থ সংগ্রহ করার সময় তারা সোনা রায়ের মাহাত্ম্যপূর্ণ গান করে থাকে। সমস্ত মাসে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা দিয়েই পৌষ সংক্রান্তির দিন সোনা রায়ের পূজা করা হয়ে থাকে।

আজ সভ্যতার ক্রম-আক্রমণে লৌকিক দেবদেবীরা যে প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। শাস্ত্রীয় দেবতারা নিজেদের কৌলিন্য, বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার খুইয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে থাকলেও লৌকিক দেবদেবীদের প্রায় পাততাড়ি গুটানোর উপক্রম হয়ে পড়েছে। সোনা রায় ঠাকুরও সভ্যতার এই রূঢ় আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। আজ প্রায় সর্বত্রই সোনা রায়ের পূজা কোনো প্রকারে নমো নমো করে সেরে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও এমন দু-চারটি সোনা রায়ের পূজাস্থান দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সভ্যতার রক্তচক্ষু এড়িয়ে বেশ সমারোহের সঙ্গে সোনা রায়ের পূজা করা হয়ে থাকে। মালদহ জেলার গৌড় অঞ্চলে 'সোনা রায়ের গড়' এমনই একটি পূজাস্থান। প্রাচীন গৌড় নগরীর বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে গড়ের এক প্রান্তে সোনা রায়ের পাট বা স্থান এখনও আছে। এখানে প্রতি বৎসর সমারোহের সঙ্গে সোনা রায়ের পূজা হয়ে থাকে। সোনা রায়ের নামানুসারেই সমগ্র গড়টির নাম হয়েছে সোনা রায়ের গড়।[৩] মাটির ঢিবির উপর রক্ষিত একখণ্ড পাথরকেই এখানে সোনা রায় জ্ঞানে পূজা করা হয়। মালদহ জেলার রাতুয়া থানার কাগাচিড়া গ্রামে সোনা রায়ের মন্দির বর্তমান। মন্দিরে ব্যাঘ্রবাহন সোনা রায়ের মূর্তি পূজিত হন। কাগাচিড়ায় বা মালদহ জেলার অন্যত্র পূজিত সোনা রায়ের মূর্তি বাঘের উপর বসা বা বাঘের পাশে দাঁড়ানো একটি সুন্দর পুরুষ মূর্তি। সুন্দর ভঙ্গিতে কাপড় পরা, খালি গা, পায়ে জুতা, হাতে বাঁশি বা লাঠি। কিন্তু জলপাইগুড়ি-কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে পূজিত সোনা রায়ের মূর্তি অনেকটা, গাঁজার কল্কে হাতে, শিব বা সন্ন্যাসী মূর্তির মতো।[৪]

মালদহ জেলার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় সোনা রায়ের একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিটিকে সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ দশম শতাব্দীর মূর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। মূর্তিটির কোমর পর্যন্ত ভাঙা, উপরের দিকটা নেই। নীচের অংশে দেখতে পাওয়া যায় একটি সবল ও বৃহৎ বাঘের উপর বসে আছে একটি পুরুষমূর্তি। পায়ে বুট জুতা। জুতার ডগা নাগরাই জুতার মতো উপরের দিকে শুঁড় তোলা। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। বাহন বাঘটি মুখ ব্যাদান করে

দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের এই মূর্তি উত্তর বাংলায় প্রাচীন কালে সোনা রায়ের পূজার বহুল প্রচলনের কথাই ঘোষণা করছে। পাথরের মূর্তি থেকে এ ধারণা করাও অস্বাভাবিক নয় যে সেকালে সোনা রায়ের পূজা শিষ্ট সমাজ ও রাজা-জমিদারের আনুকূল্য লাভ করেছিলো। এছাড়া উত্তর বাংলায় মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং সমতল দার্জিলিং অঞ্চলে কোথাও গাছের নীচে মাটির ঢিবি, কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট প্রস্তর খণ্ড আবার কোথাও মাটির মূর্তি গড়ে সোনা রায়ের পূজার বহুল প্রচলন দেখা যায়। বেশির ভাগ পূজাস্থানই বনে-প্রান্তরে বা মাঠের কোন গাছ তলায় অবস্থিত। উত্তর বাংলার সোনা রায়েব অনুরূপ দক্ষিণ বঙ্গে একজন ব্যাঘ্রবাহন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি দক্ষিণ রায় নামে পরিচিত।

উত্তর বাংলার ব্যাঘ্রবাহন দেবতার নাম সোনা রায় হলো কেনো সে সম্পর্কে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অনেকে অনুমান করেন প্রাচীন-কালের কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামানুসারেই এই দেবতার নাম হয়েছে সোনা রায়। অথবা সোনা রায় নামে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিই পরবর্তী কালে দেবতার স্বীকৃতি পেয়েছেন।[৫] সোনা রায়ের নামকরণ সম্পর্কে 'কুচবিহারের ইতিহাস'-এর লেখক খানচৌধুরী আমানত উল্লাহ বলেন: 'মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্বে কামরূপ অঞ্চলে সোনা রায় এবং রূপা রায় নামে দুইজন ধর্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্র দেবতা সোনা রায়ের গড় বা পাট এ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সোনা রায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত কতকটা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ।' কিন্তু সোনা রায়ের ঐতিহাসিক ভিত্তিকে কতটা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কেহ কেহ এঁর ঐতিহাসিক উৎসকে সমর্থন করলেও অনেক গবেষকই আজ আর তা মানতে চান না। সোনা রায়ের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ ও সমর্থন আজও পর্যন্ত খুবই দুর্বল।

আমরা সোনা রায় [এবং দক্ষিণ রায়]-এর উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গবেষক গুরুসদয় দত্তের সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একই সুরে বলতে পারি: **'The cult of the God of tigers is one that appears to have originated primarily in the Sundarbon area, in Eastern Bengal and**

in the tarai region in Northern Bengal, where depredation of tigers on human life and cattle is particularly prevalent and where it has been easy for interested persons to persuade the ignorant classes that there is a presiding diety of tigers by propitiating whom through offering of eatables etc. One can escape their depredation.' ব্যাঘ্রবাহন দেবতার উৎপত্তির সম্ভবত এটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা। পরবর্তীকালে হয়তো আরও অনেক দেবতার সংমিশ্রণ ঘটেছে এর সঙ্গে।

বিখ্যাত গবেষক সুধাংশুকুমার রায় তাঁর '*Retual Art of the Bratas of Bengal.*' বইতে সোনা রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ স্বর্ণাধিপতি অর্থাৎ সোনার দেশের অধিপতি বলেই তিনি সোনা রায় [**Lord of Gold : 'Sona Ray'**] রূপে পূজিত হন। তিনি আরো বলেছেন সোনা রায়ের কোনো মূর্তি নেই, তাঁর প্রতীক হিসেবে যে পুষ্পমালিকার পূজা করা হয় তা স্বর্ণ মালিকারই প্রতীক। শ্রীযুক্ত রায়ের গবেষণা ও জ্ঞানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেই উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর সরেজমিন তদন্তে কিছু ফাঁক থেকে গেছে। শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন—সোনা রায়ের কোন মূর্তি নেই [**We do not have any doll or image of Sona Roy**] আমরা তাঁর অভিমতে সম্মতি জানাতে পারছি না। মালদহ সংগ্রহশালায় রক্ষিত সোনা রায়ের মূর্তি এবং উত্তর বাংলার বহু স্থানে পূজাকালে নির্মিত সোনা রায়ের মৃন্ময় মূর্তি তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করবে। তাঁর, সর্বত্র সোনা রায়ের প্রতীক হিসেবে পুষ্পমালিকার পূজার কথাও পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। কোথাও কোথাও সোনা রায়ের প্রতীক হিসেবে পুষ্পমালিকার পূজার প্রথা থাকলেও মূর্তি পূজার প্রচলনই বেশি।

সোনা রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'সোনার দেশের রাজা অর্থাৎ অধিপতি বলিয়াই তিনি সোনা রায় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁর এই অভিমতকে আমরা সমর্থন করি। তবে 'সোনার দেশ' কথাটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। প্রাচীনকালে বাংলার উত্তর অঞ্চলটাই ছিলো ধনে জনে সভ্যতায় সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিলো উত্তর দিক থেকেই। প্রাচীনকালে উত্তর বাংলা যে ধনে জনে সমৃদ্ধ হয়েছিলো তার মূল ছিলো গোরু আর ধান। একটি প্রচলিত ছড়ায় দেখতে

পাই, 'ধান হলো বড়ো ধন আর ধন গাই / কিছু ধন সোনারূপা আর সব ছাই।' ধানের উৎপাদন নির্ভর করতো পরোক্ষভাবে গোরুর উপর। কাজেই গোরুই ছিলো সে যুগের সব সম্পদের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু গোরুর প্রধান শত্রু ছিলো বাঘ। তখন বাঘের উৎপাত ছিলো সর্বাধিক, কাজেই গোরুকে রক্ষার জন্য বাঘ বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতাকে পূজায় সন্তুষ্ট করে দেশকে ধন-সমৃদ্ধ করাই একমাত্র পথ ছিলো। শস্য ও গো সম্পদের প্রাচুর্যের যে দেশ, সোনার দেশ বলে খ্যাতি লাভ করেছিলো পরোক্ষভাবে তার মূলে ছিলেন ব্যাঘ্রবাহন দেবতা এই সোনা রায়। [অন্তত সে যুগের লোকের তাই বিশ্বাস ছিলো], তাঁর কৃপায় মাটির দেশ সোনার দেশ হয়ে উঠেছিলো ; সুতরাং প্রাচীন মানুষ এই দেবতার নামকরণ করেছিলেন সোনা রায়। অর্থাৎ সোনার দেশের রাজা।

দুই.

উত্তর বাংলায় সোনা রায়ের গান নামে এক প্রকার গানের প্রচলন দেখা যায়। এ-সকল-গানে মঙ্গলকাব্যের আকারে সোনা রায় ঠাকুরের জন্ম, পূজা-প্রচার এবং ঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে। সোনা রায়ের কোনো লিখিত পূর্ণাংগ খুব প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। সংবাদ সূত্রে জানা যায় বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার নীলফামারীতে কবি রতিরাম দাস রচিত সোনা রায়ের একটি প্রাচীন পুঁথি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে। আমি উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে কয়টি সোনা রায়ের পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার প্রতিটিই অর্বাচীন। কোনোটির রচনাকালই চল্লিশ / পঞ্চাশ বছরের আগের নয়। প্রায় সব পুঁথিই সাধারণ কাগজে লেখা সংক্ষিপ্ত, আংশিক এবং অপূর্ণ। পুঁথিগুলি পাঠ করে মনে হয়েছে লেখকগণ মৌলিক পালাগানকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে প্রতিটি ঘটনা এবং কাহিনী ও উপকাহিনী হুবহু অনুসরণ করতে পারেনি, ফলে পুঁথি অবাঞ্ছিতভাবে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কাহিনীর বহু শাখা উপশাখার সম্ভাবনা ও সূত্রের উল্লেখ থাকলেও তার লিখিত রূপ পুঁথিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত দীর্ঘদিন মৌখিক ধারায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে কাহিনীর অনেক অংশেরই বিস্মৃতি ঘটেছে।

আমাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে কোথাও রচনাকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভণিতাও প্রায় নেই বলা চলে। কেবলমাত্র কোচবিহার থেকে সংগৃহীত একটি পুঁথিতে এক জায়গায় একটি ভণিতা দেখা যায়। 'সরস্বতী

ভুজ্ঞান বোনমালী দাসে গায়।' এ বনমালী দাস কে, কেনো তিনি সোনা রায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী লিখতে গেলেন এবং কখন লিখলেন তার কোনো উল্লেখ পুঁথিতে নেই। এই অর্বাচীন পুঁথিগুলিতে ভণিতা এবং কবি পরিচয়ের উল্লেখ না থাকবাব কারণ হিসেবে মনে হয়, এই লিপিকারেরা অথবা গায়কেরা কেউই পুঁথির রচনাকার নন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বংশানুক্রমে বা শিষ্য প্রশিষ্যানুক্রমে মৌখিক ধারায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য তাদের কাছে অবাঞ্ছিত গল্প পুষ্পিকা এবং ভণিতা অংশগুলি অযথা ভার বোধে বর্জিত হয়েছে।

সোনা রায়ের গান বা পাচালী সম্ভবত প্রথমাবস্থায় মৌখিক ভাবেই প্রচলিত ছিলো। সম্প্রতিকালে যে সমস্ত পুঁথি আমরা পেয়েছি তাতে প্রচুর পাঠান্তর আছে। পাঠান্তরের আধিক্যও গানের মৌখিক প্রচলনের প্রমাণ বহন করে। এ প্রবন্ধে বনমালী দাসের অপেক্ষাকৃত পূর্ণাংগ পুঁথির পরিপ্রেক্ষিতে সোনা রায়ের আলোচনা করা হলো।

সোনা রায়ের পাচালী দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে সোনা রায়ের জন্ম ও বাল্যলীলা এবং অপর বা দ্বিতীয়াংশে সোনা রায়ের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার। পুঁথির প্রস্তাবনায় কবি লিখেছেন :

'সোনারায়ের জন্ম গান আরম্ভ হইবেক
হরি হরি বন্দিয়া গাও হরির রাজ্জ মোর
জন্মিয়া নন্দের গৃহে রাখিলে গ কোল
গকুলেতে থাক কানাই গকুলের কানাই।
তোমা বিণে রামকানু ত্রি-ভুবনে নাই॥'

এর পর পুস্তক আরম্ভ। কবির ভাষায়—'গান আরম্ভ।' গান আরম্ভের পূর্বে অতি সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি অবতারের কথা; মথুরা, বৃন্দাবন এবং যমুনা-সৃষ্টি বর্ণন; সেখানে আশী ঘর গোয়ালার বসতি। মথুরার নন্দ ঘোষের অপুত্রক স্ত্রী যশোদার সামাজিক লাঞ্ছনা। অপমানিতা যশোদার পুত্রবতী হওয়ার প্রতিজ্ঞা:

'যদিয়ে গোয়ালের নারী মুই এনাম পাকিরাও।
ধর্মক সহায় করি পুত্র বর নেঞো।
মুঞি যদি গোয়ালের নারী এ নাম পারাঞো।
ধর্ম আরতিয়া মুঞি পুত্র বর নেঞো॥'

এবং শেষে ধর্ম ঠাকুরের পূজা, নিজের দৈহিক কৃচ্ছতা সাধনের দ্বারা এবং স্ত্রী

হত্যার ভয় দেখিয়ে পুত্র বর লাভ। 'সোনা রায় সন্ন্যাসী হইলে উপারায় চেলা। / ধীরে ধীরে দুটি ভাই পথে দিল মেলা॥'

এই উপারায় অর্থাৎ রূপা রায় কে, কেনই বা তিনি সন্ন্যাসী সোনা রায়ের 'চেলা' হয়েছেন এ প্রশ্ন পাঠককে বিভ্রান্ত করে। পরে অবশ্য উপারায়ের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ইনি সোনা রায়ের ভাই। 'সোনা রায় উপারায় আমরা দুই ভাই।' 'মগলের দেশে' পূজা প্রচার করা তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের সন্ন্যাসী বেশ ধারণের পেছনেও কারণ হচ্ছে 'মগলের দেশে' পূজা প্রচার।

'অরীর মাঝে ঠাকুর বিথ্‌থ তলে বসি।
ভাই ভাই যুক্‌তি করি করে হাসাহাসি॥
সোনারায় উপারায় আমরা দুই ভাই।
মগলের খ্যাশে যায়া নরের পূজা খাই॥'

এর পর পূজা প্রচারের কৌশল হিসেবে দুই ভাই-এর সারাদিন হরিনাম প্রচার এবং রাত্রিকালে চৌর্যবৃত্তি দ্বারা 'মগলদের' উত্তেজিত করা। তাঁদের অনুগত বাঘদের লেলিয়ে জনসাধারণের ক্ষতি করা। 'মগলেরা' উত্তেজিত হয়ে ঠাকুরকে কারাগারে বন্ধন করে। বন্ধন দশায় ঠাকুরের বাঘের সাহায্যে উদ্ধার এবং বাঘের দ্বারা মগলের দুর্দশা ঘটানোর বর্ণনা আছে। এ প্রসঙ্গে অনেক বাঘের নাম এবং তাদের হিংস্রতা ও গুণাগুণের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশেষে 'মগলের' পরাজয় স্বীকার এবং সোনা রায়ের পূজা দিতে স্বীকৃতি দান। 'চারণের ঘোড়া বেচে সেবা করিম তোর।' পূজা পেয়ে এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়াতে সোনা রায় খুশী হয়েছেন। সোনা রায় অল্পে সন্তুষ্ট। ধন জন আড়ম্বরের পরিবর্তে ভক্তের হৃদয়ের ভক্তির কাঙাল তিনি। 'ধনের কিঙ্‌কর না মুই মনের কিঙ্‌কর।' এরপর পুঁথি শেষ হয়েছে। পুঁথির রচনাকার সব শেষে গেয়েছেন : 'সেইদিন সোনারায় ঠাকুর দিয়ে গেল দেখা। / নরলোকে পূজে তাকে পাইয়া পরিখা॥'

তিন.

প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ জন্ম খণ্ডে সোনা রায়ের যে বর্ণনা পাই তাতে তাঁকে অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্নরূপ বলে মনে হয়। পটভূমি মথুরা-বৃন্দাবন, তিনি নন্দ যশোদার সন্তান। সোনা রায়ের বাল্যলীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের ছাপ খুব স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। অন্তত সোনা রায়

উপারায়ের যে কাহিনী আমরা পাই তা আমাদের কাছে নতুন। অন্য কোথাও এ কাহিনীর সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেনি। এই সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য থেকে এ ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে যে সোনা রায়ের কাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। মৌখিক ধারা প্রচলিত থাকার জন্য এই সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটেছে খুব সহজে।

সোনা রায় ব্যাঘ্রবাহন দেবতা—বাঘের সংগে গোরুর চিরদিনের শত্রুতা। [বাঘ-গোরুর শত্রুতার কথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে।] গো-কুলকে রক্ষা করতে গিয়েই মানুষ ব্যাঘ্রবাহন দেবতা সোনা রায়ের পূজা করেছে। গো-কুলের রক্ষক রূপে তাঁকে আরাধনা করেছে। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের সংগে গো-জাতির সম্পর্ক যে কতো গভীর সে সম্পর্কে কিছু না বললেও চলে। উত্তর বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ তথা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব নেহাৎ কম নয়। সম্ভবত এই অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্যের জন্যই মৌখিক সোনা রায়ের গানে অবলীলাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ উপাখ্যান প্রভাব বিস্তার করেছে।

সোনা রায়ের গানে আর একটি দেবতার প্রভাব সহজেই অনুমান করতে পারি। তিনি হলেন 'গোরক্ষনাথ'। উত্তর বাংলায় গোরক্ষনাথের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত; তিনিও গো-দেবতা। অনেক স্থানে সোনা রায়ের নামে গোরক্ষনাথের গান গাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের সংগৃহীত গোরক্ষনাথের একটি খাতার উপর লেখা দেখতে পাই 'সোনা রায়ের গান বা গোরক্ষনাথের গান'। গো-বন্দনামূলক ছড়ার মধ্যে সোনা রায় এবং গোরক্ষনাথকে পাশাপাশি দেখতে পাই।

দক্ষিণ রায়ের কাহিনীরও কিছু প্রভাব সোনা রায়ের কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। [অবশ্য আগে সোনা রায় না আগে দক্ষিণ রায় তা প্রমাণ সাপেক্ষ ও বিতর্কের বিষয়।] দক্ষিণ রায়ের অনুচর কালুরায়ের অনুকরণে সোনা রায়েরও একজন অনুচরের নাম পাওয়া যায়। তিনি উপা রায়। উভয় কাহিনীতে সাদৃশ্যগত মিল খুব বেশি না থাকলেও বাঘের বর্ণনা-সাদৃশ্য এবং উদ্দেশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

সোনা রায়ের আখ্যানে সোনা রায়-উপা রায় এবং দক্ষিণ রায়ের আখ্যানে দক্ষিণ রায়-কালু রায়, উভয় কাহিনীতে এই ভ্রাতৃযুগলের পরিকল্পনায় পৌরাণিক আখ্যান 'কৃষ্ণ-বলরাম' ভ্রাতৃযুগলের কাহিনীর প্রভাব আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

সোনা রায়ের কাহিনী গঠনে আর যে সমস্ত কাব্য-কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের কথা প্রথমেই মনে আসে। ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের অপুত্রক মাতাপিতার অবমাননা এবং পুত্রহীনা রঞ্জাবতীর পুত্র কামনায় ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শালেভর, কাঁটাভর প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনা ও পূজার দ্বারা লাউসেন হেন পুত্রলাভের সঙ্গে গোপিনী যশোদার পুত্র কামনায় ধর্ম পূজাতে কাটারীভর প্রভৃতি দৈহিক লাঞ্ছনা এবং নিগ্রহের দ্বারা ধর্মের কাছ থেকে সোনা রায়কে পুত্ররূপে লাভের ঘটনার সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যেমন নায়ক লাউসেনের একজন ভ্রাতৃকল্প অনুচর কর্পূরসেনকে পাওয়া যায়, তেমনি অনুরূপভাবে সোনা রায়ের কাহিনীতে আমরা পাই সোনা রায়ের ভ্রাতৃকল্প অনুচর উপা রায়কে। আশীঘর গোয়ালার সহিত নন্দ ঘোষের মথুরানগরে বসতি স্থাপনের উপর ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষের বসতি স্থাপনের কোনো প্রভাব আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

মনসামঙ্গলের মনসাদেবী সর্পের সাহায্যে চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ এবং পূজা আদায়ের সঙ্গে সোনা রায়ের বিভিন্ন বাঘের সহযোগিতায় 'মগলদের' উপর অত্যাচার ও 'মগলদের' সায়েস্তা করে পূজা আদায়ের ঘটনা-সাদৃশ্যের কথাও অস্বীকার করা যায় না।

গোরু যেমন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পালিত জীব তেমনি বাঘ উভয় জাতিরই ক্ষতিসাধক প্রাণী। এই বাঘকে প্রদমিত করে গো-কুলকে রক্ষা করার কাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সোনা রায়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। কাজেই সোনা রায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা। তবে আমাদের অনুমান হিন্দুর কাছ থেকে সোনা রায় আগে থেকেই পূজা পেয়ে এলেও তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে পূজা আদায় করেছেন অনেক পরে। তাঁকে এই পূজা আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। মুসলমানেরা এ দেশে পরে এসেছে বলেই এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। 'অরণ্যের মাঝে ঠাকুর বিথ্খতলে বসি। / ভাই ভাই যুক্তি করি করে হাসাহাসি॥ / সোনা রায় উপা রায় আমরা দুই ভাই। / মগলের স্থানে যায়া নরের পূজা খাই॥"

হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তিনি কি উপায়ে পূজা পেয়েছেন সে কথার উল্লেখ আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে নেই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো

সমাজের পূজা আদায়ই যে এই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে কাহিনীর গঠনগত প্রচুর দুর্বলতা থাকলেও কোনো কোনো বর্ণিত অংশে কবির বাস্তব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গর্ভবতী নারীর কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় বনমালী দাসের কাব্যে তার সার্থক বর্ণনা আছে : 'সাত মাসেতে গরভ হইল থির। / স্বাদে স্বাদে খায় কন্যা হলদি যামুর॥ / অষ্ট নও মাসেতে গরভ হইল ভারি। / পোড়ামাটি টেঙ্গা দই খায় গোপনারী॥'

সপ্তম মাসে গর্ভের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং গর্ভবতী নারীর হলদি, যামুর, পোড়ামাটি বা টক দই ভক্ষণের ছবি আমাদের বাস্তবের কাছাকাছি এনে দাঁড় করায়। মধ্যযুগের কাব্যে আমরা এই ধরণের চিত্র প্রচুর পেয়ে থাকি।

সোনা রায়ের শৈশব বর্ণনাও কবির বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় বহন করে :

'ছয় মাসে হামকুড় দিয়া উঠে কোলে।
সোনা বরণের কণ্ঠমালা ঢোলে ছেইলার গলে॥
সাত মাস হইল ছাইলার তৈলক না রয়।
খোচা খড়ি অনল জল নাই করে ভয়॥
অষ্ট নও মাসেতে কান্দিয়া চায় ক্ষির।
দশ মাসে উঠে ছাইলা ঠেঙ্গা দিয়া থির॥
এগার মাসেতে ছাইলা থাপি থুপি হাটে।
আছাড় পড়িলে যেন মায়ের প্রাণ ফাটে॥
এক বছরের ছাইলা হাটিয়া বেড়ায়।
বান্ধবের লাগ্য পাইলে খেলা খেলাইতে যায়॥'

সোনা রায়ের এই ক্রমবর্ধমানতার ছবি যেন কেবল সোনা রায়ের ছবি নয় আমাদের ঘরের প্রতিটি শিশুর ছবি।

কিশোর সোনা রায়ের মায়ের অনুপস্থিতিতে ননী চুরির চিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করে : 'নন্দ গেলো বাতানে যশোদা গেলো জলে।/ খালি ঘর পাইয়া যাদু ননী চুরি করে।/শিকায়াতে থুইছে ভাণ্ড লাগ্য নাহি পায়।/পিরার উপর পিরা থুইয়া উর্দ্ধমুখে চায়॥'

নাগালের বাইরের লোভনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির এ কৌশল আমাদের শিশু জীবনের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাপ্ত সোনা রায়ের পুঁথিগুলি খণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত এবং পারম্পর্যহীন হওয়ায় চরিত্রগুলি যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। কিন্তু 'বোনমালী দাসের' যশোদা চরিত্র সুচিত্রিত বলা যায়। নারীজীবনের আকাঙ্ক্ষা, নারীধর্মরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তাঁর ত্যাগ, বীর্য, ধৈর্য ও সাহস তাঁকে বীর নারীর মহিমা দিয়েছে। আবার অন্যত্র তিনি বাঙালী আর দশটা নারীর মতোই মাতৃস্নেহে ভরপুর। তাঁর সন্তানের গায়ে আঁচড় লাগলে তা শতগুণ হয়ে তাঁর বুকে এসে বাজে। পুত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা, পুত্রের অমঙ্গল আশংকায় তাঁর হৃদয় থরথর করে কাঁপতে থাকে। তাঁর এই ছবি আমাদের সন্তান-বৎসলা স্নেহময়ী বাঙালী মায়ের ছবি।

---

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'।

২. স্বামী শঙ্করানন্দ : 'বঙ্গে মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার বিস্তার'। এই সঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সাহিত্য প্রকাশিকা' ৪র্থ খণ্ড, ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী 'রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

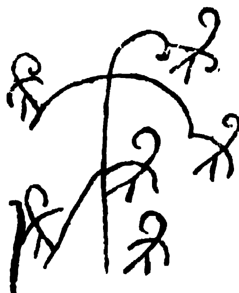
৩. খান্ চৌধুরী আমানত উল্লাহ্ : 'কোচবিহারের ইতিহাস'।

৪. ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় : 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের পূজাপার্বণ ও দেবদেবী'।

৫. গৌড়বার্তা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।

৬. ডঃ ফণী পাল : 'সোনা রায়ের পূজা-পাঁচালী ও প্রসঙ্গত'।

৭. 'The Tiger God in Bengal Art' : Modern Review, 1932.



উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী

শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

এক.

উত্তরবঙ্গের অরণ্য সঙ্কুল পল্লী অঞ্চলে যাঁরা কখনো বসবাস করেন নি, তাঁদের পক্ষে এখানকার বাসিন্দাদের ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে কিছু জানা অসম্ভব। হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত সরল অশিক্ষিত মানুষের সংস্কার এবং নিম্নভূমির মার্জিত শিক্ষিতজনের বিশ্বাসের ভেদরেখা এত সূক্ষ্ম যে একের শেষ এবং অন্যের শুরু চিহ্নিত করা কঠিন। এই মানসিক ক্রিয়া কি সত্যই কুসংস্কার ? উত্তরবঙ্গে বাঘের উপদ্রবে জর্জরিত পল্লী এলাকার বাসিন্দাদের চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই এর বিচার করা যাক। একটু বিশ্লেষণ করলেই এঁদের চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির একটি অদ্ভুত স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। যে বাঘ সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে ঢুকে নিঃশব্দে এক দানবীয় দূতের মতো এসে গৃহস্থের আঙ্গিনা থেকে সদ্যজীবন্ত মানুষকে মুখে করে নিয়ে যায়, যে বাঘের জন্য ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল ওঠে, তাকে হিংস্রতার প্রতিমূর্তি জেনেও তার সম্বন্ধে একটি বিস্ময়ান্বিত শ্রদ্ধার ভাব, আক্রান্ত গ্রামের জনসমাজের মধ্যে দেখা যায়। তারা কখনও ভাবে, এই নরখাদক বাঘের পশুমূর্তির ভিতরে কোন অপদেবতা বাস করেন। সেই বিশ্বাসের বিচিত্রতা মাঝে মাঝে চরমে উঠে নানাবিধ কাহিনীরও জন্ম দেয়, তখন নরখাদক বাঘ হয় একজন দেবতারই আত্মাপ্রাণী। এ হেন বাঘকে মারার ক্ষমতা কোন শিকারীর নেই, এই রকম বিশ্বাসও জন-মনে গড়ে ওঠে।

এইরকম বিশ্বাসের কি কোন হেতু বা অতীত ঐতিহ্য আছে ? জানা নেই, তবে থাকা অসম্ভব তো নয়ই, খুবই স্বাভাবিক। কারণ, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে বাঘের স্মৃতি অতি পুরোনো। ভারতবর্ষের আদি গ্রন্থ 'বেদে' ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ খণ্ডের ৫৪ সূক্তের ৭ম শ্লোকে দেবতার কাছে ঋষির প্রার্থনা 'আমাদের গোধন যেন ব্যাঘ্রাদির দ্বারা নিহিত না হয়।' ঋগ্বেদের

১০।১২৭।৬ শ্লোকের 'রাত্রি সূক্তে' ঋষি কৌশিক প্রার্থনা করছেন: 'মা রাত্রিদেবী! বাঘিনী ও বাঘকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ'। শাংখ্যায়ন শ্রৌত সূক্তে [৪-২০-১] কৃষির দেবতা রুদ্রশিবের দুইপুত্র 'ভব' ও 'সর্ব'কে শিকারোদ্যত বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[১] 'অথর্ববেদে'ও বাঘের উল্লেখ দেখা যায়।[২] 'তৈত্তিরীয় সংহিতায়' অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে "কোন্ দেবতাকে কোন্ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল। তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইবে। কোন কোন মতে বলিল: 'না। যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।' এই দেবতাদের মধ্যে শার্দুল [অর্থাৎ বাঘ] অন্যতম; তাঁকে গৌরমৃগ দিতে হইবে"।[৩] দেখা যাচ্ছে সংহিতার যুগেই ব্যাঘ্র দেবতারূপে পরিগণিত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুদ্রা হরাপ্পার শিলমোহরে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তির দু-দিকে চারটি পশুর মূর্তি দেখা যায়—হাতী, গণ্ডার, মহিষ ও ব্যাঘ্র। হরাপ্পা শিল্পের কোন কোন মুদ্রায় ব্যাঘ্ররূঢ়া দেবীর চিত্র আছে। মহেঞ্জো-দারোতেও ব্যাঘ্রবাহনা দেবীমূর্তির 'শিল' পাওয়া গেছে।[৪] এ থেকে মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা সমাজে ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। মালদহ মিউজিয়ামে দশম শতাব্দীর গৌড়ীয় শিল্পের একটি অভিনব মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। মূর্তিটি কালো পাথরে তৈরী ও চমকপ্রদ, বাঘের পিঠে ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গীতে বসে আছেন একটি দেবমূর্তি। "পায়ে তাঁর গামবুট! গামবুটের 'টো'-এর দিকে নাগরার মতো শুঁড় ওঠানো আছে। পরণে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা। কাপড়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য,—দশম শতাব্দীর এই মূর্তিটি উত্তর বাংলার ইতিহাসের উপর একটি বিশেষ ধরণের আলোকপাত করেছে"।[৫] ঊর্দ্ধাঙ্গ রায়মল্ল এবং নিম্নাঙ্গ ব্যাঘ্র এইরূপ চিত্রিত একটি পোড়া-মাটির মূর্তি বিশ্বভারতীর কলাভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে [No. 6. 723-53]। দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লিপিতে উত্তরবঙ্গের কোটিবর্ষবিষয়ে 'কোকামুখ তীর্থের' উল্লেখ আছে। মহাভারত এবং পুরাণেও কোকমুখ তীর্থের উল্লেখ আছে।[৬] বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাঘ্র [নেকড়ে]-মুখী 'কোকামুখা' দুর্গাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। ভরহুতের রেলিং-এ চুলকোকা, ক্ষুদ্রকোকা, মধ্যমকোকা এবং

মহাকোকা দেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে।[৭] কোকামুখস্বামী=ব্যাঘ্রমুখ বিষ্ণু বা শিব। এতে ব্যাঘ্রমুখযুক্ত দেবতার পূজার কথাই জানা যাচ্ছে। বগুড়া জেলায় তুলসী নদীর তীরে নিমাই শাহের দরগার ধ্বংসস্তূপ মধ্যে একটি প্রস্তর স্তম্ভে চারটি ব্যাঘ্র মুখ উৎকীর্ণ রয়েছে।[৮] বলাবাহুল্য, এটি কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। গুর্জর প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজদেবের দৌলতপুর তাম্রশাসনখানি নবম শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাঘ্রবাহনা দেবীপূজার একখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পটের উপরে খোদিত সমপাদস্থানক ভঙ্গীতে চতুর্ভুজা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন দুইটি বাঘের মাঝখানে।[৯]

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে [২৩ অধ্যায়ে] অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে দুর্গার স্তব করেছেন : 'হে গোপেন্দ্রাত্মজে নন্দগোপকুলসম্ভবে কোকমুখে! তুমি জম্বু, কতক ও চৈত্যবৃক্ষের কাছে নিরন্তর বিরাজ কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করি।' দুর্গা কোকমুখা। তিনি কান্তার অর্থাৎ বনবাসিনী। কান্তারে 'জম্বু অর্থাৎ জাম, 'কতক' অর্থাৎ একরকম অরিষ্ট এবং 'চৈত্য' অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছ। জঙ্গল ও বন্যজন্তু, পর্বত ও অরণ্য দুর্গার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত। উত্তরবঙ্গে এর কোনটিরই অভাব নেই। এই জন্যই বিভিন্ন ব্যাঘ্রবাহনা দেবী মূর্তি উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের আদিম বংশোদ্ভব কোচ-রাজবংশের আরাধ্যাদেবী 'ভবানী' ব্যাঘ্র-বাহনা; কোচরাজবংশের রাজলাঞ্ছনেও [Coat of Arms] ব্যাঘ্রের মূর্তি। এ থেকেই উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্রবাহন দেব-দেবীর প্রাধান্যের কারণ বুঝতে পারা যায়। আদিম বনবাসীদের দ্বারা পূজিতা দেবী দুর্গা, অনেক পরে, বাঙ্গালী জাতির উপাস্যা দেবী হয়েছেন। বনদেবী 'বনদুর্গা' বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েতে পরিণত হয়েছেন। ইতিহাসের কত বিচিত্র পূজা-পার্বণ যে দুর্গোৎসবের মধ্যে মিলিত হয়েছে তা এ থেকেই প্রকট হয়ে উঠছে।

বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্র জাতকে' বৃক্ষ-সম্পৃক্ত ব্যাঘ্র-মানবের এবং ব্যাঘ্র-সিংহযুক্ত দু-জন দেবতার কথা বিধৃত হয়েছে। 'মারুত-জাতকে'ও বাঘের দেখা পাওয়া যায়। 'বামনপুরাণমতে' দক্ষযজ্ঞস্থানে শঙ্করের দেহ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ব্যাঘ্রতুল্য তেজিয়াল দুই দেবতার উৎপত্তি হয়েছে—এঁদের নাম শর্ব এবং ভব। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'ও এর সমর্থন আছে। উত্তরবঙ্গের সীমান্তদেশ ভুটানের পারো নগরীতে 'তাং-সাং' বিহারের নাম তাই 'বাঘের বাসা'। ভুটিয়ারা বলে, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পদ্মসম্ভবম্ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য

ভুটানে আসেন এবং তিনি আসেন একটি বাঘের পিঠে চড়ে। তিনি যে পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কালক্রমে সেখানে একটি বৌদ্ধমঠ গড়ে ওঠে। সেইটিই হলো তাৎ-সাং বিহার।[১০] গোয়ালপাড়া জেলায় [অধুনা গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইংরেজ শাসনের আদিযুগে ছিল রংপুর জেলার অধীন] একটি বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে: গৌরীপুরের সাতমাইল দূরে রাঙ্গামাটি পাহাড়। ঐ পাহাড়ের কাছে বাঘমারা নামে একটি বস্তি আছে। ঐ বস্তির নীচে পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে একটি গুহা। তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গৌরীপুর রাজবংশের আদিপুরুষ একদিন ঐ জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলেন ব্রহ্মপুত্রের জলভেদ করে দুটি সূর্য উঠছে। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে তিনি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন, একটি সূর্য উঠে গেল আকাশে। আর আলোয় পরিবৃতা একটি ষোড়শী কন্যা ঐ গুহায় ঢুকে গেলেন। কিছুকাল পরে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো একটি বাঘ—ষোড়শী মেয়েটি তার পিঠে। তাই দেখে গৌরীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাস্তার উপর শুয়ে পড়লেন। দেবী রাস্তা ছেড়ে দিতে বলায় তিনি অস্বীকার করলেন। তখন দেবী তাঁকে সাতটা লাথি মারলেন। তবুও রাজা পথ ছেড়ে না দিয়ে বাঘের জন্য প্রতি বৎসর জোড়া-পাঁঠা মানত করলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে দশভূজা মূর্তিতে দেখা দিয়ে বল্লেন: 'তোকে সাতটা লাথি মেরেছি; পূজা করিস আর না করিস আমি সাতপুরুষ তোদের ঘরে থাকবো। তারপর পূজা না পেলে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।' গৌরীপুরের রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গে বংশের সাতপুরুষ শেষ হয়েছে; ভূমি সংস্কার আইনের ফলে জমিদারীও চলে গেছে। তবুও এখন পর্যন্ত প্রতিবৎসর মহা-নবমীর দিন জোড়া-পাঁঠা দিয়ে দেবীর পূজা হয়। দেবী অষ্টধাতু নির্মিত ব্যাঘ্রবাহনা মূর্তি। বলাবাহুল্য এটিও কান্তারবাসিনী দেবী দুর্গার আর এক রূপ। এই জেলারই 'বাঘেশ্বরীদেবীর মন্দিরে' এক অভিনব ব্যাঘ্রদেবী পূজা হয়ে থাকে। মাটি দিয়ে তৈরী একটি বাঘের পিঠের ওপরে রক্ষিত একখানি তরবারি পূজিত হয়ে থাকে দেবীর প্রতীকরূপে।[১১]

তন্ত্রশাস্ত্রেও ব্যাঘ্রবাহনা দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। 'প্রপঞ্চসার তন্ত্রে' [১৪, ২৬-২৭] অভিচারিকাদেবীর বাহন বহুস্থলেই ব্যাঘ্র। 'শিবপুরাণে' [বায়বীয় সংহিতা: ২১-২৩] দেবী কালীর বাহন বাঘ 'সোমনন্দী'। 'ধর্মপুরাণে' দেখা যায় পূজার বলিস্বরূপ অজার বহির্দ্বারে 'বাঘসেন' অবস্থান

করলেন। 'বরাহপুরাণে' দেখা যায় শিব, পুত্র গণেশকে দিয়েছেন পরবার জন্য—'ব্যাঘ্রচর্মদদৌ শিবঃ'। সময় বিশেষে মনসাদেবী এবং শীতলাদেবীকেও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করতে দেখা যায়। বজ্রযান বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজ্রধাতেশ্বরী নামে এক শক্তিদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ঠ ধ্যানী-বুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিস্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে তাঁর মূর্তিও সর্বত্র পূজিত হত। বৌদ্ধ 'সাধনমালায়' [সাধনমালা, ১৩৬] বজ্রধাতেশ্বরীর সাধনার যে কথা আছে তাতে সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর উল্লেখ দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় উত্তরবঙ্গে আদিম বংশোদ্ভূত কোচরাজাদের কুলদেবী ভবানীও ব্যাঘ্রবাহনা। কোচবিহার শহরে বৈরাগী-দীঘির পাড়ে দেবীর দক্ষিণমুখী মন্দির। মন্দিরটি 'ইটের ও চারচালার উপরে গম্বুজ সজ্জিত। গম্বুজের উপরে যথারীতি পদ্ম, আমলক ও কলস পর পর স্থাপিত আছে। নীচু ভিত্তি বেদী সমেত দেবালয়টির উচ্চতা প্রায় ·৮ ফুট [৮·৭ মিটার]। মন্দিরে রূপার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাতা ভবানীদেবীর লাল রঙের প্রায় ২'-৬" [৭৮ সেন্টিমিটার] উঁচু একটি মাটির মূর্তি আছে। মূর্তিটি মহিষাসুরমর্দিনীর অনুরূপ এবং বড়দেবীর মত [কোচবিহারে দুর্গাপূজার সময় পৃথক স্থানে পূজিতা] লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ এখানে অনুপস্থিত। তবে এই দেবীর দুই সখী—বামে জয়া ও দক্ষিণে বিজয়া এখানে উপস্থিত আছেন। দেবী দশভুজা হয়ে বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাঘ্রের উপর দাঁড়িয়ে অসুরকে বিনাশরতা। দুর্গার বাহনরূপে ব্যাঘ্রের ব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না'।[১২] বলাবাহুল্য, জয়া এবং বিজয়ার মত সিংহও পরবর্তীকালের সংযোজন।

কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে ব্যাঘ্রের সম্পর্ক অতি গভীর। কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ কর্তৃক কামাখ্যা পাহাড়ে নির্মিত মন্দিরের উঠানে খোদিত আছে 'বাঘচাল নামক খেলার ছক। দুটি বাঘ ও কুড়িটি ছাগল নিয়ে এই খেলা হয়ে থাকে। 'বাঘচাল' আর কিছুই নয় 'বাঘবন্দী' খেলা।[১৩] ক্রীড়া-ক্ষেত্রেও বাঘের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। রিপুঞ্জয় দাশের 'মহারাজ বংশাবলী'তে দেখা যায় কামতেশ্বর মৃগয়া সমাপন করে 'একস্থানে আসীয়া দর্শন করিল, বহু ব্যাঘ্র-ব্যাপিত ঐ স্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী নামে দেবীর বাসস্থান দিয়া পরিপারক নিযুক্ত করিয়াছে'।[১৪] এই ব্যাঘ্রেশ্বরীর মন্দির কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত।[১৫] উত্তরবঙ্গের পার্শ্ববর্তী নেপালরাজ্যে 'বাঘযাত্রা' নামে

এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাঘের মুখোস পরে প্রতি বৎসর ২রা ভাদ্র তারিখে রাজপ্রাসাদ ঘিরে নেওয়ারীগণ দলবদ্ধভাবে নৃত্য করতে থাকে।[১৬] নেপালে বাঘের দেবতার নাম 'বাঘভৈরব'। বলাবাহুল্য, পার্শ্ববর্তী রাজ্য নেপালের সাংস্কৃতিক প্রভাব উত্তরবঙ্গে কম নয়।

'সাঁওতালপুরাণে'ও বাঘের কথা আছে। সাঁওতালদের ঠাকুরবাবা 'সিংচন্দো' বা সূর্যদেব এবং 'নিন্দচন্দো' অর্থাৎ তাঁর পত্নী চন্দ্রদেবী সাঁওতালদের অপবিত্র ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাদের ধ্বংস করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন। স্থির করলেন 'পিলচুহাড়াম' ও 'পিলচুবুড়ি' নামক দুজন যুবক-যুবতীকে বাঁচিয়ে রেখে বাদবাকী সকল মানুষকে ধ্বংস করা হবে। সুতরাং ঐ দুজন যুবক-যুবতীকে একটি পর্বতের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়ে সিংচন্দো স্বয়ং ঢেকে দিলেন। তারপর সূর্যের দাহিকাশক্তি অগ্নিরূপে বেড়ে চল্লো। বাঁচল মাত্র দুইজন, 'পিলচুহাড়াম' ও 'পিলচুবুড়ি'। ক্রমে তাদের দ্বাদশপুত্র ও দ্বাদশ কন্যা জন্মালো এবং এদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারাই পৃথিবী জনপূর্ণ হয়েছে। এই সময়েই সিংচন্দো এবং নিন্দচন্দোর চেষ্টায় নানান ধরণের জীবজন্তুর সৃষ্টি হলো—যাদের মধ্যে বাঘ অন্যতম।[১৭]

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে যাদুবিদ্যার প্রভাব অপরিসীম। তাদের বিশ্বাস, যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ যে কোন জীবজন্তুর দেহধারণ করতে পারে। কিংবদন্তী এই যে একদিন একজন আদিবাসী মুণ্ডা দেখল তার স্ত্রীকে বাঘে ধরে খেয়ে ফেল্ছে। খাওয়া শেষ হলে বাঘটি ধীরে সুস্থে ঐ স্থান ত্যাগ করলে মুণ্ডাটি বাঘের পিছনে পিছনে চলল এবং বাঘটি পুষা নামক এক ব্যক্তির ঘরে ঢুকে পড়লো। মুণ্ডাটি তখন পুষার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে সব কথা বললো। আত্মীয়রাও বলল যে তাদেরও সন্দেহ পুষা বাঘ ভিন্ন আর কিছু নয়। সকলে মিলে পুষার ঘরে হাজির হলো, দেখা গেল ঘরে পুষা ভিন্ন আর কেউ নেই, বাঘ তো নয়-ই। তারা পুষাকে মেরে ফেল্ল।[১৮] সুতরাং বাঘের স্মৃতি উত্তরবঙ্গের অদিম লৌকিক সমাজে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও ব্যাঘ্র-প্রভাবের উল্লেখ আছে। কবি বিপ্রদাসের মতে গন্ধর্বকুমারী বিনালতাকে দেখে ব্রহ্মার শুক্রপাত হয়। ব্রহ্মা 'শুক্রপাত স্থানে দিল কমণ্ডলু জল, / জন্মিল দুরন্ত ব্যাঘ্র দেখি ভয়ঙ্কর' [২১ পৃঃ]। ব্রহ্মার দুই পুত্র 'দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছপদভাগে' অর্থাৎ আদিত্য ও অগ্নির সহজাত ব্যাঘ্র। অগ্নি ['শুক্র'] ও মেঘ ['পর্জন্য'] ['ঝড় প্রায় উড়ে ব্যাঘ্র ব্রহ্মার মায়ায়, /

নীরদ নিকটে বহে বিপরীত কায় (২১ পৃঃ)]-এর সংযোগে ব্যাঘ্রের সৃষ্টি। আবার কবি হরিদেবের মতে দেবীদুর্গার দেহের ঘর্ম থেকে বাঘের জন্ম হয়েছে :

'কপিলা বলেন সুত তুমি বড় গুণযুত
শুনহ কারণ তত্ত্ব ব্রহ্ম।
দেবী কৈল বিড়ম্বনা ভাঙ্গিল ঘর্মের কোনা
তায় হৈল শার্দুলের জন্ম ॥'[১৯]

কবি হরিদেব অন্যত্র লিখেছেন :

'সুরথ নামেতে রাজা সূর্য বংশে জন্ম,
ভগবতী পূজা বিনে নাই অন্য কর্ম।
সেইকালে ভগবতীর অঙ্গে হৈল ঘর্ম,
তাহাতে হইল ভাই শার্দুলের জন্ম।
দেখিয়া নৃপতি বড় হইলা বিস্ময়,
ভগবতী নৃপতিব তরে কিছু কয়।
শুনহ সুরথ রাজা আমার বচন,
ভয় নাঞি তোমারে কহিল বিবরণ।
সুরথ বলেন মাতা শুন গ উত্তর,
শার্দুলের জন্ম হইল তোমার গোচর।
বৎসরে বৎসরে ছানা যদি হয় বাগে,
লোকেরে খাইবে তবে অতি অনুরাগে।
ভগবতী বলেন বাগ বর দিলঙ্ তোরে,
হইব্র তোমার ছানা এক যুগান্তরে।'[২০]

এই কাহিনী কোন পুরাণে নেই। মনে হয় এটি লৌকিক বিশ্বাসের কাব্যরূপ। অবশ্য কৃষির দেবতা রুদ্রের সন্তান বাঘ অবশ্যই রুদ্রের স্ত্রীরও সন্তান; সেইজন্যই সম্ভবত এই লৌকিক কাহিনী। আশ্চর্যের বিষয় মানব সভ্যতার উন্মেষকালেও চতুর্ভুজ ব্যাঘ্রদেবতা পূজা পেয়েছিলেন। মহেঞ্জোদারো এবং চানহুদারোর মোহরে এবং বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্রজাতকে'র কাহিনী অবলম্বনে সম্প্রতি তুলনামূলক যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে[২১] তার সূত্র অনুসরণ করে উত্তরবঙ্গের বুনো ও কাঠুরিয়া পূজিত অরণ্যাধিপতি ও ব্যাঘ্র সম্পৃক্ত দেবদেবীর প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য অকারণ নয়, অনৈতিহাসিকও নয়।

আদিম মানুষ যে জন্তুকে দেবতা ভাবত বা দেবতার জন্তুরূপ কল্পনা করত, সভ্য মানুষের পুরাণাদিতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে জন্তুরূপী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। যে পিরামিড সবচেয়ে পুরাণো তারও অনেক আগে থেকে,—মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে, এই পূজার ধারা চলে এসেছে। মিশরীয় দেবতা 'হেথর' [**Hethor**]-এর গাভীরূপ এবং 'সেবেকে'র [**Sebek**]-এর কুম্ভীর রূপ প্রসিদ্ধ।[২২] আমাদের দেশেও রুদ্র-শিব, ভগবতী প্রভৃতির বৃষভ, গাভী, শৃগাল প্রভৃতি রূপের কথা পাওয়া যায়। বানরমূর্তি মহাবীর এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের পূজা পাচ্ছেন। আদিম মানুষ যে জন্তুরূপী দেবতার পূজা করতো এ সব তারই নিদর্শন। আদিম মানুষ মনে করতো জন্তুর শক্তি, সাহস ও বুদ্ধি তার নিজের চাইতে অনেক বেশী। আরও বিশ্বাস করতো জন্তু মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। মৃত্যুর পরেও তার আত্মা তেমনি শক্তি-শালী থাকে এবং মানুষের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারে। তারই ফলে জন্তুকে দেবতা কল্পনা করা তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিল, সে বিশ্বাস করলো জন্তু-দেহেও দেবতা আপন শক্তি প্রকাশ করতে পারেন। এইরূপ বিশ্বাসবশতই উত্তরবঙ্গের আদিম সমাজে ব্যাঘ্র দেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ প্রধানত কৃষিজীবী। কৃষির দেবতা রুদ্র-শিব আদিতে কিরাত জাতির দেবতা ছিলেন। কিরাত জাতির অনেক উপাখ্যানের সঙ্গে মহাদেব বিশেষ ভাবে জড়িত। ইনি বৈদিক দেবতা নন; দক্ষযজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণ হয় নি, ইনি যজ্ঞভাগও পেতেন না [মহাভারত : শান্তি : ২৮৩]। মহাভারতের বনপর্বে কিরাত অধ্যায়ে [৪, ৩৫, ২] অর্জুনের সঙ্গে কিরাত-বেশী মহাদেবের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও [৪০, ২৭, ২৪] সুবর্ণদেহী মানুষের এবং ঐ প্রসঙ্গে নররূপী ব্যাঘ্র অর্থাৎ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তির উল্লেখ আছে :

'কিরাতাস্তীক্ষ্ণ চূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
অন্তর্জনা চরাঘোরা নরব্যাঘ্রাঃ ইতি শ্রুতাঃ॥'

উত্তরবঙ্গ প্রধানত কিরাত জাতি অধ্যুসিত এলাকা। মহাভারতের সভা-পর্বে [৩০, ২৬-২৮] কিরাত দেশ লৌহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যময় [কাঞ্চনম্ রজতঞ্চৈব] এবং তাদের নানা প্রকার সূক্ষ্ম-বস্ত্র বয়নকারী বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্কোণনদী [স্বর্ণকোণ] অতীতের স্বর্ণের স্মৃতি বহন করছে।

কলকাতা চিত্রশালায় গুপ্তযুগের শিল্পকর্মের নিদর্শন স্বরূপ পাথরে খোদাই করা 'কিরাতার্জুনীয়ে'র একখানি চিত্র [bas relief] আছে। 'প্রস্তর ফলকের বামার্দ্ধে অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কিরাতরূপী মহাদেবের চরণ বন্দনা করিতেছেন। একটি স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি উৎকীর্ণ আছে'।[২৩] এই কিরাত-বেশী মহাদেব ও তাঁর সঙ্গিনী কিরাত রমণীরূপিণী পার্বতী উত্তরবঙ্গের জনজীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। পশ্চিমে কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ ও গুহ্যেশ্বরী, পূর্বে কামাখ্যা ও উমানন্দ ভৈরব, মধ্যে জল্পেশ ও সিদ্ধেশ্বরী সকল তীর্থস্থানেই এঁরা আছেন। এই কিরাতবেশধারী মহাদেব ও তাঁর সঙ্গিনী পার্বতীই কি পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবতা ব্যাঘ্রবাহন 'সন্ন্যাসী' এবং ব্যাঘ্রবাহনা 'ভাণ্ডানী'র রূপ ধারণ করেছেন? অসম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে—যে সকল স্থানে উন্নত ভাবাদর্শ পৌছায় নি, আদিম সংস্কৃতিরই প্রাবল্য ছিল—সেখানে মহাদেব ও পার্বতীর পূজাই স্বর্ণকান্তি ব্যাঘ্র দেবতার পূজায় পরিণত হয়েছে মনে করলে ভুল হবে না।

বাংলার আরণ্যভূমির বাঘ, জগতের বাঘের রাজা। রূপে-গুণে ও সৌন্দর্যে সারা পৃথিবীর বিস্ময়। আদিম মানুষ মনে করত বাঘের শক্তি, সাহস এবং ধূর্ত-বুদ্ধি তার নিজের চেয়েও অনেক বেশী এবং বাঘ দেবতারই আত্মাপ্রাণী। সুতরাং 'ভয়ঙ্কর-সৌন্দর্যে'র অধিকারী বাঘের দেবত্বে উন্নীত হতে দেরী হয় নি। এই জন্যই বাংলার নানাস্থানে নানা নামে লৌকিক ব্রত পূজায় ব্যাঘ্র দেবদেবী স্থান লাভ করেছেন।[২৪] বাঘ কুলকেতু [totem] ও কুলপদবীযুক্ত মানুষ এই জন্যই বাংলায় ও বাংলার বাইরে অনেক পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলায় ওরাওঁদের অনেকের গোত্র 'বাঘ' এবং লাকড়া' অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।[২৫]

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গেও লোকে নিছক বাঘেরই পূজা করে থাকে। এঁরা কেবলমাত্র সাঁওতাল-কোল প্রমুখ আর্যপূর্ব সমাজের নন, এঁরা আদিম ও লৌকিক এবং বৈদিক-বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-পৌরাণিক সকল সংস্কৃতিরই ধারাবাহী পল্লীবাসী বাঙ্গালী। আগেই বলেছি রুদ্র-শিব কৃষিদেবতা, কৃষির অন্যতম উপাদান গোরু; গোসম্পদ রক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের কৃষকগণ তাই স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাঘ্রপূজা করে থাকেন। এই ব্যাঘ্রদেবতা যে সে বাঘ নন—কোথাও তিনি 'রায় গোসাঞী সোনাই', কোথাও বা ব্যাঘ্রবাহন 'মহারাজা', আবার কোথাও তিনি প্রহরণধারী 'ডাংধরা' এবং অন্যত্র তিনি 'সোনা রায়'।

স্ত্রীমূর্তিতেও তাঁর পূজা হয়ে থাকে, 'কামাখ্যা', 'রণপাগলী', 'ভাগুনী' প্রভৃতি নামে। বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র তাঁর নাম ও রূপ। শুধু বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক রূপই নয়, এই সকল পূজায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সেটা শুধুমাত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বা শঙ্করদেবের প্রভাবের ফলই নয়, মনে হয় দশাবতারের অন্যতম, হিরণ্যকশিপু বধকারী নৃসিংহের প্রভাবও যেন আছে। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালাগানের মাধ্যমে নৃসিংহরূপী 'ব্যাঘ্রদেবতা' তাঁর পূজা আদায় করেছিলেন এদেশের লোকের কাছ থেকে। এই ভাবেই এদেশে ব্যাঘ্র-বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এ 'ডাউহিলে' ত্রিশূলের উপরে পূজিতা 'সিংহদেবী' পার্বত্যজাতির মনে ব্যাঘ্র বিশ্বাসের আর একটি উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র হিন্দু সমাজে নয় মুসলমান সমাজেও ব্যাঘ্রদেবতা পূজিত হয়েছেন নানারূপে, নানা নামে। প্রবাদ এই যে, মালদহের পীর মকদুমশাহ 'বাঘের উপর চড়িয়া এক হিন্দু যোগীর সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন'।[২৬] 'সুলতান বলনী' নামক একখানি মুসলমানী কেতাবের মতে: "সুলতান সাহেব 'ঐরাবত' নামক এক বাঘের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম প্রচার করিতেন"।[২৭] উত্তরবঙ্গে 'পূর্বে গ্রামের অনেকেই দেখিতে পাইতেন যে, বুড়ুনীর পীর ছাহেব হঠাৎ বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আস্তানায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেন'।[২৮] জলপাইগুড়ি জেলার ছোটশালকুমার থেকে বড়শালকুমার যাওয়ার পথে বন-মধ্যে 'আছরের ওয়াক্ত' হওয়ায় নামাজ পড়া আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে 'বিরাট আকারের দুইটি ব্যাঘ্র, দুইটি বাচ্চাসহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া' হুজুর পীর কেবলের কাছে এসে বসল। 'তিনি নামাজ শেষ করিলে, ব্যাঘ্র দুইটি বাচ্চাদের লইয়া যেমন আসিয়াছিল সেই পথেই চলিয়া গেল'।[২৯] রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার জগৎবেড় গ্রামে হাজার হাজার লোক দেখল 'হুজুর ছাহেব আছরের নমাজ সমাপন করিয়া একটি চিয়ারে তছবিছ হস্তে উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে জঙ্গলের প্রান্তে বিরাট হুঙ্কার ছাড়িয়া বাঘ দুটি হুজুর কেবলার খেদমতে……[আসিয়া] তাঁহার পদপ্রান্ত চাটিতে লাগিল'।[৩০] হুজুর পীরের প্রতি ব্যাঘ্রকুলের ভক্তির এরূপ দৃষ্টান্তের পরিমাণ প্রচুর এবং বিস্ময়কর।

এ ছাড়া 'সোনাপীর', 'মাণিকপীর', 'সত্যপীর' প্রভৃতি নানা ব্যাঘ্রবাহন

পীরের কথা আছে। ব্যাঘ্র বশকারী বা ব্যাঘ্র বিতাড়ক পীর ও ফকিরদের জমায়েত বা বাসস্থানকে 'হারুং' [**Hurrung**] বলে। এই সকল পীরদের নিয়ে অনেক কবিতা বা পাঁচালি লেখা হয়েছে। একটি পল্লী-কবিতায় জানা যায় :

'সভে বলে হায় হায় রাখ প্রাণ আল্লায়
রইক্ষ্যা কর মহাম্মদ ঠাকুরে।
কাঁহ বা পলায় ডরে আতঙ্গিয়া কাঁহ মরে
মাথার পাগুরি ফেলায় দূরে॥
বাঘগণ লাফে লাফে আলুম আলুম ডাকে
খাইল যতেক সেনাগণে।
পলাইল এক ঝন বন্দিল পীরের চরণ
হারুং নামেতে নিকেতনে॥'

দ্বিজ গুণনিধি রচিত 'সত্যপীরের পাচালী'তে আছে :

'অসত্য···মুনি সত্যপির···সত্যপীর পতিতপাবন স্বুরাস্থর তপোধন। ······চতুরাল লম্বমান শার্দুল বাহন বিরাজিত মনোহর। কুসম শরতনু··· ·····সোনার খড়ম পায়ে বাঘের চামরা গায়ে পরিধান কেবল কপিন সত্যবান······অবতিন্ন······'।[৩১]

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তাকে 'হাসান-হোসেনের পালা' বলে। এই পালাতেও ব্যাঘ্রের কীর্তিকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়। জয়নাল আবেদিনের চিঠি নিয়ে দূত রওনা হয়েছে :

'এমন সময় জয়নালের কাসিদ পন্থে দেখা দিল।
সামনে আইস্যা জঙ্গলরার বাঘ মুড়ি যে ধরিল॥
আমারে যে খাইবা, বাঘরে, তারো নাই সে দায়।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র কি হবে উপায়॥
খাহরে, খাহরে ব্যাঘ্র আমারে ধরিয়া।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র দিও পৌছাইয়া॥'[৩২]

এই ভাবে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘসম্পর্কিত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ব্যাঘ্র-বাহন নানা নামের দেবতারা 'গ্রামঠাকুর' রূপে হয়ে উঠেছেন উত্তর বাংলার এক একজন প্রতাপশালী দেবতা। গ্রামের সকল শুভাশুভ, ক্ষয়ক্ষতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সব কিছুর

দায়দায়িত্বই তাঁদের। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে তাঁদের স্থান মুখ্য। গ্রামের বাইরে কোন জঙ্গলের কাছে, বিশেষত কোন নদী বা পুষ্করিণীর পাড়ে এই ঠাকুরের থান তৈরী করা হয়। ছোট কুঁড়ে ঘর নির্মিত হয় ঐ থানের ওপর—তাতে অবস্থান করেন ব্যাঘ্র-বাহন বা ব্যাঘ্র-বাহনা কোন দেবদেবী। শান্ত ও রুদ্র প্রকৃতি—এই দু-রূপই এই সকল দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত। বিভিন্ন লোক-শ্রুতিকে কেন্দ্র করেই এই সকল দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়, জনজীবনের সঙ্গে এঁদের তাই আত্মিকযোগ অত্যন্ত গভীর।

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে অব্রাহ্মণ অধিবাসীরই সংখ্যাধিক্য। এই অঞ্চলের কোচ, মেচ, পলিয়া, রাভা রাজবংশী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়-সমন্বিত গ্রাম-সমাজ, কুলকেতুরূপী তাঁদের জাগ্রত গ্রামদেবতাদের নিয়ে যুগ পরম্পরাক্রমে, এদেশে বসবাস করছেন। পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-ইসলামী ও খৃষ্টানী প্রভাব ধীরে ধীরে এই সমাজে সংক্রমিত হয়েছে। আর্যগণের বিশ্বগ্রাসী অধ্যাত্মচিন্তাও এই সমাজে তার প্রভাব ফেলেছে ; তাঁদের পূজিত দেবদেবীও আদিম দেব-ভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে একটি সংহত রূপ ধারণ করেছে। রাজনৈতিক পরিবর্তনেও এ দেশের দেব-ভাবনায় নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে। মুসলমান আক্রমণ-কালের প্রাথমিক অত্যাচারের স্রোত প্রশমিত হবার পর অসংখ্য পীর, গাজী, বিবি হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে পূজা পাচ্ছেন ; অন্যদিকে সোনা রায়, বিষহরি, গ্রামঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবী হিন্দুর মতো মুসলমানের কাছ থেকেও পূজা আদায় করেছেন। খৃষ্টান কেরী সাহেবও 'কার সাহেব'-রূপে দিনাজপুর জেলায় পূজিত হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ সহ সমন্বয়ের বাণী প্রচার করছেন, পাশাপাশি থাকার অনিবার্য ফলে। বঙ্গ-বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু-স্রোত এসে উত্তরবঙ্গের ধ্যান ধারণায় নতুন প্রভাব বিস্তার করেছে, বৈচিত্র্যও ঘটিয়েছে যথেষ্ট।

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ থেকে বাঙ্গালী সমাজের আগমনের ফলে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে জটিলতাও বেড়েছে দুর্বোধ্যরূপে : মহাকাল শিব-রূপে পরিবর্তিত হয়েছেন, বিষহরি হয়েছেন মনসা, ভাণ্ডানী হয়েছেন দুর্গা। প্রতিটি গ্রামে গ্রামঠাকুরের পূজার থানে সন্ন্যাসীবেশী ব্যাঘ্র দেবতা বাদেও তিস্তাবুড়ি, শানেশ্বরী, কালী, মহাকাল প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে সত্যপীর, খোয়াজপীর, পাগলাপীর প্রভৃতি আসন করে নিয়েছেন। কোথাও জলের জীব 'কুমীর'

হয়েছেন ব্যাঘ্র দেবতা, আবার কোথাও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ব্যাঘ্রদেবতা 'কানাইয়া' হয়েছেন। পক্ষান্তরে রাভাদের 'কামাখ্যা' হয়েছেন 'ভাংধরী'র বিপরীতে ব্যাঘ্রদেবী। অন্যত্র চাপগড়ের 'রণপাগলী', কুমারগ্রাম-গোয়ালপাড়া সীমান্তে 'সাতশিকারি' হয়েছেন 'বাঘশূর'। উত্তরবঙ্গ-আসাম গোয়ালপাড়া সীমান্ত থেকে চলে এসে উত্তরবঙ্গ-সিকিম-নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি আমবাড়ি-ফালাকাটায় হয়েছেন 'ফালাকাটা রাজা', জল্পেশ মন্দিরের 'বাঘপাল' বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে হয়েছেন 'শালেশ্বরী'। ব্যাঘ্রদেবতা 'মহারাজা ঠাকুর' মালদহে যেমন আছেন, তেমনি আছেন দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে। মেচ সম্প্রদায়ের 'হাগড়ামাডাই' পূজা ব্যাঘ্রপূজারই নামান্তর। মেচগণ বাঘকে বলে 'মস্থয়া' এবং পৌষমাসে কাঠ কাটতে বনে যাওয়ার পূর্বে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বহু আলোচিত সম্প্রদায় টোটো উপজাতি। এরা বাঘকে বলে 'কুয়া' [KUA]। টোটোগণ মহাকালী বাদে নানাবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর পূজা করে থাকেন। কাজেই 'কুয়ার' পূজা করা বা তার প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম এবং মর্যাদার দৃষ্টি দেখানো টোটোদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের অভাব। সে যাই হোক, বাঘ যে উত্তরবঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজা পাচ্ছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের ছড়ায় আছে :

'মাও যশোদা জলৎ যায়, গোপাল যায় সাথে।
আমার সাথে না যান বাবা, হাঁউ আছে পথে॥
সগ্‌গোল জীউ সিজালু মুই, হাঁউ সিজ্যাইল কে।
তোর সাথে যাঁও না মুই, হাঁউ দেখাইয়া দে।'

[মাও=মা ; জলৎ=জল আনতে ; গোপাল=কৃষ্ণ ; না যান=যেও না ; হাঁউ=বাঘ ; সগ্‌গোল=সকল ; জীউ=জীব ; সিজালু=সৃষ্টি করেছি ; সিজ্যাইল=সৃষ্টি করিল ; যাঁও=যাব]

দক্ষিণবঙ্গে 'বর্গী'র কথা বলে শিশুদের ভুলানো হয়ে থাকে ; আর উত্তরবঙ্গে 'হাঁউ' বা বাঘ দিয়ে তাদের ভুলানো হচ্ছে। এটা নিরর্থক নয়, অকারণও নয় ; অরণ্য-সঙ্কুল উত্তরবঙ্গে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ব্যাঘ্র-ভীতিই এর কারণ। উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে এই জন্য ব্যাঘ্র দেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর পূজার

আধিক্য দেখা যায়। সে পূজার কোন কোনটিতে বর্তমানে শাস্ত্রীয়রূপ দেখা দিলেও তার আদিমরূপের প্রচলনই বেশী।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত 'শঙ্খ-পরাণ-পালা' অর্থাৎ দেবী দুর্গার শাঁখা পরানোর উপকথা থেকে জানা যায়, দেবীর শাঁখা পরার ইচ্ছা হলে শিব তাঁকে তা কিনে দেবার অক্ষমতা জানান। পার্বতী রাগ করে পিত্রালয়ে গেছেন। তাঁকে কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় শিব ঠাকুর ভাগ্নে নারদের কাছে তার পরামর্শ চাইছেন। নারদ বল্লেন :

'মামী হলো বাগিনী তুমি হও বাগা।
বড় বনের বাগ সাজ্যা ঘাটায় দেও সে দেখা॥
ঠিক বলিছু নারদ ভাগিনা কাথা মন্দ নয়।
বড় বনের বাঘ সাজ্যা শিব ঘাটায় দাঁড়ায়া রয়॥
বাগ দেখি কার্ত্তিক-গণেশ ডরাইয়া উঠিল্।
আজি হামরা দোনো ভাই বাগের প্যাটে চলিল্॥
ভয় কি তুমাদের আছে বাপোই বাগের কি ভয় আছে।
বাপের বাড়ী যামু আমি বাহন পাইনু কাছে॥
এতেক বলী শিব ঘরণী কাছা মাইরা বাগে চড়িবার যায়।
বোম্ বোম্ বলিয়ে বাগ্ বন ছায়্যা পলায়॥
শিব বলে নারদ ভাগনা বাঁইচ্যা গেইচি ভারি।
তোর মামী চাপে নাই ঘাড়ে হামারি॥'

এই পল্লী কবিতায় দেবী দুর্গার ব্যাঘ্র-বাহনা হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গে মুসলমান ও ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর এবং স্বাধীনতা-উত্তর দেশবিভাগের অনিবার্য পরিণতিতে বাঙ্গালীর সমাজে ও ধর্মে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে মানুষের মূল্যবোধেও গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও আদিম ব্যাঘ্র-দেবদেবীর পূজক 'পণ্ডিত', 'দেউসী', 'মালাকার' ও 'অধিকারী'গণ এখনও অপ্রতিহত মর্যাদার অধিকারী। সর্বগ্রাসী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব তাঁদের স্থান এখনও কেড়ে নিতে পারেনি। তারই ফলে ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত দেবদেবীর সম্বন্ধে নানাবিধ গান ও তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। মেচদের মধ্যে 'দাউবো-খেলা' বা 'বাঘ-খেলা' যেমন বাঘের স্মৃতিবহ, তেমনি 'বাগজান' [**'Bāg=tiger, Jān=a canal. 'A canal in which tigers used to drink water.' : Cencus Hand Book : Jalpaiguri : p. cxci**] নামক

গ্রাম, জটাযুক্ত ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত 'জটেশ্বর' নামক গ্রাম [ফালাকাটা থানা: জলপাইগুড়ি], বাগমারা ও বাগশোয়া [বেড়া থানা: পাবনা জেলা: বাংলা-দেশ], বাঘমারী, বাঘভাণ্ডার, বাঘডোকরা [কোচবিহার জেলা] প্রভৃতি গ্রাম উত্তরবঙ্গে বাঘের প্রতিপত্তিরই পরিচয় দিচ্ছে। ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত যে সকল ছড়া ও গান উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, সে সকল দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের 'রায়মঙ্গল' বা বনবিবির 'জহুরানামা' জাতীয় মঙ্গলকাব্যের মত সুসংবদ্ধ না হলেও, উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের ব্যাঘ্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক এবং উত্তরবঙ্গের সমাজ-জীবনে এই সকল দেবদেবীর উপাখ্যান ও গানগুলির প্রভাব অপরিসীম ও অপ্রমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টিনের ঘর তৈরী করার সময় উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে টিন কেটে কেটে বাঘের মূর্তি তৈরী করে ঘরের 'টুইয়ে' বা 'মটকা'য় ঐ মূর্তিটি লাগিয়ে রাখার প্রথা আজও বর্তমান। এটিও উত্তরবঙ্গবাসীদের ব্যাঘ্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের লাঞ্ছন-চিহ্নও বাঘ। দার্জিলিং সহরের যে স্থান থেকে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয় দেখা যায় তার নাম 'বাঘের পাহাড়' [Tiger Hill]। বাঘ যে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে এটিও তার অন্যতম প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থানার টোটোপাড়া গ্রামের অদূরে ভুটান সীমান্তে তিতারিং ঘাটের সম্মুখে একটি গাছের নীচে অবস্থিত 'ডেমসা'র [দেবস্থান, টোটো উপজাতিরা বলে 'ডেমসা'] কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 'ডেমসা' বা দেবস্থানটি আর কিছুই নয় আসন বা বসবার উপযোগী একখানি পাথর ; সেই পাথরের দুইদিকে দুটি 'কুঙ্গা' [KUNGA] অর্থাৎ বাঘ। এই 'ডেমসা'তে পূজা দিয়ে থাকে টোটো, ভয়া, ঘোলে প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা। উত্তরবঙ্গের সর্বস্তরের লোকেরা যে ব্যাঘ্রদেবতার পূজা দিয়ে থাকে এই 'ডেমসা'টি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের মানুষ যেমন বাঘের পূজা করে তাকে বশীভূত করার চেষ্টা করেছে, তেমনি বাঘকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেও তাদের দ্বিধা হয় নি। ২২০ বৎসর পূর্বে লিপিকৃত 'হরমঙ্গল' পুথি থেকে [বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা—৯৩০] জানা যায় যে, 'কামন্থনগরে' [কামতানগর, কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার আধুনিক গোসানীমারি] বসতিস্থাপন করে শিব ধানচাষের আয়োজন করলেন। এইস্থানের একদিকে পাঞ্চালনগর,

অন্যদিকে কোচের নগর [পাঞ্চালনগর=আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বিরাট রাজার বাড়ি ; কোচের নগর=গোয়ালপাড়া জেলার কোচহাজো]। লাঙ্গল 'পুণ্যা' [পূজা] করে চাষ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল হালের বলদ মাত্র একটি,—শিবের বৃষ। নিরুপায় হয়ে শিবের কৃষাণ হনুমান লাঙ্গলের 'বামভিতে……জুড়িলেক বাগে।' তারপর ঃ

'হনুমান দাণ্ডায় জেন পর্বত ত্রিকুট ;
লাফ-দিআ ধরে গিয়া লাঙ্গলের মুঠ।
বাগত্রষ টাণ্যা চলে হনু ধরে চাপ্যা,
টলটল করে খিতি ত্রাসে গেল কঁ্যাপ্যা॥'

উত্তরবঙ্গের কৃষকের হাতে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাঘের কি দারুণ দুরবস্থা!

এইভাবে উত্তরবঙ্গের জনসমাজে বাঘ নানাভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঘ সম্পৃক্ত অনেক কথা ও কাহিনী উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে যার সাদৃশ্য হয়ত অন্যত্রও চোখে পড়তে পারে, আবার একই লোক-কথা বা উৎসবের রূপ এলাকা ভেদে অন্যরকম। একই জেলার মধ্যেও দেখা যায়—এক একটি মহকুমার যেন সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আছে ; উদাহরণ স্বরূপ 'ভাণ্ডানী পূজা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও ব্যাঘ্রদেব-দেবীর পূজা উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই প্রচলিত আছে, ভাণ্ডানীপূজা চলিত আছে শুধুমাত্র তিস্তা ও তোর্ষা নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। বিভিন্ন অঞ্চলের, থানার, মহকুমার এবং জেলার উপাদানগত বৈচিত্র্যের মিলন ও মিশ্রণে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান গড়ে উঠেছে অভিনবরূপে।

দুই.

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম 'মেচ'। এখন মেচদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অনেক ঘটেছে, উন্নতিও হয়েছে অনেক দিকে। তবুও তাদের আদিম পূজার্চনার রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন আজও হয় নি। মেচ সম্প্রদায়ের অন্যতম পূজা দেবতার নাম 'হাগড়ামাডাই' অর্থাৎ ব্যাঘ্র দেবতার পূজা। পৌষ মাসে বনে কাঠ কাটতে বা খড়ি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পূর্বে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় একমাস ধরে মেচ বালকগণ প্রত্যেক বাড়ী থেকে টাকা-পয়সা বা চাল-ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। পরে নির্দিষ্ট একটি দিনে গ্রামের এক প্রান্তে একটি মাটির বেদী তৈরী করে

সেই বেদীতে 'হাগড়ামাডাই' দেবতার পূজা দেওয়া হয়। পূজার কোন মন্ত্র নেই, পুরোহিতেরও কোন প্রয়োজন হয় না। ভিক্ষাকালে এবং পূজার সময় মেচ বালকগণ নেচে নেচে 'হাগড়ামাডাই' দেবতার গান গেয়ে থাকে। গানে বলা হয়ঃ

'মম্বুয়া নাজা অরনাই ননা ছাইমা হাগরা অরনাই
ননা জাংনন খিনদা হরবলা।
মাসাউ দামরা বেহের জংগোল
দাম্‌রিয়া জলই ফেহের গন্‌।
লউখের গথজং গৌম্‌গম্‌
বেংগম জং-নন্‌ খিনদা হরবলা।'

[আমরা রাখাল বালক। আমাদের যদি ভিক্ষা দাও তবে আমরা দেখবো বাঘ বা শেয়ালে তোমার গরু বাছুরের কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমাদের ভিক্ষা দিলে বাঘ তো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেই না, তোমাদের গরুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে]।[৩৩]

এই পূজায় ফুল, দূর্বা, তুলসীপাতা, চিড়া, পাকা কলা, কাঁচা কলা, গুড়, বাতাসা প্রভৃতি উপচারের প্রয়োজন হয়। পূজায় বলি দেওয়া হয় একটি পায়রা, দুটি [একটি বড়, অন্যটি ছোট] মুরগী। বলি দেওয়া হয় ঘাড় মুচড়ে ছিঁড়ে। দেবতার উদ্দেশে রক্ত নিবেদন করে ভোগের অন্ন-মাংস প্রভৃতির কিছুটা অংশ বাঘ ও তার সঙ্গী শেয়ালের উদ্দেশে বনের প্রান্তে রেখে এসে বাকীটা নিজেরা প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করে। পায়রা ও মুরগীর ঘাড় ছিঁড়ে বলি দেওয়া নিঃসন্দেহে আদিম সংস্কৃতির নিদর্শন।

এখনও উত্তরবঙ্গের হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চল বনে-জঙ্গলে সমাকীর্ণ; পূর্বে তো আরও গভীর বন ছিল। এই সকল বনে কাঠুরেরা যখন কাঠ কাটার জন্য প্রবেশ করে তখন বনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসিগণ তাদের ভয় দেখায়: জঙ্গলে বাঘ এসেছে, ঢুকোনা; ঢুকলেই খেয়ে ফেলবে। তারা গান গেয়ে নিষেধ করে:

'সাগাই, না যাইওরে জঙ্গলত্‌ বাঘ আইস্যাছে।
জনায় জনায় পাকসাট মারি ধরি নিবার লাগিছে॥
এই জঙ্গলত্‌ ডুরিয়া বাঘে লিকি ঝিকি বায়;
ছোয়া-পোয়া থুইয়া বাঘায় জোয়ান ধরি খায়।

এই জঙ্গলায় ডুরিয়া বাঘর কালা কালা ডোরা,
ছাগল ভেরায় না খায় বাগা খায় হাতী ঘোড়া।
কত যে মারিছু গরু কত মারিছু গাই,
মইষ যে মারিছু কত তার লেখা জুকা নাই।
যে হউক সে হউক বনত যাইবু মুই,
যাবার আগত্ শালেশ্বরীর পূজা দিয়া যাই।'

গ্রামবাসীদের নিষেধ শুনে কাঠুরেরা বনে প্রবেশ করার পূর্বে বনদেবতার আরাধনা করা স্থির করে। দেবতার নাম শালেশ্বরী—অর্থাৎ শাল গাছের অধীশ্বর। নামের শেষে 'ঈ' যোগ থাকলেও ইনি পুরুষ দেবতা—ব্যাঘ্রবাহন। ইনি মেচ ও রাজবংশী উভয় সম্প্রদায়েরই দেবতা। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের উপান্তে রংধামালী, শালুগাড়া প্রভৃতি স্থানে এঁর পূজা হয়। পূজা না দিয়ে কাঠুরেরা বনে ঢোকে না। পূজার ব্যবস্থা প্রায় 'হাগড়ামাডাই'-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম শুধু এইটুকুতে, এই পূজার মুরগীর গলায় জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শালেশ্বরীর উদ্দেশে উড়িয়ে দেওয়া হয়; বলি দেওয়া হয় না।

বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের আর এক ব্যাঘ্রবাহন দেবতার নাম কালাকাটা রাজা।' এই অঞ্চলের কিংবদন্তীতে বলে থাকে পালবংশীয় নরপতি রামপাল ও তাঁর ভাই শূরপাল যখন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে এই বনে আশ্রয় নেন, তখন একদিন একটি বাঘ এসে তাঁর শাদা ঘোড়াটি খেয়ে ফেলে। তখন তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে বাঘকে প্রসন্ন করবার জন্য বাঘের পূজা আরম্ভ করলেন। শূরপালও দেখাদেখি বাঘের পূজা সুরু করলেন। রামপাল যখন কৈবর্তদের হাত থেকে রাজ্য উদ্ধার করেন, তখন নাকি হাজার হাজার বাঘ তাঁর সহায় হয়েছিল। সেই থেকে এদেশে বাঘের পূজা প্রচলিত হয়েছে। এখনও পূজার সময় বাঘের মূর্তির সঙ্গে সন্ন্যাসীর পিছনে এক ফৌজদার বা সিপাহী দেওয়া হয়। অর্থাৎ রামপালের পিছনে শূরপাল। আর একটি কিংবদন্তীতে বলে: ধনাকাটা ও মনাকাটা দুইজন সওদাগর বেশী দস্যু। ধনা থাকত কালাকাটাতে, মনা থাকতো গৌরীকোনগড়ে। বাঘের পূজা দেখে তারাও বাঘের পূজা আরম্ভ করলো। কালাকাটায় বাঘপূজা বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে এবং গৌরীকোনগড়ে বাঘপূজা শারদীয়া লক্ষ্মীপূজার কাছাকাছি কোন এক হাটবারে। যাতে লোকসমাগম হয়। আশ্চর্যের বিষয় ধনা ও মনা নামক

দস্যুর কিংবদন্তী মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার পাঁচ মাইল দূরবর্তী 'রাইখল দীঘি' অঞ্চলেও প্রচলিত আছে [**J. A. S. B. (1932) vol. XXVIII : pp. 175-6**]

ব্যাঘ্রদেবতার পূজা করেন রাজবংশী দেউসীগণ, অনেকে বলেন 'দেউরী' [পূজারী]। পূজার সময় দেউসীরা রং-করা সূতা বাঘকে নিবেদন করতো, ব্যবসায়ীরা অর্থমূল্যে ঐ রং-করা সূতা দেউসীদের কাছ থেকে কিনে নিত এবং ঐ সূতা দিয়ে যতটা জায়গা ঘিরে নিতে পারত সেইটুকুই ছিল তার এলাকা বা চৌহদ্দী। ঐ এলাকার মধ্যে ঐ বিশেষ ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেউ কাঠ কাটতে পারতো না। সূতা দিয়ে গাছ ঘেরবার মন্ত্র :

'হলুদ দিয়া ছুবালু সূতা, ঘেরা দিছু গাছে।
বরিস্ ঘুরিয়া আসিস ঠাকুর, স্যাবা দিমো তোকে॥
পিঠা দিমো, মিঠা দিমো, দিমো দুধের ক্ষীর।
অচল হয়্যা থাকিস ঠাকুর মোর ঘরেতে থির॥'

বনের চৌহদ্দী ঠিক করে নিয়ে কাঠের ব্যবসায়ী আবার ধূমধাম করে ব্যাঘ্র দেবতার পূজা দেয়। পূজায় নিবেদন করা হয় চাল, কলা, মেটে আলু, খাসী, পারো [কবুতর], হাঁস, মুরগী প্রভৃতি। ব্যাঘ্রদেবতা ফালাকাটা রাজার কাছে পাঠা বলির মন্ত্র :

'বাঘে ভালুকে নদীয়া লাল।
ঝাড়ে জঙ্গলে ইলুয়াই কাশি
চাইলে যায় সে বলি ঘাসও খায়, ঘাসও না খায়।
সে বলি দিমু তোমার দয়ার।'

[লালা=নদী=নালা, ইলুয়া কাশি=উলুখড়]

পায়রা বলির মন্ত্র :

'হাঁবার বলি সোনার ধার,
কবুতরের বলি তোমার দুয়ার।
এই বলি হাত কর,
ফলনার উপরে ছত্রধর।'

[ফলনা=যে পূজা দিচ্ছে তার নাম বলতে হবে।]

ব্যাঘ্রদেবতা ফালাকাটা রাজার পূজার ধ্যানমন্ত্র : 'ও হিন্দ গোবিন্দ, লীল বরণচক্র, সূর্যব্রণ [বর্ণ] চক্র, দেবচক্র আসন কর। খাট বাট সিঙ্গাসন, তার

উপর ফালকাটা মহারাজা আসন কর। ফলনার উপর ছত্র ধর।' এই উপলক্ষে তাঁকে যে পাঁচালী শোনানো হয়ঃ

'ভক্তি দিনু ফালাকাটা মহারাজ।
থাকেন বিষ্ণুগৃহ [বৈকুণ্ঠপুর] জঙ্গলত।
সারা বছর প্রভু থাকেন
থানত ভাবনীর জঙ্গলত॥
পচ্চিমে হইল করতোয়া
উত্তর হতে পূবত বহে তিস্তাবুড়ির ধার।
এই চৌহদ্দীর মাঝত বসত প্রভুর,
আন্ধারত প্রভু করেন আনাগোনা
ছ্যাছেন চম্‌কা হানা মাঝত মাঝত।
প্রভু না জানেন জাতিভেদ বিচার
মানষি গরু ছাগল ভেড়া খায়
প্রভুর নিকট তামাম সমান।
বাপ দোহাই দিনু তোক
গাবুর বয়সে দেখা না পাই তোক।'

[ভাবনা=কুশগাছ, গাবুর=যৌবন কাল]

বনের সঙ্গে কাঠুরিয়াদের সম্পর্ক। কাঠুরেরা বনে রওনা হবার সময় তাদের সঙ্গে অতি অবশ্যই একজন ওঝা থাকে। বৃদ্ধেরা প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়, বৌ-ঝিরা বাড়ীঘর লেপাপোঁছা করে। বাড়ীর বয়োবৃদ্ধা রমণী কাঠুরেদের সঙ্গে দেবার জন্য চাল, মুড়ি, চিঁড়ে প্রভৃতি ভাজে। নববিবাহিতা বধূরা বাঁ হাতের খাড়ুটা খুলে বালিশের তলায় রাখে, যতদিন স্বামী জঙ্গল থেকে ফিরে না আসে ততদিন পরে না। সন্তানবতীরা নিজেদের 'ফোতার' [রাজবংশী রমণীদের পরিধেয়] কোনা কেটে গাছের ফোকরে রাখে, আশায় থাকে স্বামী ফিরে এসে নতুন 'ফোতা' কিনে দেবে। যে কয়জন কাঠুরে বনে যাবে তারা যাত্রার পূর্বে প্রত্যেক ফালাকাটা ঠাকুরের কাছে একটা লাল নিশান ঝুলিয়ে পাশে একটা থলি রেখে আসে। গ্রামবৃদ্ধ দিন গোনার জন্য প্রতিদিন ঐ সব থলিতে একটা করে ছোট পাথর রেখে আসে। অনেক সময় পাথরের ভারে ঝোলা ছিঁড়ে যেতো, তখন কাঠুরেদের অমঙ্গল হয়েছে মনে করা হতো। মোড়ল ওদের খোঁজ-খবর নিত। যাত্রার পূর্বে মোড়লের নির্দেশে বনযাত্রী

কাঠুরেরা 'বনচোর'কে [কুঠার] করতোয়ায় স্নান করিয়ে এনে কালাকাটা ঠাকুরের সামনে কাঁচাদুধের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, মাটিতে কখনো রাখে না। ফুল-দূর্বা চাল-কলা প্রভৃতি দিয়ে কুঠারের পূজা দেয়।

যাত্রার সময় গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল কাঠুরেদের ডেকে বলতো : 'কিছু খেয়ে নে।' কারণ : 'সকালত মুঠি। / তামাম দিনের খুঁটি'। আর উপদেশ দিত :

'যাই শুনিবেন পাতার খচখচানি,
তই চড়িয়া বসিবেন গাছের ডালত।
যাই পাবেক জঙ্গলত জঙ্গলত বেল
তাই খাবেক খালি পেটত না থাকে তেল॥

আরও পরামর্শ দিত : "যেখানে সেখানে জল খাস না, 'নেউসী'র জল খাস [নেউসী=পান্থপাদপ]। প্রথমে মাথা কাটিস ; পরে গোড়া কেটে কুশারের মত ধরিস, তবেই জল পাবি।"

কাঠুরেরা ওঝাকে সঙ্গে করে বনে যাত্রা করত। পথে হিংস্র বাঘ প্রভৃতি জন্তুর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মন্ত্র শিখে নিত সবাই :

'আহান্তি অহমুণ্ড অপ্ অপ্ থপ্ থপর থপর করে পা[১]।
এ সীমা ছাড়ি তু[২] অন্য সীমায় যা।
গনডাগমল[৩] দূরে পালা, উড়্ শিকল বেড়া[৪]॥'

[১. বাঘ যে ভাবে মাথা নেড়ে, পায়ে পায়ে পথিকের দিকে এগিয়ে আসে এখানে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ২. তু=তুমি ; ৩. গনডাগমল=গণ্ডার বা গণ্ডার-জাতীয় প্রাণী। ৪. উড়্ শিকল বেড়া=মন্ত্ররূপ শিকলে তোকে বাঁধলেম, তুই উড়ে যা।]।

বনে গিয়ে কাঠুরেরা কুঠারের উল্টো দিক দিয়ে গাছে আঘাত করে শব্দ শুনেই বুঝে ফেলতো কোন্ গাছ কাটতে হবে। অনেক সময় শালগাছে কোপ দিতেই ঝর্ ঝর্ করে রক্তের মত রস পড়ত। সে গাছ আর কাটা হত না। তখনকার দিনে কাঠুরেরা জানত না যে শালগাছের ফোকরে বৃষ্টির জল জমে জমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্তের মত এক প্রকার রস তৈরী হয়। সেই রসকে সেকালে কাঠুরেরা গাছের রক্ত মনে করতো। সে গাছ আর কাটত না, অপদেবতার ভয়ে। বনের ভেতর বাস করার সময় কাঠুরেদের অন্য বিপদেও পড়তে হত, কারণ প্রায়ই ঝড় উঠ্ত ; রাজবংশী ও মেচরা বলে 'বাও'। ঝড় উঠ্বার সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরেরা দোহাই তাঁর দিত, যার সঙ্গে তাদের নাড়ির

যোগ, সেই তিস্তাবুড়ির : 'আসিবার দে তুফান জল। / সবাই মিলি আগত চল। / যাহা করিবেন তিস্তাবুড়ি।'

অবশেষে দুঃখের দিন শেষ হয়ে এলো ; এলো তাদের বাড়ী ফেরবার দিন। মনের আনন্দে তারা ভুলে গেল 'ফালাকাটা ঠাকুরে'র কথা—তাঁর পূজার জন্য দ্রব্য সমগ্র সংগ্রহের কথা তাদের মনেই এলো না। তার ফলও তারা পেল হাতে হাতে। কাঠুরের দল যেই বনের শেষ সীমানায় এসেছে, ঠিক তখনই :

'অরণের কিনারে যায়য়া ঠাকুর মারে হাঁক।
এক ডাকে আসিয়া পড়লো বিশাশয় বাঘ॥
বাঘ দেখি কাঠুরে দলের বুদ্ধি উপজিল।
বাপ্ বাপ্ করিয়া ঠাকুরের পায়েতে পড়িল॥
আজি কেনে ঠাকুর মোদেক্ এতেক তাপ দাও।
ভুলভাল ক্ষমা করো মোরা তোমার ছাও॥
মোড়ল কহিল্ ঠাকুর মুই তোমার কিঙ্কর।
নেনিয়া ধানের চাল বেচিয়া সেবা করিম তোর॥
সেই দিনত ফালাকাটা রাজা দিয়া গেল দেখা।
নরলোকে পূজা পরচার পাইয়া পরীখ্খা॥'

এইভাবে ব্যাঘ্রদেবতার পূজা প্রচারের বহু লৌকিক কাহিনী উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র দেবতার নাম স্থানভেদে ভিন্ন, পূজা-পদ্ধতিও পৃথক ; কিন্তু উদ্দেশ্য এক—বাঘের কবল থেকে গো-সম্পদ ও আপনার রক্ষা।

আমবাড়ি-ফালাকাটায় করতোয়া নদীর তীরে পিথলী বুড়ির জোত ; রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। সেই জোতের এক প্রান্তে নদীর তীরে ছোট্ট একখানা টিনের চৌচালা ঘর ; লোকে বলে 'ফালাকাটা ঠাকুরের মন্দির'। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন ব্যাঘ্র দেবতা 'ফালাকাটা রাজা'। দ্বিভুজ দেবতার মুখের রং সাদা ; কিন্তু গায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের, যথা, হাত, বুক, পা, সাদার সঙ্গে হলুদ রংএ চিত্রিত। জানা যায় পাচের দশকেও দেবতার গায়ের রং ছিল, ঠিক লাল নয়, অনেকটা খুনখারাপী রং-এর। দেবতার বাঁ দিকে একটি দেবী মূর্তি, স্থানীয় লোকে বলে তিস্তাবুড়ি ; তারপরে সন্ন্যাসী, —হাতে গাঁজার কলকে। ডান দিকে প্রকাণ্ড এক বাঘ, বাঘের নীচে একটি মাটির সরা; যেন মনে হয় খাদ্য দেবার জন্য। আর আছে দুটি সিপাই এবং ঘরের বাইরে কাঠের তৈরী একটি ঠাকুরাণী। কেউ বলে দেবী চৌধুরাণী।

একটি উল্লেখনীয় বিষয় প্রতিমা নির্মাণ-পদ্ধতি। মাটি দিয়েই 'ফালাকাটা ঠাকুরের' প্রতিমা তৈরী হয় সত্য। কিন্তু মাটি কাটার লোহার অস্ত্রটি করতোয়াতে স্নান করিয়ে, তার পূজা দিয়ে, তবেই তা মাটিতে ছোঁয়ানো হয়। প্রতিমা রং করার তুলিও বিচিত্র—কোনটি 'ভাল্কী' [ভাল্লুকের লোমে তৈরী], কোনটি 'পাটোয়া' [পাটের আঁশ দিয়ে তৈরী]। আর প্রতিমার চোখ আঁকা হয় সজারুর কাঁটা দিয়ে। কেন এই অভিনব প্রথা তার হদিশ কেউ দিতে পারেন নি।

আরও কিছু দূরে [প্রায় দু-মাইল] নেউসী বস্তিতে এবং সিভোকের কাছে নানটং বস্তীতে পূজা হয় অনুরূপ দেবতার ; তাঁদের নামও 'ফালকাটা ঠাকুর'। পূজা করে স্থানীয় মোহান্ত বা রাজবংশী দেউসাগণ। কাছেই আছে কুন্দনদীঘি নামে এক মজাদীঘি। এই দীঘিতে স্নান করে পাঁচ দিন ধরে পূজা দিতে হয় দেবতার—তিনদিন বলি সহ এবং দুইদিন বৈষ্ণব মতে। পূজায় বলি দেওয়া হয় পাঠা, খাসি, কবুতর, হাঁস, মুরগী এবং শশা, আখ, কুমড়া প্রভৃতি। পাঁঠা এক কোপে বলি দেওয়া হয়, কিন্তু খাসি বলি দেওয়া হয় পাথর দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে ; আর হাঁস, মুরগী, কবুতর বলি দেওয়া হয় ওদের ঘাড় মুচড়ে। বলির রক্ত সরায় করে ধরে রাখা হয় এবং পরে দূরে বনের ভেতর গাছের তলায় রেখে আসা হয়, যাতে বুড়া বাঘ এসে খায়।

একটি কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক কালে একজন দেউসী দেবতার পূজার বাসন-পত্র ও গহনা চুরি করে পালাচ্ছিল, সেই সময় এক বাঘ তাকে তাড়া করে। বাঘের তাড়া খেয়ে সে দৌড়ে গিয়ে পড়ে এক গাছের নীচে ; গাছের চাপে সে মারা যায়। সেইজন্য রাজবংশী স্ত্রীলোকেরা আগে ঐ গাছের পূজা করে। আর এক কিংবদন্তীতে বলে যে ঐ মাটির সিপাহী জীবন্ত হয়ে পূজারী-চোরকে হত্যা করে। গল্প যাই হোক। পূজা-পদ্ধতিতে একটা বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে 'ফালাকাটা ঠাকুর' আদিম মানুষদের দেবতা, যখন মানুষ পাথরের আঘাতে পশু হত্যা করত, অথবা ফাঁস দিয়ে বা ঘাড় মুচড়ে হাঁস, মুরগী, পাঁঠা, ছাগল প্রভৃতি হত্যা করতো, শুধুমাত্র নিজেদের জীবন ধারণের জন্য। সেই আদিম সংস্কার রয়ে গেছে আজও 'ফালাকাটা রাজা'র পূজা পদ্ধতিতে। অবশ্য রাজবংশীদের অনেক পূজাতেই অনুরূপ ভাবে পাথর দিয়ে পিটিয়ে বা ঘাড় মুচড়ে বলি দেবার দৃষ্টান্ত আছে।

সিভোকের কাছে নানটং বস্তী ১৯৬৮ সালের বন্যায় তিস্তা নদীর গর্ভে

চলে গিয়েছে। কিন্তু গিধনী বুড়ীর জোতে পূজা আছে এখনও; আছে নেউসী বস্তির পূজাও। হাজা মজা কুন্দনদীঘির পাড়ে ছড়ানো-ছিটানো ছোট ছোট ইট আজও এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচয় দেয়।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত রয়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ জল্পেশ মহাপীঠ। এই মন্দির থেকে মল্লিকের হাটের দিকে যেতে প্রায় দুই ফারলং দূরে রাস্তার ধারে দু-পাশে দু-খানি টিনের ঘর—কোন বেড়াই নেই কোন ঘরের। সেই ঘরের মধ্যে ছোটবড় অনেকগুলি পাথর, তাঁদের উপরে ফুল-বেলপাতা এবং চন্দনের ছিটা। আতপ চালের নৈবেদ্যের চিহ্নও দেখা যায় এদিকে ওদিকে ছেটানো। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তাঁর 'জল্পেশ মহাপীঠ' গ্রন্থে [পৃঃ ৩২] লিখেছেন: 'জল্পেশ মন্দিরের নিকট সিদ্ধপুরুষগণের ১৩।১৪ খণ্ড শিলা দৃষ্ট হয়। যথা, বাঘপাল, মানেশ্বর, তানেশ্বর প্রভৃতি'। স্থানীয় রাজবংশীদের মতে এই 'বাঘপাল নাকি জল্পেশ মন্দিরের দ্বারপাল ছিলেন, একে পূজা না দিয়ে জল্পেশ মন্দিরে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এই পাথরের টুকরোগুলি যাঁরা পূজা করেন তাঁদের বলে দেউড়ি, জাতিতে রাজবংশী। পুরুষানুক্রমে এঁরা এই পাথরের দেবতাগুলির পূজা করে আসছেন। সেই সঙ্গে করেছেন জল্পেশ মন্দিরের সেবা। এ দেউড়িদের অন্যতম শ্রীকালী-মোহন রায় বল্লেন: "অতিপূর্বে এখানে ছিল বিরাট জঙ্গল, তার মধ্যে ছিল বাঘের পাল। বাঘের উৎপাতে লোকের 'ত্রাহি, ত্রাহি' রব উঠল। বাঘের হাত থেকে বাঁচা এবং বাঘ তাড়ানর জন্য এখানে বাঘের পূজা চালু হয়। পূজা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ এসে পাশে বসত এবং পূজা যতক্ষণ না শেষ হত, বাঘ বসে অপেক্ষা করত—পূজা শেষ হতেই বাঘ চলে যেত।" দেবতার নাম বাঘপাল, এখন অনেকে বলেন ধলেশ্বর। বাঘের পায়ের রং নাকি সাদা ছিল তাই ধলেশ্বর। —পূজারী দেউড়িদের বংশধারায় প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী এই অঞ্চলে 'বাঘপাল'রূপী ব্যাঘ্রদেবতার পূজার অন্যতম প্রমাণ। বংশানুক্রমে প্রচলিত এই জনশ্রুতিতে অত্যুক্তি আছে, উৎপ্রেক্ষা আছে—সেই সঙ্গে সত্যতাও আছে। কারণ, 'নাহ মূলাঃ জনশ্রুতি'। পূজার মন্ত্রে বিশেষ কোন বাঁধাবাধি নেই। নিরক্ষর রাজবংশী দেউড়ি নিজের ভাষায় দেবতার পূজা করেন। যথা:

আসন: 'ধরতি' আসর ধরতি বসন
এই ধরতিতে বসে থাকো যত দেবগণ'

তারপর ঃ 'ফুল পুষ্প বিল্বপত্রায় নম ;
দূর্ব্বায়ৈ নম ;
চন্দনায় নম ;
নৈবেদ্যায় নমঃ'

অর্থাৎ ব্যাঘ্র দেবতার আদিমন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে আর্যীকরণ স্থরু হয়েছে। সেইজন্য সংস্কৃতানুযায়ী মন্ত্র দেখা দিয়েছে। পূজা শেষ হলে আসে ভোগের কথা। আজও জল্পেশ মন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত 'বাঘপালে'র নামে ভোগ দিয়ে থাকেন। পরিশেষে, শান্তি :

"তনধন মনে পূজি আঙ্গা[2] চরণ।
চালকলা পরসাদ করি নিবেদন ॥
জটাধারী 'বাঘপাল' পূজা পানি খাও।
অধম ভক্তটাক্ আশীর্বাদ দিয়া যাও ॥"

[১. ধরতি=মাটি, পৃথিবী ; ২. আঙ্গা=রাঙা]

আর একজন দেউডি সগেন্দ্রমোহন রায় বল্লেন, উত্তরের টিনের ঘরে আছেন নানান দেবদেবী ; যথা ঃ সোদরখৈ, জটেশ্বরী, ঘোড়রচারী, শুকরমারী, খৈয়ারথান, পওনাবুড়ি, বটেশ্বরী, পেটকাটি, ভাণ্ডানী, ময়নামতী প্রভৃতি অর্থাৎ এই অঞ্চলের যত গ্রামীণ দেবদেবী। এ থেকেই এই অঞ্চলের গ্রাম-সমাজের ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গ্রাম-দেবতা ভেতরের এবং বাইরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাঘ্র-দেবতা 'বাঘপাল' হয়েছেন। হয়েছেন জল্পেশ মহাপীঠের প্রহরী। নিকটবর্তী গ্রাম মাধবডাঙ্গায় আছে 'বটেশ্বর' মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। এই গ্রামের বাসিন্দা একশ দশ বৎসর বয়স্ক বাবুরাম সরকার ছড়ায় বল্লেন 'বাঘপালের' কাহিনী। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি ; মাঝে মাঝে তাঁর বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি যা বল্লেন তার লিখিতরূপ এইরকম :

"দক্ষিণদুয়ারী ঘর ঘন বাঁশের রুয়া।
'বাঘপালের' ভোগে লাগে পান আর গুয়া ॥[1]
বাটা ভরি কাটাগুয়া পাঁচ বাঘে খায়।
হগ্ গ্ল[2] বাঘে বৈঠক করে অরণেতে যায় ॥
ধলাবাঘ কালাবাঘ বনেতে সোঁদায়[3]।
অরণের পাখপাখালি দেখিয়া পালায় ॥

পালাশ না পালাশ না তোরা, নাই ভয় ডর।
জল্পেশ শিবের পূজা দিস্ পহর অন্তর॥
পরথমে চলিল্ ধনাবাঘ ফুলের লাগিয়া।
আনিল্ করবী ফুল খাঁচা[৪] ভরিয়া॥
ফুল দেখিয়া কালা বলে ধলেশ্বর ভাই।
এ ফুলে না হবে পূজা মুই আনবার যাই॥
তারপর চলিল্ মাল্যানে ফুলের লাগিয়া।
আনিল জবা পুষ্প খাঁচাতে ভরিয়া॥
ভীমপাল বাঘ বলে একি হইল দায়।
কোন্ ফুলে দিমু পূজা ঠাকুরে না মিলায়॥
অরণের কিনারত্ যায়্যা ঠাকুর মায়ে হাঁক।
এক্‌কি ডাকে চলি আসলু বিশাল এক বাঘ॥
যত মোগলের ঘাটিত লাগাইল্ পায়।
শিব ঠাকুরের নাম লইয়া ঘাঁটাত্[৫] ধরি যায়॥
ঘাটা ধরি যাইতে যাইতে পাইল ধুতুরার ফুল।
মনে মনে 'বাঘপাল' ঠাকুর হইল আকুল॥
ধুতুরার ফুল তো নয় আসল জিনিষ পাই।
এ মুলুকের মানুষগরুর বাড়ুক পরমাই॥
আনিল দুর্ব্বাচন্নন ডোঙ্গাত্[৬] করিয়া।
চার দিকে চার তিরশূল লাইল্ গাড়িয়া॥
ধাকাতে ধাকাতে আনলো দেউড়ি পঞ্চনে।
'শিব, শিব' বলি বাঘ ডাকে ঘনে ঘন॥"

[১ গুয়া=সুপারী; ২ হগ্‌গল=সকল, ৩ সোঁদায়=ঢোকে; ৪ খাঁচা=সাজি; ৫ ঘাঁটাত্=রাস্তায়, পথে; ৬ ডোঙ্গাত্=কলার খোলা দিয়ে তৈরী পাত্র]।[৩৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জল্পেশ মন্দিরের অসমীয়া ব্রাহ্মণ পূজারী বলেন যে ঐ সকল শিলামূর্তিগুলির মধ্যে ধর্মপাল, জয়পাল, কামপাল, ভীমপাল প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণও পূজিত হন। সিদ্ধপুরুষ কি না বলা যায় না, তবে এই সকল 'পাল' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ কি বিখ্যাত পাল নরপতিগণের স্মৃতি বহন করছে? সে প্রশ্নও মনে জাগে। 'বাঘপাল' কি এই রাজবংশের কেউ ছিলেন?

জানা নেই। তবে জল্পেশ মন্দিরের সঙ্গে যে ভাবে ভীমপাল, ভীমেশ্বর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জল্পেশ কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে এবং কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ কর্তৃক পুনর্নির্মাণ কার্য শুরু হওয়ার আগে অন্তত দুবার মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল[৩৫] বলে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে কৈবর্তরাজা-ভীম কর্তৃক মন্দিরটি পুনঃসংস্কৃত হওয়া অসম্ভব নয় বলেই মনে করি। বলাবাহুল্য, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' কৈবর্ত নরপতি ভীম শৈবরূপেই আখ্যাত হয়েছেন।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে এখানকার কিংবদন্তীর মিল আছে। জল্পেশ অঞ্চল, মন্দির কমিটির প্রচেষ্টায় এখন সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হলেও, এক সময়ে যে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিবেষ্টিত ছিল, বিশেষ করে তিন-চারশ বছর আগে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বাঘপাল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি চমৎকার কিংবদন্তী এখানে শোনা যায়। শাপগ্রস্ত ব্যাঘ্রপাদ নামক এক যোগী ব্যাঘ্র-কলেবর ধারণ করে জল্পেশ মন্দিরের সম্মুখে তপস্যা করেন এবং তপস্যা করে তিনি শাপমুক্ত হন। এর পরে শিবের আদেশে তিনি জল্পেশ মন্দিরের দ্বার রক্ষা করতে থাকেন। এই কিংবদন্তীটি চিরাচরিত ধারায় রচিত হয়েছে; অন্যত্রও এরূপ কিংবদন্তী আছে। শিব মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্যই একজন যোগী বা ঋষির উপাখ্যান গ্রাম বা মন্দিরের সঙ্গে জড়ানো হয়; যাতে ঐ স্থান বা মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে। দেবতার নাম যখন 'বাঘপাল' তখন যোগী বা ঋষির নাম ব্যাঘ্রপাদ বা ঐ জাতীয় ব্যাঘ্র সংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যই 'বাঘপালে'র সঙ্গে ব্যাঘ্রপাদ ঋষির সংশ্রব ঘটানো হয়েছে। জল্পেশ শিবের মাহাত্ম্যবৃদ্ধির জন্যই এটা করা হয়েছে, এবং করা হয়েছে **বাস্তব প্রয়োজনে।** কারণ যিনি বনের বাঘকেও তার হিংস্রতা ভুলিয়ে বশীভূত করতে পারেন, শাপগ্রস্ত ঋষিকে যিনি শাপমুক্ত করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই সামান্য দেবতা নন। ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন অনেক দেবতার দেখা মেলে উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে। ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন এই সকল দেবতাদেরই একজন বাঘপাল, যিনি জল্পেশ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তারে অসমর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত জল্পেশ শিবের দ্বারপাল সেজে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছেন বলেই মনে হয়।

ব্যাঘ্রদেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতার নাম যে 'কুমীরদেব' হতে পারে তা কি কোনদিন জানতাম! কোচবিহার জেলার খোলটা গ্রামে কিন্তু তাই দেখা যায়।

'কুমীরদেব' চতুর্ভুজ দেবতা। গায়ের রং বেগুনী [খুন-খারাবী ?], পুরুষ দেবতা। বৈশাখ মাসে যে কোনদিন পূজা হয় [বর্তমানে আর্থিক অনটনের জন্য সকল বৎসর মূর্তি তৈরী সম্ভব হয় না,— মাটির ঢিবিতে (থানে) পূজা হয়]। খোলটা গ্রামে কুমীরদেবের তিনটি 'থান' আছে। পূজার সময় দুটি 'থানের' উপর বড় একটি কুমীরের মূর্তি মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। অন্যটিতে ব্যাঘ্রবাহনমূর্তি পূজা হয়। মূর্তির ডান উপর-হাতে অসি, ডান নীচু-হাতে তীর, বাঁ উপর-হাতে ঢাল এবং বাঁ নীচু-হাতে ধনু, পরনে বাঘছাল, কুমীরদেব বাঘের উপর, দুই পা দিয়ে দক্ষিণ মুখে বসে। পূর্বে রাজবংশী দেউসীরা পূজা করতো ; এখন করে অসমীয়া ব্রাহ্মণ। রাজবংশীদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কুমীরদেবের পূজা দেওয়া বিধেয়। পূজার উপকরণ—ফুল, বেলপাতা, চন্দন, দূর্বা, নৈবেদ্য—বাতাসা, মুড়ি, চিড়া, দৈ প্রভৃতি। আবার ডিম, পায়রা, পাঁঠা, প্রভৃতিও বলি দেওয়া হয়, মানৎ অনুযায়ী। আগে নাকি মহিষও বলি হতো। কুমীরদেবের সম্বন্ধে লৌকিক ছড়ায় জানা যায় ঃ

'বনের দখিনে বাস কুমিরদেব নাম।
কতা তার বলি শুন খোলতায় ধাম ॥···
কালজানি নদীনাম সাগর সমান।
পাড়েত বসিয়া ঠাকুর ভাবে মনে মন ॥
হবিনাম মহামন্ত্র কুম্ভীরের কানে দিয়া।
নদী পার হইল তার পিঠত্ চড়িয়া ॥
বাঘ সব তাই দেখি ইতি উতি চায়।
জোড় হস্তে পরনাম করে কুম্ভীরের পায়' ॥[৩৬]

একটি পল্লী কবিতায় জানা যায় ঃ

'কালজানি আন্দার কিল কিল রাতি,
নাময়ে স্বর কুমির দেও নিশিভাগ রাতি।
চাইর কোন প্রিথিমি ধেইছে জানিয়া।
সত্তম চরাই ফল্যার বুকে ভর দিয়া'।[৩৭]

বর্তমানে 'কুমীরদেব' ব্যাঘ্রবাহন দেবতা হলেও আদিতে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। কুমীর অর্থে জলজন্তু ; আবার আর এক অর্থ কুম্ভক সমাধি। কুম্ভক সমাধি প্রাপ্ত কোন সাধুই কি কুমীরদেব ? অসম্ভব নয়। হয়ত নরনারায়ণের

রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক কোন সন্ন্যাসীর কুম্ভক সমাধি প্রভৃতি অলৌকিক ধ্যান-ধারণার ফলে তাঁর প্রতি মানুষের অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মে। কালক্রমে ভক্তদের সেই ধারণা ও বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করেছে এবং ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে ধ্যানে নিরত থাকতেন, এইজন্য আদিম সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি ব্যাঘ্রবাহন দেবতায় পরিণত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত কবি রাধাকান্তের 'গোসানীমঙ্গলে' আছে কামতাপুরের [আধুনিক গোসানী মারি] রাজা কান্তেশ্বর দেখলেন :

'ভয়ঙ্কর রূপ হয় কুম্ভির মহাবল।
মগর সমান সেই বনেতে প্রবল॥'

হরিদেবের 'শীতলামঙ্গলে' আছে : 'ব্রাহ্মণের বাক্য এই না জাঅ খণ্ডন। / ব্রহ্মশাপে ইন্দ্রপুত্র কুম্ভীর জনম' ॥[৩৮] এখানে ইন্দ্রপুত্র অর্থে অর্জুনকে বোঝানো হয়েছে। 'ভাগবতে' আছে, দেবলমুনির অভিশাপে গন্ধর্ব হুহু কুমীররূপ ধারণ করেন।[৩৯] এই সকল অতীত কাহিনীর প্রভাব ব্যাঘ্রদেবতা 'কুমীরদেবে'র দেবত্বের সহায়ক হয়েছে এ কথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। ডোন্যাল্ড এ. ম্যাকেঞ্জি তাঁর *Indian Myth and Legend* গ্রন্থে লিখেছেন : **'A people may change their weapons and their languages time and again, and again retain their ancient modes and thoughts'**। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে—যে সকল স্থানে আদিম সংস্কৃতিরই প্রাধান্য ছিল, সেখানে এ রকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

কোচবিহার জেলার মাঘপালা, গোপালপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি অঞ্চলে আর একটি ব্যাঘ্রদেবতার পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। দেবতার নাম ডাংধরা। এই সকল গ্রামের থানে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডাংধরা দেবতার পূজা দেওয়া হয়। এই দেবতার বাহন ব্যাঘ্র, দ্বিভুজবিশিষ্ট শিবের মূর্তি। মাঘপালা গ্রামের পূজায় হাঁস, পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। ফুল, বেলপাতা, বাতাসা, খৈ প্রভৃতি তো আছেই। কিন্তু গোপালপুর ও ধূপগুড়িতে বলি নেই। পূজা দিতে হয় দৈ, চিড়া, গাঁজা ও পান-সুপারী দিয়ে। এঁকে গ্রামরক্ষক বলে মনে করা হয়; লোক-বিশ্বাস, এঁর পূজা দিলে ব্যাঘ্র-ভয় যেমন থাকে না, তেমনি কোন রোগও প্রবেশ করে না গ্রামে। এঁর পূজায় বিচিওয়ালা কলা এবং চিড়া-দৈ অতি অবশ্যই দিতে হবে।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যাঘ্র-দেবতা সম্পর্কিত প্রচলিত গানে শোনা যায়ঃ

'হন্না হন্নি তাম্বুল বন্নি ধান খায় গোদগোদায়।
আইনত বসি গড়াগড়ি যায়, আউলের বাঘ ধরিয়া খায়॥
এক বাঘের নাম হৈ চৈ, গওয়ালক মারিয়া আনলে দই।
এক বাঘের নাম হামেলা, বাছিয়া মারে কামেলা॥
এক বাঘ গেইল দূর নাউয়া আনলে খুর॥
এক বাঘের নাম হারোয়া তার নিয়া গেইল মারেয়া॥
এক বাঘের নাম মাথার চান্দি পাত ফেলাইতে নিয়ম বান্দি।
এক বাঘের নাম খুকু কাসে, কোলক মারি তামাক আসে।
এক বাঘের নাম মাচার খুঁটি, চাউল চাবাইত গোটি গোটি'॥[৪১]

বস্তুত জলপাইগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্রভীতির প্রাচুর্য এত বেশী যে তারই ফলে এই সকল ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত লোকগীতি প্রচুর পাওয়া যায়; দেবতার সংখ্যাও সেই জন্য এই অঞ্চলে এত বেশী। এই রকম আর একটি ব্যাঘ্রদেবতার নাম 'মহারাজা'। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার ধুসমল্ল গ্রামে এই দেবতার পীঠস্থান। তাছাড়া মালদহ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে 'মহারাজা' নামক ব্যাঘ্রদেবতার পূজা হতে দেখা যায়। 'মহারাজা'কে সকল দেবতার রাজা বলা হয়। সমগ্র গ্রামের বা ব্যক্তিবিশেষের বিপদ-আপদে মহারাজা দেবতার পূজা দেওয়া হয়। যে কোন সময় এই পূজা করা যেতে পারে। তবে অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এই পূজা সাধারণত বেশী হয়ে থাকে, এটা গ্রামের সার্বজনীন উৎসব। একটি মন্দিরে ব্যাঘ্রবাহন চতুর্ভুজ মহারাজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হয়। 'মহারাজা' পূজায় পাঁঠা, পায়রা এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন মানৎ দেওয়া হয় এবং পাঁঠা ও পায়রাগুলি বলি দেওয়া হয়। 'রায়'-উপাধিধারী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজার প্রধান সেবায়েত।

অরণ্য-সঙ্কুল উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে বিচিত্র নামে ব্যাঘ্রদেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। এঁদের বর্তমান যাই হোক, আদিতে এঁরা ছিলেন ব্যাঘ্রভয় নিবারণকারী গ্রামদেবতা, পরে ভেতরের ও বাইরের অনেক কিছুকে আশ্রয় করে একটি দ্বন্দ্বাত্মক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এঁরা ব্যাঘ্র-দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এই রকম একটি ব্যাঘ্রদেবতা 'বাঘশূর'।

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমা সহর থেকে মাইল দশেক দূরে চিকনিগুড়ি গ্রাম ; এখানে প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে 'বাঘশূরের' পূজা হয়। দ্বিভুজ এই দেবতার বাহন ব্যাঘ্র, দেবতার বেশ যোদ্ধার এবং বর্ণ পীত। পূজার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই। আর একটি সন্ন্যাসী বেশধারী ব্যাঘ্র-বাহন দেবতার নাম 'মোটা গ্রামঠাকুর'।[৪২] ড. হরিপদ চক্রবর্তী এঁকে 'সোনা রায়' বলে অনুমান করেছেন। ডুয়ার্সে বহুগ্রামেই এঁর পূজা হয়ে থাকে। মাথায় জটা, পরণে ব্যাঘ্রচর্ম, হাতে গাঁজার কলকে, পূজার প্রধান উপচারও গাঁজা। তবে ধূপ, দীপ, ফল, বাতাসা, চিড়া, মুড়ি, দৈ প্রভৃতিও নিবেদন করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ গ্রামেই পূজারী রাজবংশী দেউসী। কিন্তু কোন কোন স্থানে আর্যীকরণ শুরু হয়েছে। পূজারীও বদল হয়েছে, বদলে যাচ্ছে পূজার মন্ত্রও। এখন কোন কোন গ্রামে অসমীয়া পূজারী মন্ত্রপাঠ করেন : 'ওঁ যদ্‌গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে যদেনশ্চক্রিমো বয়মিদং তদ্বয়ং যজামহে। ওঁ গ্রামদেবতায়ৈ নমঃ।' এই মন্ত্রটি যাবতীয় গ্রামাধিষ্ঠাতৃ দেবতার আধুনিক যুগের তথাকথিত পৌরাণিক মন্ত্র।

এছাড়া রাজবংশীদের নিজ ভাষার মন্ত্রের দ্বারাও পূজা হয়ে থাকে। যেমন : 'শ্রাবন্দে-শ্রীহরি ভাদ্রে বাসুদেব আশ্বিনে মাধব কার্ত্তিকে যাদব অঘানে কেশরী পৌষে পুরুত্তম মাঘে মধুগঙ্গাজল ফাল্গুনে দুই তারিখ চৈতে দামোদর বৈশাখে নরসিংহ আষাঢ়ে গোবিন্দ ভক্তের পূর্ণ সেবা, এই নিবেদন।' এরপর ভোগ নিবেদন : 'দধিচুরার উপরে দিছে তুলসী মঞ্জরী আনন্দে ভোজন করে কেশরা-কেশরী।'

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, এমনকি সমগ্র ডুয়ার্সেও তথ্যানুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব নয়ও। ডুয়ার্সের গয়েরকাটা বনাঞ্চলের সীমানা সন্নিহিত পূর্ব দুরামারী ও খট্টিমারী গ্রামে দেখেছি অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে পৃথক মণ্ডপে পূজা পাচ্ছেন বনদেবতা 'বীরু বাগ'। নাম থেকেই বোঝা যায় 'বীরু বাগ' হচ্ছেন ব্যাঘ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কবে থেকে এই পূজার প্রচলন হয় তা জানা যায় না। তবে মনে করা অন্যায় হবে না যে এই দেবতার পূজার ব্যাপারে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য ছিল।

'বীরু বাগ' ঠাকুরের মূর্তি মাটি দিয়ে তৈরী, দেখতে সন্ন্যাসীর মত। পরণে ব্যাঘ্রচর্ম, মাথায় জটা, দ্বিভুজ, শিরে সর্পভূষণ, পাশে বাঘ। পূজা যে কোন সময় হয়ে থাকে, বিশেষ করে চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা অবশ্য করণীয়। প্রায় ১৪-১৫

বৎসর পূর্বে চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হতো। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। পূজার উপচার সকল রকমের ফুল, দূর্বা, চন্দন, মিষ্টি, কলা, বাতাসা চিড়ে, মুড়ি, খৈ, দুধ, দৈ ইত্যাদি। পূজায় অনেকে মানৎ করে পাঠা, কবুতর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি। এগুলি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পূজার একটি বিশেষত্ব এই যে, এই পূজায় সকল রকমের ফুল দিয়ে পূজা হলেও বেলপাতা বা তুলসীপাতার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শিবপূজায় অবশ্য প্রয়োজনীয় বেলপাতা বা বিষ্ণুপূজায় অবশ্য প্রয়োজনীয় তুলসীপাতা-বিহীন পূজার একটি মাত্র অর্থই হতে পারে যে ইনি শিবও নন, বিষ্ণুও নন। নেহাতই একজন গ্রাম দেবতা।

উত্তরবঙ্গের পূজাস্থানের প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়, গ্রাম দেবতার সঙ্গে দেবীও থাকেন. পুরুষ দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রীদেবতা। কিন্তু এখানে কোন স্ত্রীদেবতা নেই। পাশে পৃথক পৃথক চালায় যে সকল দেবমূর্তি আছেন, তাঁরা সকলেই পুরুষ মূর্তি, যেমন: ভাণ্ডাকুড়া [ভালুকদেবতা], লোহাশূর, টোসাশূর প্রভৃতি।

'বীরু বাগ' পূজায় যে মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ:

আসন: 'গোঁসাই গোবিন্দ নাম চিত্রকুটের ঘরে।
বীরু বাগ বসিল মোর পূজার ভিতরে॥
মোর পূজা ছাড়ি ঠাকুর অন্যের পূজায় যাবু।
দোহাই লাগে দেবধর্ম কার্তিকের মুণ্ড খাবু॥

পূজা: অংনামে সংসেবা সবন্ধের নামে পূজা।
জলে পুষ্পে বীরু বাগ ঠাকুর তোমার পদে পূজা॥

শান্তি: শান্তি পুরি মাই শান্তি পুরি মাই।
তোমার জনমস্থান দেখিবারে পাই॥
দেখিমু দেখিমু মুই নিরলে বসিয়া।
হেনকালে মহাদেব মিলিল আসিয়া॥
অতুল কুণ্ডল মাও সরাবতী হাতে।
বাড়ীর বাসস্থ তুই সন্তানের থানশিরি॥

বিসর্জন: সওয়াশত বল নিমু মুই হস্তেতে করিয়া।
মোর পুজা খা বীরু বাগ সন্তুষ্ট হইয়া॥
পূজাপানি খায়া বাবা তুষ্ট করেক মন।
দখিন দেশের লাগি করহ গমন'॥[৪৩]

মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যাঘ্র দেবতাকে 'দখিন দেশের লাগি করহ গমন' বলা হল কেন? এটা কি আদিম রাজবংশীদের ভাটিয়া-বিদ্বেষের পরিচায়ক? মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে আগত মুসলমান সৈন্যদের অত্যাচারের ফলে এই অঞ্চলের লোকদের ভাটিয়া-বিদ্বেষ অসম্ভব নয়। অধুনা আর একটি মত প্রচলিত হয়েছে যে রাজবংশীগণ কৈবর্ত রাজা ভীমের বংশীয়। পাল নরপতি রামপালদেব যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করেন এবং প্রচণ্ড আক্রোশে ভীমকে ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বধ করতে থাকেন। সেই সময় কিছু সংখ্যক ভীম-বংশীয় ব্যক্তি পালিয়ে এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় বহন করছে একটি রাজবংশী পল্লী-কবিতা :

'হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয়ে এ বড় শরম।
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইস্যাছি।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি॥'

পাল নরপতি রামপালদেবই কর্মগুণে পরশুরাম আখ্যা পেয়েছেন ইহাই ঐতিহাসিক অনুমান। এ কথা সত্য হলে হিংস্র বাঘকে দক্ষিণ দেশে যেতে বলা রাজবংশীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। লোককথা এবং লোকানুষ্ঠান এই ভাবেই ইতিহাসের ধারাকে রক্ষা করে থাকে।

জলপাইগুড়ি সহর থেকে আঠারো মাইল দূরে কানাইয়া নামে একটি বিল আছে। বিলের পাড়ে 'কানাইয়া ঠাকুর' নামে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক দেবতা আছেন, যাঁর বাহন ছিল বাঘ। দ্বিভুজ, হরিদ্রা বর্ণ গ্রামদেবতা; পরণে বাঘ-ছাল। এককালে নাকি এঁর বাহনও ছিল বাঘ; কিন্তু বর্তমানে বাঘহীন 'কানাইয়া ঠাকুরের' পূজা হয়ে থাকে। টিনের চালাঘরে কানাইয়া ঠাকুর আসীন। পূজা হয় ফুল, বেলপাতা এবং কলা, বাতাসা চিড়া, খৈ, দৈ প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়ে। বলি দেওয়া হয় হাঁস, পায়রা, পাঁঠা প্রভৃতি। কানাইয়া ঠাকুরের পূজা দিয়েই এই অঞ্চলে কৃষিকার্য শুরু হয়ে থাকে। বিশেষ পূজা হয় বৈশাখ মাসে।

এই কয়টিই হল পুরুষ ব্যাঘ্রদেবতাদের বিশেষ রূপ;—অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা সোনা রায় বাদে। উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সোনা রায়ের অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করে সোনা রায়ের কথা পৃথক ভাবে এই সংকলনের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গুরুত্ব সাংস্কৃতিক এবং তদ্সঙ্গে

ঐতিহাসিকও বটে। ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায়কে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব ঠাকুর অনেক স্থানে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন, তবুও তাঁর মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের এক যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে উঠেছে।

তিন.

অরণ্য-সঙ্কুল উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বিচিত্র নামে, নানা ধরণের ব্যাঘ্র দেবতার পরিচয়ই যে পাওয়া যায় তাই নয়, নানা ধরণের ব্যাঘ্রবাহনা দেবীমূর্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ দেশের সংস্কৃতিতে দেব-দেবীর সমান মর্যাদা, কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীদের প্রাধান্যই বেশী দেখা যায়। সাপ-বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে কার না ভয়? সে ভয় অতীতেও ছিল এবং এখনও আছে। এখন ভয় থেকে বাঁচবার জন্য চেষ্টা হয় সাপের বিষের চিকিৎসা করে বা বাঘ শিকার করে। কিন্তু অতীতে মানুষ চেষ্টা করতো পূজা করে দেবদেবীকে খুশি করে আত্মরক্ষা করতে। তাই সাপের দেবী হচ্ছেন মনসা। অনুরূপ ভাবেই নিরাপদ গ্রাম্য-জীবনে কৃষির প্রধান অবলম্বন গরুকে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল ব্যাঘ্রদেবতা বা দেবীর পূজা। সে কোন্ অতীত দিনের ঘটনা তার সন্ধান নির্ণয় করা আজ কঠিন। ইতিপূর্বে পুরুষ-দেবতাদের কথা আলোচিত হয়েছে। এখন ব্যাঘ্রবাহনা স্ত্রী-দেবতাদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম থানার কামাখ্যাগুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে সাড়ম্বরে কামাখ্যাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। দেবীর বাহন ব্যাঘ্র। তিনি চার হাতে যথাক্রমে ত্রিশূল, চক্র, শর ও ধনু ধারণ করে আছেন। উৎসবটি অতি প্রাচীন; অম্বুবাচীর কয়েকদিন পূর্ব থেকে উৎসব আরম্ভ হয় এবং অম্বুবাচীর পরেও কয়েকদিন চলে। মানৎ স্বরূপ দেবীর নিকট পাঁঠা, খাসী, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। এখন কামাখ্যাগুড়ি পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের বাসস্থান হলেও, পূর্বে ছিল 'রাভা' উপজাতি অধ্যুষিত স্থান [এখানে এখনও রাভা উপজাতীয়দের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়]। প্রবাদ এই যে, কামাখ্যাদেবীর আদি পীঠস্থান ছিল এই স্থানেই। পরবর্তীকালে কোচরাজ নরনারায়ণ দেবীকে আসামে গৌহাটীর নিকটবর্তী নীলাচল পর্বতে কামাখ্যা তীর্থে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাঘ্রবাহনা কামাখ্যাদেবী 'বোডো' সম্প্রদায়ভুক্ত রাভা উপজাতির উপাস্য দেবী বলেই লোক-বিশ্বাস।

কোচবিহার সহরে কোচবিহার রাজগণের পূজিত 'দেবী পূজা' আর একটি ব্যাঘ্রবাহনা দেবী পূজার নিদর্শন। দেবী দশভুজা বটেন। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ নেই; নেই চালিতে শিব-মহাদেব। দশভুজা দেবীর ডান পায়ের কাছে শিকারোদ্যত একটি সিংহ অসুরকে আক্রমণ করছে দেখা যায় বটে; কিন্তু দেবীর মূল বাহন একটি বাঘ। বাঘটিও প্রবল বিক্রমে অসুরকে আক্রমণ করছে। এইরূপ ব্যাঘ্রবাহনা, কিন্তু সিংহযুক্ত দুর্গামূর্তি অন্যত্র দেখা যায় না। এই মূর্তির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি না থাকলেও তাঁর দুই পাশে দুটি নারী মূর্তি আছেন; লোকে বলে জয়া-বিজয়া।

শারদীয়া দুর্গাপূজার মতই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীর পূজা হয়ে থাকে। তবে মন্ত্রাদি ব্যবহারের বিশেষ কোন রীতি নেই। পূজায় মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কবুতর এবং শূকর বলি দেওয়া হয়ে থাকে। কামাখ্যা মন্দিরেও কবুতর বলি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শূকর বলি এইস্থান ভিন্ন অন্যত্র হয় না। এতে মনে হয় এটি একটি প্রাগার্য-প্রথা। পূর্বে নাকি দেবীর সম্মুখে নরবলি দেওয়া হতো; এখন নরবলি দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু আতপ চাউলের পিটুলি দিয়ে তৈরী মনুষ্যমূর্তি এখনও বলি দেওয়া হয়। এই প্রথা নিশ্চিতই আদিম নরবলির স্মারক।

এখানকার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দেবীমূর্তি তৈরী করার জন্য ময়না গাছের প্রয়োজন। ময়না গাছ দিয়ে দেবীর শিরদাঁড়া তৈরী হয়। এই উপলক্ষ্যে ময়না গাছ কাটার সময় গাছের পূজা করা হয়। দুটি গোবরের পুতুল তৈরী করে কলার পাতা বা খোলায় দৈ, মিষ্টি, আতপ চাল, কাপড়, ফুলের মালা, খৈয়ের নাড়ু রাখা হয়। অন্য কলার খোলায় পায়েশ বা নবনী, তেল, সিঁদূর প্রভৃতি রেখে, বটের পাতা একটি চিত্রকরা হাঁড়ির উপরে রেখে ময়না গাছের পূজা করা হয়। পূজা হয়ে গেলে গাছ কেটে ঐ গাছ থেকেই দেবীদুর্গার 'কাঠাম' তৈরী হয়।[৪৪] প্রবাদ এই যে, রাজা হওয়ার পূর্বে নরনারায়ণ একদিন শিকারে গিয়ে পরিশ্রান্ত অবস্থায় ময়না গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। ঐ সময় দেবী দুর্গা সহস্র ফণাধারিণী সর্পমূর্তিতে নরনারায়ণকে রৌদ্র-জল থেকে রক্ষা করেন। এইজন্য দেবীদুর্গার পূজা প্রচলন করার সময় নরনারায়ণ 'ময়না গাছ' দিয়ে দেবীর কাঠাম ও শিরদাঁড়া তৈরীর আদেশ দেন এবং সেই থেকে এই প্রথা চলে আসছে। ময়না গাছ, শূকর বলি, সর্প

সংশ্রব এ সকলই প্রাগার্য প্রভাবের পরিচায়ক। তাছাড়া বৌদ্ধদেবী বজ্রধাতেশ্বরীর সাধনায় উল্লিখিত সাপ, বাঘ প্রভৃতি থেকে মনে হয় কোচবিহারের দেবীপূজায় বৌদ্ধ প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়।

দেবীবাড়ীর পূজায় প্রাগার্য প্রভাব যতটাই থাকুক না কেন, বৈরাগীদীঘির পাড়ে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী ভবানীদেবীর পূজা কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য মতেই হয়ে থাকে। এখানেও দেবী দশভুজা, এখানেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শিব প্রভৃতি অনুপস্থিত; জয়া ও বিজয়া অবশ্য আছেন এবং বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাঘ্রের উপরে দাঁড়িয়ে দেবী অসুর বিনাশে রত। এখানে কিন্তু পূজা হয় সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য মতে, অর্থাৎ আদিতে দেবী যাই থাকুন না কেন, বর্তমানের পূজা-পদ্ধতিতে দেবীর আর্যীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

অপর একটি প্রবাদে আছে, কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্য প্রতিষ্ঠার [আঃ ১৪৯৬ খ্রীঃ] পূর্বকাল থেকেই এই পূজার প্রচলন ছিল। বিশ্বসিংহ স্বপ্নাদেশে এই দেবীমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন এবং এই দেবীই তাঁকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একছত্র ভূপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রাচীন রাজবংশাবলীতে সেই দেবী প্রতিমার যে বিবরণ লিখিত রয়েছে, তা মৎস্যপুরাণ বা বৃহৎ নান্দিকেশ্বর পুরাণে বর্ণিত কাত্যায়নী বা মহিষমর্দিনী প্রতিমার অনুরূপ:

'দশখান বাহু বক্ত্র হয় এক খান।
তিন গোটা চক্ষু অতি দেখিতে সুঠাম॥
যুবতীর বেশ শোভে অলঙ্কারগণ।
সিংহের উপরি আছে দক্ষিণ চরণ॥
মহিষের পৃষ্ঠে বাম চরণ থাপিলা।
মহিষের কাটাগলে পুরুষ জন্মিলা॥
দৃঢ় মুষ্ঠে পুরুষের কেশেতে ধরিলা।
দক্ষ হস্তে বক্ষো মাঝে ত্রিশূল ভেদিলা॥
বাম হস্তে অসুরের ব্যাঘ্র কামোড়িলা।
দন্ত সারি বার করি প্রাণ তেয়াগিলা॥
চক্ষুঃস্থির করি দুষ্ট রুধির বমিলা।
দশখান অস্ত্র দেবী হস্তেতে ধরিলা॥

শূল, খড়্গ, শর, শক্তি, চক্র দক্ষিণত।
বাম হস্তে পাঁচ অস্ত্র ধরে নানা মত ॥
পাশ যে খেটক ধনু পরশু অঙ্কুশ।
হেরি হরপুত্র পাইল পরম সন্তোষ ॥'

'হরপুত্র' অর্থাৎ মহারাজ বিশ্বসিংহ। 'বাম হস্তে অসুরের ব্যাঘ্রে কামোড়িলা'।—এই বিভূতি কোচবিহারের রাজকীয় দুর্গা প্রতিমায় আজও রক্ষিত হচ্ছে।[৪৫] অবশ্য মহারাজ নরনারায়ণের সময় থেকেই যে দেবী-পূজার সমধিক প্রচলন হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উত্তরবঙ্গ-আসাম সীমান্তে কুমারগ্রাম থানা। এই থানার বিভিন্ন স্থানে পূজিত একটি বনদেবীর নাম: 'সাত শিকারী'। শিকারীদের হাতে বড় বাঘ বা চিতা বাঘ মারা পড়লে তাঁর পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ ও নৈবেদ্য—দূর্বা, ফুল, বেলপাতা, চিনি, ফল প্রভৃতি এবং সাদা পায়রা একজোড়া। পায়রা জোড়া উৎসর্গ করে উড়িয়ে দিতে হয়। এছাড়া প্রয়োজন হয় সাদা, লাল এবং কালো রং-এর কাপড়ে তৈরী সাতটা নিশান। বাঘের সংখ্যা বেশী হলে প্রত্যেক বাঘের জন্য একজোড়া করে পায়রা উড়ানো বিধেয়। এ কোন সংস্কৃতির ধারক তা বলা কঠিন।

জলপাইগুড়ি সহর থেকে পাকা রাস্তায় প্রায় আঠারো মাইল দূরে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে—লোকে বলে 'চাপগড়'। গ্রামটির নামও দুর্গার নামানুসারে। এই গ্রামে রয়েছে একটি পূজার মণ্ডপ,—যার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর নাম 'রণপাগলী ঠাকুরাণী।' হরিদ্রা বর্ণ, দ্বিভূজা এই দেবীও সবাহনা—বাহন ব্যাঘ্র। ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, ফলমূল, চিড়া, দুধ, দৈ, খৈ, বাতাসা, মিষ্টি প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে দেবীর পূজা হয়ে থাকে। বলি দেওয়া হয় পাঁঠা, হাঁস, পায়রা। পাঁঠা হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া হয়; কিন্তু হাঁস ও পায়রার মাথা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। পূজারী রাজবংশী অধিকারী বা দেউসী। প্রবাদ এই যে, নিকটবর্তী ব্যাঘ্রদেবতা কানাইয়া ঠাকুরের বাঘের সঙ্গে রণপাগলী ঠাকুরাণীর বাঘের দীর্ঘস্থায়ী তুমুল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে কানাইয়া ঠাকুরের বাহন বাঘটি মারা যায়। পরে সেই মরা বাঘটি এখান থেকে থানা সহর ময়নাগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে 'কানাইয়া ঠাকুর' বাহনহীন অবস্থায় পূজা পাচ্ছেন।

এই কিংবদন্তী থেকে জন্ম নিয়েছে একটি পল্লীগাথা। ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই পল্লী কবিতা থেকে জানা যায়:

'চাপগড় থনে[১] বাঘ আইস্যাছে রে ভাই, বাঘ আইস্যাছে।
বাঘের উপরত তীর তামাক্কা ছুঁইর‍্যা মারেছে ॥
ঠাকুর কানাইয়ার এক বাঘ, পাগলীর হয় আর।
দোনো বাঘত্ শুরু করিল্ কাজিয়া[২] ধুন্দুমার ॥
পরথমে আইসে কানাইয়ার বাঘ গোফে তাও দিয়া।
ঠাকুরে পরনাম করি লম্ফ মারে যে কুতিয়া ॥
পাগলীর বাঘ পিছত্ আইসে ডুলির নাগাল পেট।
তাহার পরতাপে ভোটের[৩] রাজা মাথা করে হেঁট ॥
ভোটের ব্যাটা গেঠছেরে ভাই গরু চরাইবারে।
রণপাগলীর বাঘ যায়া তার ঘারা মোচড়ি ধরে ॥
ঘোড়া শালে ঘোড়া মারে হাতী শালে হাতী।
বাচিয়া বাচিয়া মারে ভোটের পহরী যতেকি ॥
গাবুর[৪] বয়সী ভোটের মাইয়া সন্ধায়[৫] ভুখায় বাড়া[৬]
পাগলী বুড়ির বাঘে তার ঘাড়ে দেয় ঘোড়া ॥
ঘরের পাছত যায়্যা বাঘ ভুলকী মারি চায়।
চমকিয়া উঠ্যা চাপগড়ের সগ্‌গলে পালায় ॥
চাপগড়ে বুড়া ব্যাটা গেইচে দোলা বাড়ী[৭]।
পাগলীর বাঘ নাগাল পায়্যা পিট্টি আইন্‌চে বাড়ী ॥
রাংরেজের গোলাগুলি রণপাগলীর বাঘ।
চাপগড়ের বুড়া দেউলিয়া[৮] বলে বাপ্ বাপ্ ॥
ভোটের মাও বুড়ার বেটি গেইচে চুয়ার[৯] পাড।
লম্ফ দিয়্যা পাগলীর বাঘ মোচরাইচে তার ঘাড় ॥
ঘাড় মোচড় খায়্যা কানাইর বাঘ করে গাঁক্ গাঁক্।
দড়াম করি আছড়ি পড়িল্ ঘুড়ি এক পাক ॥
রাংরেজ[১০] সরদার কইবু শুন পাগলীর মাই।
ময়নাচড়িত্ এক মরা বাঘ আইচে দেখিবারে যাই ॥
ময়নাগাছের[১১] মাতায় রাংরেজ নিশান বান্ধিয়া।
জনায় জনায় দেখায় বাঘক্ ধূপ ধুনা দিয়া ॥'

[১. থনে=থেকে ; ২. কাজিয়া=লড়াই, যুদ্ধ ; ৩. ভোটের=ভুটানের ; যে সময়ের কথা তখন ডুয়ার্স অঞ্চল ভুটানের অধীনে ছিল ; ৪. গাবুর= জোয়ান ; ৫. সন্ধায়=সন্ধ্যায় ; ৬. ভুখায় বাড়া=ধান ভানে ; ৭. দোলা বাড়ী=জলা জমির ধান ক্ষেত ; ৮. দেউনিয়া=জোতদার, প্রধান ব্যক্তি ; ৯. চুয়া=কূয়া, ইন্দারা ; ১০. রাংরেজ=ইংরেজ ; ১১. ময়নাগাছ=এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ]।

আপাতদৃষ্টিতে এই কিংবদন্তী সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও অর্থহীন ; অর্থহীন উদ্ধৃত পল্লী কবিতাটিও। কারণ এর মধ্যে শুধু বাঘের উৎপাতের কথাই লিখিত হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এগুলি মোটেই নিরর্থক নয়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অতীত ইতিহাস। সে ইতিহাস ভুটান রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ সেনার যুদ্ধ এবং ভুটানের পরাজয়ের ফলে ডুয়ার্সে ইংরেজ শাসনের বিস্তার। 'কানাইয়া ঠাকুরের' বাঘ মারা যায় কিংবদন্তীর অর্থ, যুদ্ধে ভুটিয়াদের পরাজয় হয় ; রাজ্য হিসাবে ভুটান টিঁকে থাকলেও ডুয়ার্স তার হস্তচ্যুত হয় এবং এর জন্যই 'কানাইয়া ঠাকুরকে' বাহনহীন অবস্থায় পূজা নিতে হচ্ছে। 'রণপাগলীর' বাঘ জয়ী হয়, এ কথাটির অর্থ কোচবিহারের রাণী কামেশ্বরী, যিনি চাপগড়েরই মেয়ে এবং যাঁর আমন্ত্রণে কোচবিহার রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য ইংরেজ সৈন্য ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোরে রাণীকে বিজয়িনী করেন। কাজেই সবাহনা 'রণপাগলীর' পূজা আজও প্রচলিত আছে। আর কানাইয়ার বাঘের মৃত দেহ ময়নাগুড়িতে নিয়ে আসার অর্থ যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রাজ্য, ডুয়ার্সকে, ইংরেজগণই দখল করেছিলেন—তখন থেকেই ডুয়ার্স ইংরেজের শাসনাধীন। কিংবদন্তী ও পল্লী কবিতা উভয়েই এইভাবেই ইতিহাসেব কাহিনীকে রক্ষা করে এসেছে।[৪৬]

জলপাইগুড়ি জেলার নানাস্থানে এবং কোচবিহার জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষত ধূপগুড়িতে 'ডাংধারী মাও'-এর পূজা প্রচলিত আছে।[৪৭] একথা লিখেছেন ড. চারুচন্দ্র সান্যাল। কিন্তু একথার প্রতিবাদ করে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় লিখেছেন : "রাজবংশীদের ভাষা অনুসারে 'ডাং' শব্দটির অর্থ 'নড়ি' অর্থাৎ লাঠি এবং 'বারি' বা আঘাত করা। 'ডাংধারী' শব্দটির অসিধারিণী অর্থে প্রয়োগ করিতে পারা গেলেও প্রকৃত ঘটনা কিন্তু ইহার ধারে কাছেও যায় না·········'ডাংধারী মাও' বলিয়া দেবতাটির নাম কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না"।[৪৮] কিন্তু 'ডাংধরা' নামক ব্যাঘ্র দেবতার পরিচয় অনেক

স্থানেই পাওয়া যায় এবং এবিষয়ে পূর্বেই লেখা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন অন্য সম্প্রদায়ের নারীহরণকারীদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায় তখন 'ডাংধরা' পূজাটির সামান্য পরিবর্তন করে রাজবংশী নেতা পঞ্চানন বর্মণ 'ডাংধরী মাও'-এর পূজা প্রবর্তন করেছিলেন। এই দেবীর পূজায়—পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, চালকুমড়া, বাতাবি লেবু প্রভৃতি মানত করা হয় এবং বলি দেওয়া হয়। আজও রাজবংশী পল্লীকবিগণ গেয়ে থাকেন ঃ

'চমকি উঠিল ডুকরণ শুনি[১] ডাংধরী মোর মাও।
দিশা নাই দুয়োর নাই, খালি কোল্লাহায় ছাথে সংসারের তাও॥
বাপ ভাইয়ের ঘর সোয়ামীর কোল, আর যেইটে[২] নারী থাকে।
ঘাটা অঘাটায়[৩] এখুন তখন নিয়া যাইতেছে বাঘে॥
ডাংধরী মাও কোর্দ্ধে[৪] হাঁকিয়া, গাইন[৫] ধরিয়া যায়।
নিজ্জ মন্ত্রে ভবানী পূজিনু হাসে ধরতী মাও॥'

[১. ডুকরণ = চিৎকার করে কান্না; ২. যেইটে = যেখানে; ৩. ঘাটা অঘাটায় = পথে-ঘাটে, ৪. কোর্দ্ধে = ক্রোধে, রাগে; ৫. গাইন = ধান ভানিবার উলুখলের ডাণ্ডা]।

জলপাইগুড়ি জেলার ভোটপট্টি রেল ষ্টেশন থেকে দু-মাইল দূরে খয়েরখাল গ্রাম। এই গ্রামের সীমান্তে জোড়পাকড়িগামী বড় কাঁচা রাস্তার উপর একটি আটচালা টিনের মন্দির আছে—লোকে বলে 'গোসানী মন্দির'। এই মন্দিরে পূজিতা হন অষ্টধাতুনির্মিত ব্যাঘ্রবাহনা এক দেবী। স্থানীয় মতে 'গোসানী মা'। পূজা করেন রাজবংশী দেউসী। সারা বৎসর মাটির বেদীর উপর পূজা হয়—দেবীমূর্তি থাকেন অদৃশ্য। শুধু শারদীয় মহাষ্টমীর দিন অষ্টধাতুর মূর্তিটি আসনে বসিয়ে গোসানী মার পূজা করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'গোসানীমঙ্গল' গীতে শোনা যায় ঃ

'যেই রাজ্যে নাই রাজা রাজ্যের পালন।
চণ্ডী পূজিলে রাজা হবে অনুক্ষণ॥...
করহ চণ্ডীর পূজা দিয়া ফলমূল।
ইহাতে চণ্ডিকা যদি ধরে অনুকূল॥
পূজায়ে চণ্ডিকা যদি দেয় ধন বর।
করিব চণ্ডীর পূজা সপ্তমীর পর॥'

সপ্তমী তিথি শেষ হবার পর শুধুমাত্র মহাষ্টমী তিথিতে 'গোসানী মা'য়ের

পূজা হবার কারণ কি? এ প্রসঙ্গে আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে অষ্টমী তিথি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর পূজারতি বন্ধ হয়ে যায় এবং দেবীমূর্তিকে কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়। নবমীতে কোন পূজা হয় না। পূজার উপচার সম্বন্ধে 'গোসানীমঙ্গল' গীতে আছে:

'জন্মফল শ্রীফল বিল্লপত্র নিল।
জবাফুল আমলখি বেলফুল সীতা।
পদ্মফুল কুমুদ সাজী ভরে অপ্রাজীতা॥
কদলীর ফল আদি যত ইতি ফল।
চণ্ডীপূজার লাগি আনিল সকল॥
গোময় ছিটায়া করে স্থান সমস্কার।
অঙ্গনা সহিতে স্নান করে ভক্তিশ্বর॥
পদ্মপত্র সারি সারি বসায় পূজায়।
টণ্ডুল কদলি জাম তাহার উপর॥
শ্রীফল আমলখি যতেক উপহার।
মধুঘৃত চিনি আদি যত ইতি যার॥
ধূপদীপ মধুপর্ক আগর চন্দন।
সিন্দুরের ফোটা দিল করিয়া যতন॥
বিল্বপত্র দূর্বা যত দিল পুষ্পাঞ্জলি।
জলপুষ্পা হাতে দেয় মুখেতে উললী॥'

এখানে কোন বলি হয় না। মানত থাকলে পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ একদিনের পূজায় এখানে মেলা বসে, চারদিক থেকে লোক সমাগম হয় প্রচুর। পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্য কোচবিহার রাজগণ কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছেন। অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তিটি দেখতে কোচবিহার রাজবাড়ীর দেবীমূর্তির অনুরূপ। আটচালা মন্দিরটিও কোচবিহার রাজগণ তৈরী করে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয়;—উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে সকল ব্যাঘ্র-দেবতা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে তাঁদের অধিকাংশই 'শিব' বা 'দুর্গার' প্রকার ভেদ বলে অধুনা পরিচিত হচ্ছেন বা হতে যাচ্ছেন। তথাপিও এগুলিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পূজা বলে মনে করলে ভুল করা হবে; এবং সে ভুল হবে প্রধানত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকেই।

যে সময় এঁদের পূজা হয় তা বিশেষ লক্ষণীয়, বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন বা পৌষ এই সব কয়টি মাসই শস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈশাখে চৈতালী ঘরে উঠেছে, নতুন ধান বোনার কাজ শুরু হয়েছে : আষাঢ় মাসে আউস ধান পাকতে শুরু করেছে, আমন বোনা আরম্ভ হয়েছে, আশ্বিনে আউস ঘরে উঠেছে, আমনের আশায় চাষী উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে, পৌষে সেরা ফসল আমন ধান ঘরে এসেছে। উৎসব জেগেছে ঘরে ঘরে। সেই জন্যই মনে হয় এই সকল দেবদেবী প্রকৃতই শস্য সম্পর্কিত। শস্যের কাজে অন্যতম প্রধান সহায়ক গরু; সেই গরুকে বাঘের মত হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্যই ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর সৃষ্টি। চণ্ডীর অপর নাম 'শাকম্ভরী' এবং বাংলার লোকগাথায় শিব হয়েছেন 'কৃষক'। কাজেই এই সকল গ্রাম-দেবতা সম্বন্ধে ভক্তেরা যাই মনে করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এঁরা হচ্ছেন এদেশের যুগ-যুগান্তরের কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতা ও তার বিবর্তনের মৌন সাক্ষী, সামাজিক চেতনা ও বিশ্বাসের উত্থান-পতনের মূর্ত প্রতীক।

চার.

উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ধরণের লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। তাঁদের কত প্রকার নাম, কত প্রকার-ভেদ। তবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে এঁদের অধিকাংশই 'দুর্গা' বা 'চণ্ডী' নামে পরিচিত। কিন্তু তা হলেও এগুলিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিভুক্ত পূজা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এদের অনেকেরই মূল অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এঁদের অন্যতমা হলেন 'দেবী ভাণ্ডানী' বা 'ভাণ্ডারনী'। উত্তরবঙ্গের তিস্তানদীর পূর্বে এবং তোর্ষানদীর পশ্চিমাঞ্চলে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে এই দেবীর পূজা হয়ে থাকে শারদীয়া একাদশীর দিন থেকে তিন দিন; আবার কোথাও বা একদিন। লোক-বিশ্বাস, ইনি ব্যাঘ্রের দেবী; কারণ বাঘ এই দেবীর বাহন।

অতি প্রাচীনকালে একটি ঋতু পরিবর্তনের সময় লোকে একটা না একটা উৎসব করতো। তারই স্মৃতি রয়েছে বাংলাদেশের প্রবাদ কথায় : 'বারো মাসে তের পার্বণ'। খারাপ বা মন্দ ঋতু থেকে ভাল ঋতু যখন আসে তখন উৎসবের মাত্রাটা একটু বেশী হয় স্বাভাবিক কারণেই। বর্ষা অসুবিধাকর ঋতু; বর্ষাকালে লোকের চলাফেরার অসুবিধা হয়—একগ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, বর্ষাকালে আহারাদির জিনিষপত্রও দুর্লভ হয়ে ওঠে, মানুষের দিন কাটে

দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মমতে নারায়ণ এই সময় শুয়ে থাকেন, বৌদ্ধ-ধর্মেও দেখা যায় শ্রমণেরা এই সময় নিজ নিজ বিহারে আবদ্ধ হয়ে থাকতেন। ক্রমে বর্ষা চলে গেল। আকাশ পরিষ্কার হলো,—নদনদীর চড়ায় দেখা দিল কাশফুল, দীঘিতে দেখা দিল পদ্ম। পথঘাট শুকিয়ে লোকের চলাফেরার সুবিধা হলো। হাটে-বাজারে দেখা দিল নানারকমের আনাজ-তরকারি। আর বাঙ্গালীর মূল খাদ্য ভাতের সমস্যার সমাধান আসন্ন; 'ভাদৈ' [আউস] ধান ঘরে এসেছে, 'হেউতি' [হৈমন্তী—আমন] ধান ফলতে আরম্ভ করেছে। এই তো উৎসবের সত্যিকারের সময়।

কিন্তু কি নিয়ে উৎসব? কোন্ দেবতার পূজা নিয়ে মেতে উঠবে জনসাধারণ? 'চণ্ডী' থেকে জানা যায় এ সময়, অর্থাৎ বর্ষাশেষে বা শরৎকালে বহু পুরাতন দিন থেকেই একটি মহাপূজা হতো। আমরা 'চণ্ডী'র শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি:

'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি সমন্বিতঃ॥
সর্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥' [১২-১৩]

অর্থাৎ দেবী নিজেই বলছেন, শরৎকালে একটি মহাপূজা হয়ে থাকে। কিন্তু সে পূজাটি যে কি তা দেবী বলেন নি। চণ্ডীতেই পাওয়া যায়, মেধস ঋষির কথা শুনে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুইজনে নদীর চরে মাটির প্রতিমা তৈরী করে ['দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্'] তিন বৎসর পূজা করেছিলেন। সে মূর্তি যে কি তা ঋষি বলেন নি। সে মূর্তি দ্বিভুজা-চতুর্ভুজা বা দশভুজা ছিলেন কিনা তা-ও জানা যায় না। সে মূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ প্রভৃতি ছিলেন কিনা তা-ও জানা নেই। তবে শরৎকালের পূজায় মূর্তিপূজা এই আরম্ভ। একথা 'চণ্ডীতে' স্বয়ং দেবী বলেছেন। এই দেবী কে?

দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে দুর্গাপূজার পদ্ধতি সর্বপ্রথম লিখেছিলেন শূলপানি। তিনি তাঁর গ্রন্থে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে জিকন এবং ধনঞ্জয়ের মত উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'দায়ভাগ' রচয়িতা জীমূতবাহন জিকনের মত উল্লেখ করেছেন। কাজেই তাঁরা একাদশ শতাব্দীর লোক হতে পারেন। এই সময়কার বহু মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে।

তারপর থেকে এ দেশে দুর্গোৎসবের প্রথা চলে আসছে। দুর্গাপূজার একটা বড় অঙ্গ নবপত্রিকার পূজা অর্থাৎ শস্যের পূজা। পৌরাণিক চণ্ডীও তো শস্য-দেবী 'শাকম্ভরী'। এইজন্য মনে হয় চণ্ডীতে যে শরৎকালীন দেবীর পূজার উল্লেখ আছে, তিনি আদিতে আদিম অধিবাসীদের শস্যদেবতাই ছিলেন। ভাণ্ডানী বা ভাণ্ডারনী নামটিও প্রাণিধানযোগ্য ;—শস্যেরই তো ভাণ্ডার হয়। শস্যের ভাণ্ডার রক্ষাকারিণী দেবীই 'ভাণ্ডানী' বা 'ভাণ্ডারনী'। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি,—তার একমাত্র কারণ অনার্যবংশসম্ভূত কোচবিহার এবং বৈকুণ্ঠপুর রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি কোন দিনই।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "চণ্ডীর কাহিনীর পশ্চাতে কোথাও লৌকিক কাহিনী ছিল কিনা, থাকিলে তাহা কি ছিল তাহা এখন আমরা জানি না ; কিন্তু পরবর্তীকালে যে এই চণ্ডীকাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া নানাপ্রকারে বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহার নমুনা পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে পাই।······'চণ্ডীচরিত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়······দেবরাজ ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন এবং অসুরগণকে নিহত করিলেন।"[৭৯] এখানে চণ্ডী বা দুর্গাকে ব্যাঘ্র-বাহনারূপে দেখা যাইতেছে। কোচ রাজবংশের দুর্গাপূজাও ব্যাঘ্র-বাহনাদেবীর পূজা : কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের ভাণ্ডানী পূজাও তাই। বাঘ হিংস্র জন্তু, নিঃশব্দ তার গতি,—বিদ্যুতের গতিতে শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার জুড়ি নেই। এইজন্য প্রাচীন কালে উত্তরবঙ্গের অরণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম ভয়ের কারণ ছিল বাঘ। তার গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তার তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যাঘ্রপূজার প্রবর্তন হয় এবং ক্রমে কৃষির অধীশ্বরী 'ভাণ্ডানী' বা 'ভাণ্ডারনী দেবী' ব্যাঘ্রকে নিজের বাহনে পরিণত করে দেবীত্বে ভূষিতা হন।

জলপাইগুড়ি জেলার বার্ণিশ, ময়নাগুড়ি, মাধবডাঙ্গা, বাসিলার ডাঙ্গা, পদমতী, ধূপগুড়ি, রথের হাট, খয়ের খাল, নয়াভাণ্ডানী, বটেশ্বর, দোমোহনী, কোচবিহার জেলার রানীরহাট, কামাতচেংরাবান্দা, যোগেন্দ্রনগর, পাটছাড়া-গোপালপুর প্রভৃতি বহুগ্রামে ভাণ্ডানী দেবীর পূজা হয়ে থাকে।

এই দেবীর পূজা সম্পর্কে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক সে সব কাহিনী।

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার যোগেন্দ্রনগর গ্রামে বিজয়াদশমীর পর একাদশী তিথিতে মহাসমারোহে ভাণ্ডানীদেবীর পূজা হয়ে থাকে। কিংবদন্তী অনুযায়ী 'ভাণ্ডানী' নামে দেবীদুর্গার এক ভগ্নী ছিলেন। শারদীয়া পূজা শেষে দশমী তিথিতে দেবীদুর্গা মর্ত্যবাসীর পূজা নিয়ে যখন কৈলাসে ফিরছিলেন, তখন পথে ভগ্নী ভাণ্ডানীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দুর্গার পূজা শেষের সংবাদ পেয়ে এবং নিজের পূজা না পাওয়ার দুঃখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তা দেখে দুর্গাদেবী বললেন: 'তুমি আগামীকাল, একাদশীর দিন মর্ত্যে আবির্ভূতা হও, সেখানে তোমার পূজা হবে।' সেই থেকে এখানে শারদীয়া শুক্লা একাদশী থেকে তিন দিন ভাণ্ডানীর পূজা হয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বেও এখানে চতুর্ভুজা এই দেবীর বাহন ছিল বাঘ; কিছুদিন যাবৎ ব্যাঘ্র রূপান্তরিত হয়ে সিংহে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। পূর্বে পূজারী ছিল রাজবংশী 'দেউসী'গণ। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করে থাকেন, জগদ্ধাত্রীপূজার মন্ত্র এবং রীতি অনুযায়ী। তবে আগের মতই পাঁঠার সঙ্গে হাঁস, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। আরও একটি পরিবর্তন হয়েছে পূজা পদ্ধতির দেবীর দুই পার্শ্বে কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী যুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ আদিম পূজাপদ্ধতিকে গ্রাস করছে ব্রাহ্মণ্যরীতি ও পূজাপদ্ধতি।

কোচবিহার জেলার পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাঘ্রবাহনা চতুর্ভুজা ভাণ্ডানী দেবীর পূজা হয়। এখানকার পূজা প্রচলন বিষয়ে প্রবাদ এই যে কোন সুদূর অতীতে রাজা নহুষ শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়ে, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরেই শিকার করবার জন্য বনে চলে যান এবং শিকারের আনন্দে দেবীর পূজার কথা ভুলে যান। সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল, নবমী তিথিও শেষ হলো,—রাজার আর দেখা নেই। রাজার অপেক্ষায় থেকে থেকে, পুরোহিত দশমীতিথির শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, রাজার কোন খোঁজ না পেয়ে শেষে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিলেন। কিন্তু প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হলেও রাজার হাত থেকে পূজা বা পুষ্পাঞ্জলি না নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা দেবীর ছিল না। সেইজন্য রাজা যে পথে শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গিয়েছিলেন দেবীদুর্গা চতুর্ভুজা ব্যাঘ্রবাহনা মূর্তিতে সেই পথে অগ্রসর হলেন; কিছুদূর যাওয়ার পর বনের মধ্যে রাজার সঙ্গে তাঁর

দেখা হলো। দেবী রাজা নহুষকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে পূজা চাইলেন। রাজা বনফুল ও বেলপাতা দিয়ে বনমধ্যে দেবীর পূজা করলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। সেই থেকে এখানে তিনদিন ব্যাপী ভাণ্ডানীদেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছে। পূজার পুরোহিত রাজবংশী অধিকারী বা দেউসী।

অন্য একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, কোচবিহার রাজবাড়ীতে দুর্গা-পূজার পরে বিজয়া দশমীর তিথিতে দেবী দুর্গা মর্ত্য থেকে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন-কালে তাঁর মালপত্রের তত্ত্বাবধানকারিণী ভাণ্ডারনী পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবীকে বাধ্য হয়ে আরও তিন দিন মর্ত্যে অবস্থান করতে হয় এবং এই কারণে তিনদিন ব্যাপী পুনরায় তাঁর পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। ভাণ্ডারনীকে উপলক্ষ্য করে তিনদিন ব্যাপী অতিরিক্ত পূজা করতে হয়, ফলে এই পূজা ভাণ্ডারনী পূজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোচবিহার জেলার নিজতরফ [মৌজা নং : ৭৫] গ্রামেও ভাণ্ডানী পূজায় অনুরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পার্থক্য এই যে দেবী এখানে দ্বিভূজা, ব্যাঘ্রবাহনা এবং গ্রামবাসীদের প্রতি স্বপ্নাদেশ, দেবীর মালপত্রের তত্ত্বাবধায়িকা ভাণ্ডারনী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পূজা দিতে হবে। তিনদিন পরে ভাণ্ডারনী সুস্থ হন। দেবী দুর্গার ভাণ্ডারনীকে উপলক্ষ্য করে এই পূজা প্রবর্তিত হওয়ার জন্য এই দেবী এখানে ভাণ্ডারনী বা ভাণ্ডানী নামে খ্যাতিলাভ করেছেন। নিজতরফ গ্রামে যে স্থানে দেবী রাত্রি যাপন করেছিলেন সেইস্থানে চৌষট্টি বিঘা জমি ভাণ্ডানীদেবীর নামে দেবোত্তর করা আছে। কামাত-চ্যাংরাবান্দা গ্রামে এই দেবীর পূজা পাঁচদিন—একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা হয়—মেলা চলে কোথাও একদিন এবং কোথাও বা তিন-চারদিন পর্যন্ত। আবার জলপাইগুড়ি জেলার পদমতী ও অন্য কয়টি গ্রামে পূজা হয় মাত্র একদিন—শারদীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে। দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীনা, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা—তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। কিন্তু ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডানী গ্রামে দেবীর মূর্তি দ্বিভুজা—ব্যাঘ্র-বাহনা। এই গ্রামের পূজার বিশেষত্ব এই যে, শারদীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে পূজা আরম্ভ হয়ে মধ্যাহ্নেই শেষ হয়। পূজান্তে বলি ও প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এইরূপে কোথাও দ্বিভূজা, কোথাও চতুর্ভুজা এবং কোথাও বা দশভূজা রূপে ভাণ্ডানীদেবীর পূজা দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই

রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মন্ত্রে এই দেবীর পূজা করে থাকেন। অধুনা কোথাও কোথাও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য মতে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান-মন্ত্রে দেবী ভাণ্ডানী পূজা পেতে আরম্ভ করেছেন।

এই সকল কিংবদন্তী, সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারের মানদণ্ডে যতই মূল্যবান মনে হোক না কেন, আসলে এগুলি পরবর্তীকালীন সংযোজনা এবং কোন এক আদিম দেবতাকে আগ্রাসী হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরাণ-কাহিনীর একটা মোহ আছে, সেই মোহে ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলি অতি সহজেই কিংবদন্তীর দ্বারা পূরণ করে নেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই মনে হয় এই সকল কিংবদন্তীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সত্য রূপকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা হল আর্য ও অনার্যের সংগ্রাম এবং অনার্য দেবতাকে আর্যীকরণের প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে ভাণ্ডানীদেবী বনদুর্গা, মহাকাল, সোনারায়, সালশিরি প্রভৃতির ন্যায় একজন আদিম অরণ্য-দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তবে আরও একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। তা-হচ্ছে, দেবীর পূজার সময় এবং বাহন। শরৎকালে যেমন শস্য ও তরিতরকারীর সমারোহ,—ব্যাঘ্রবাহনা হওয়ায় তেমনি বনাঞ্চলের স্মৃতিবহ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, আদিবাসী সাঁওতালদের এক অপদেবতা হলেন 'বাঘুৎবোঙা', মুণ্ডারী ভাষায় 'বাঘাই' শব্দের অর্থ হল 'বিপজ্জনক' আবার **Bag acnom** নামে একটি শব্দ আছে যার মানে হল **a variety of rice plant**—সুন্দর অর্থবহ কথা। এই জন্য শস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় থেকে ভাণ্ডানীদেবীর সৃষ্টি হয়েছে এটা মনে করতে কোন বাধা থাকে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভাণ্ডানীদেবী মূলত দ্বিভুজা এবং ব্যাঘ্রবাহনা ছিলেন। এখন কোন কোন স্থানে তাঁকে চতুর্ভুজা, দশভুজা এবং সিংহবাহনা রূপে পূজা পেতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও দেবী একাকিনী, আবার কোথাও শারদীয়া দুর্গাপূজার মত তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসহ আবির্ভূতা—বাহন সিংহ। জনশ্রুতি এই যে মহিষাসুরকে বধ করে দেবীদুর্গা যখন পুনরায় কন্যারূপে হিমালয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর এতদ্দেশীয় রাজবংশী ভক্তগণ ডুয়ার্স অঞ্চলে তিনদিনব্যাপী তাঁর যে পূজা করেছিলেন তাই ভাণ্ডানী পূজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। লোক-বিশ্বাস যাই হোক না কেন, আদিম দেবতাকে আর্যীকরণের প্রচেষ্টার ফলেই যে ভাণ্ডানী পূজা প্রচলিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ডুয়ার্স [ধূপগুড়ি থানা] থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় ভাণ্ডানী পূজার সঙ্গে বাঘের সংস্রবের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'এত সব বাঘ আইসে মা দুর্গার সিজন।[১]
আগৎ করি দাদা তুমি করহ গমন ॥
গোবাঘা পরথমে আইসে গোঁপে দিয়া তাও।
অষ্টমে[২] পরনাম করে মা ভাণ্ডারনীর পাঁও॥
তারপর আইসে বাঘ দীঘল লেঙ্গুর।
দেবীরে পরনাম করে মেলায় এক ছকুর ॥[৩]
কালাডোরা বাঘ আইসে কুতিয়া কুতিয়া।
তাহারি পরতাপে গাইরস্তের মারা পরে ছোয়া ॥[৪]
ডোরাছোপ বাঘ আইসে থাকে ঝাড়ে ঝোপে।
হাটুয়া পড়ুয়া মানষি মারে গোটে গোটে ॥
তারপর আইসে বাঘ নাম হাকা জাকা।
ছাগল কুত্তা খায় তারা হুহুঙ্কার করিয়া ॥
সাত গণ্ডা ভেড়া খাইলো আটে গটা চারি।
তারপর নিগি খাইলো গাবিন বকরা ॥
বাঘের দাপটে দেশত্ হইল্ বড় সান।
ধানবাড়ীত্ না যায় কাঁহো কামলাকিস্থান ॥
কামলাকিস্থান যদি ভুলি যায় ধানবাড়ী।
বুড়া বাঘে পিটি দিয়া দাবরে আনে বাড়ী ॥
কাঁহো যদি হালুয়া পাঠায় পোঞাতে[৫] জুরিত্ হাল।
বাঘের গোন্দে পালায় গরু ভাঙ্গিয়া জোয়াল ॥
লাঙ্গল ভাঙ্গিল্ জোয়াল ভাঙ্গিল্ আর ভাঙ্গিল্ ঈশ।
তুই ভিতি[৬] তুই গরু পালায় হালুয়া নাই পায় দিশ ॥'

[১. সিজন = সৃষ্টি ; ২. অষ্টমে = সাষ্টাঙ্গে ; ৩. ছকুর = দুপুর, দ্বিপ্রহর ; ৪. ছোয়া = ছেলে ; ৫. পোঞাতে = প্রভাতে ; ৬. ভিতি = দিকে]।

ক্রমে বাঘের উৎপাতে দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো। চাষ আবাদ বন্ধ, হাটেবাজারে যাওয়াও বিপজ্জনক। তখন সকলে পরামর্শ করে দেবী ভাণ্ডানীর পূজার আয়োজন করল। কারণ: 'ভক্তিমতে পূজেন যদি দেবীরে নববেশে / এ দেশ ছাড়িয়া বাগা থাকেন অন্য দেশে ॥'

দেবীর পূজার উপচার সংগ্রহ করা হলো ফুল, বেলপাতা, আমের পল্লব এবং হোমের জন্য আট জাতীয় গাছের খড়ি। বলি দেবার জন্য আনা হল পাঁঠা এবং পায়রা কখনও বলি দেওয়া হয়, আবার কখনও উৎসর্গীকৃত পাঁঠা বা পায়রা হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়াও হয়। এছাড়া হাঁস, চালকুমড়া, আখ এবং বাতাবীলেবুও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। পূজা করেন প্রায় সর্বত্রই রাজবংশী জাতীয় অধিকারী বা দেউসী। ইদানীং কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ পূজকের দ্বারাও পূজা করানো হচ্ছে। অর্থাৎ অনার্যদেবীর আর্যীকরণ সম্পন্ন হচ্ছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তগণ, বিশেষত পাবনা ও মৈমনসিংহ জেলার উদ্বাস্তগণও ভাণ্ডানী পূজা স্থরু করেছেন—রাজবংশীদের সঙ্গে। ফলে কোন কোন স্থানের ভাণ্ডানী পূজায় পূর্ববঙ্গের পূজারীতিও অনুসৃত হতে স্থরু করেছে। এরই নাম সাংস্কৃতিক সমীভবন।

গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় দেবীর মূর্তি তৈরী হল; পূজারীও পূজার জন্য তৈরী হলেন। যিনি জাতিতে রাজবংশী, অধিকারী বা দেউসী। আরম্ভ হল দেবীস্থাপনা, রাজবংশী উপ-ভাষায় বলে, 'বসানি': 'ঘটে আসন ঘটে বসন ঘটেতে মা ভাণ্ডানী তোমার আসন।' তারপরে 'ঠাকুর বসানি' বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা:

'রামনামে বৈস প্রভু কৃষ্ণনামে মহামন্ত্র হইয়া
মা ভাণ্ডানী আপনার থানে জাগ।
আইসত্ বইসত্ থাকত্ মহাদেব জিউ
কৃষ্ণ জীঞ বিষ্ণু জীয়তঃ জীয়তঃ,
আপনার থানে মা ভাণ্ডানী জীয়তঃ জীয়তঃ।'

এর পরেই স্থরু হল আত্মরক্ষা, রাজবংশীগণ যাকে বলে 'বন' [বন্ধ]:

'ডোল বন্ধ ডুলিয়া বন্ধ, বন্ধ কাটাকাটি
গোটে গোট বন্ধ এই থানের ডাকিনী যোগিনী।
বন্ধিনু দুই ঠোঁট হে মা ভাণ্ডানী, এই থানের ডাকিনী যোগিনী
চেট গোয়া মাংলাগে দাঁত কপাটি।'

পূজার মন্ত্র; রাজবংশী উপভাষায় বলে 'নামানি':

'ইছল চুয়ার পিছল পানি/তাতে নামিল মা ভাণ্ডানী ঠাকুরানী।
ছামের যখন টিকা দেবীর কুলার যখন মাং,
স্বর্গ ছাড়ি আয় দেবী সমন্দর পূজায় নাম।

এই পূজা ছাড়িয়া যদি অন্যের পূজায় যাবু,
দোহাই নাগে কার্তিক-গণেশে মুণ্ডু খাবু।
সদন কমলফুল মেঘে করিল্ জট।
তুমি দেবী তুমি কালী তুমি মা ভাণ্ডানী।
এস মাগো ভগবতী রথে করি ভর,
জয় জয় শব্দ দিয়া মাগো বৈস শ্রীঘটের উপর।
ঘটে আসন ঘটে বসন ঘটে মা তোমারি আসন।
বেল পুষ্প হাতে নামো মা স্বর্গ হতে, সিংহাসনে সিংহ আসন
সিংহাসনে মা ভাণ্ডানী তোমার বসন।
হস্তে করি আছে দেবী খাণ্ডাখাড়া লইয়া;
উর্দ্ধমুখে আছে দেবী হেঁটমুণ্ড হইয়া,
পাদ ভরি পূজা পানি দিমু মা ডজার ভরিয়া।'

পূজা শেষ হয়ে গেল। এখন বলি; পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি মানতের পশু-পক্ষী ও দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হল; বলির রক্ত পোড়ামাটির মালসায় ধরে দেবীর সম্মুখে নিবেদন করা হল। অবশেষে শান্তি জল দেওয়া:

'শান্তি শান্তি শান্তি শিবের লিঙ্গের জলের শান্তি,
অল্প পূজায় বিস্তর দেও।
কাছাকাচি না কয়েক মাও বাটে চিরি খাও।
জয় দেবী মাও মোর, মোর উপর মা ভাণ্ডানী হয়া যাইল্ সয়।'

পূজা শেষে দেবীর বিসর্জন। রাজবংশী উপ-ভাষায় দেবীর 'বিদায়ী':

'সারা পুরাটিলের ছাও, পূজা পানি খায়া স্বর্গে যাও।
যদি আসিবে ঘুরিয়া, কার্তিক গণেশের দোহাই লাগিবে বেড়িয়া।
তোর যুকত্ শিব-কন্দপের কালী কন্দে দিয়া হাত,
রক্ষে করিস মা ভাণ্ডানী স্বর্গে তোর মা বাস।'

জলপাইগুড়ি জেলার পদমতী গ্রামে ভাণ্ডানী পূজায় ব্রাহ্মণ্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়। এখানে দেবী ভাণ্ডানী নামে পরিচিতা থাকলেও পুরোহিত বলেন 'বনদুর্গা'। এখানে দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীন, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা, চতুর্হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত এবং উভয় পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক যথাক্রমে পেঁচক, হাঁস, মূষিক ও ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিত। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়:

'ওঁ দেবীং দানবমাতরম্ নিজ সদাঘূর্ণন্মহালোচনাম্।
দংষ্ট্রাভীমমুখী জটানিবিল সন্মৌলীং কপাল স্রজন্।
বন্দে লোক ভয়ঙ্করীং খম রুচিং নাগেন্দ্র হাড়োজ্জ্বালাম্।
সর্পাবদ্ধ নিতম্ববিম্ব বিপুলাং বাণালধনুকি প্রতীম্॥'

'প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী ও একাদশী তিথিতে ভাণ্ডালী বা বনদুর্গা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি এই গ্রামে সর্বজনীন। গ্রামে একটি টিনের ছয় চালাযুক্ত মন্দিরে ভাণ্ডালী দেবীর যথারীতি পূজা হয় এবং পূজার পর সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামে এই ভাণ্ডালী বা বনদুর্গার পূজা প্রচলিত আছে। সম্ভবত ইহা উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের বনানী অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের উপাস্য দেবী'।[৫০]

কথায় বলে 'ভক্তিতে ভগবান বশ' হয়। ভাণ্ডানী দেবীর পূজাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেইজন্য দেখা যায় পূজা যেই শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল পূজার ফল। কৃষির পরম সহায়ক গরু-বিনষ্টকারী বাঘ দূরে পলায়ন করতে সুরু করল; রাজবংশী রমণীগণ গেয়ে উঠলো বাঘ তাড়ানোর গান:

'বাঘায় বলে বাঘুনী, কিসের ঢোল বাজে,
অমুক গাঁয়ের মাইয়া মানষি আইজের রণে সাজে;
বাঘায় কান্দেরে…… · ·· ।
বাঘায় বলে বাঘুনি। ঐ না ঘাটায় যাইও
অমুকের গরু দেইখ্যা, সেলাম জানাইও।
বাঘায় কান্দেরে………· ।
সাজিল্ মাইয়ার দল, হাতে নিল ধনুক ঢাল
মারে তীর হুমদা বাঘের গায়েরে।
মালতী আর ইন্দুবালা, এক হাতত্ ধনুছিলা,
আরো হাতত্ বাছ্যা নেয় বাঘ মারা বাণরে।
বাঘায় কান্দেরে…………… ।'

এই গানের নানা প্রকার পাঠভেদও দেখতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এই সকল ছড়া, গান বা প্রবচন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভাণ্ডানী দেবী বাঘ এবং শস্য সম্পর্কিত দেবী। এই দেবীর পূজা যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১. A. A. Macdonnel : *Vedic Mythology* : p. 75.
২. E. W. Hopkins : *The Religion of India* : p. 35.
৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' : পৃ. ৪-৫।
৪. E. J. H. Mackey : *Further Excavations at Mohenjodoro* : Vol II : p. 347.
৫. 'গৌড়বার্তা' : ৬ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা : পৃ. ২।
৬. *Epigraphia Indica* : Vol xv [1919-20] : p. 140.
৭ B. M. Barua : *Barput* : Book III : plates LXIV, 75 ; LXV, 76 ; XXIII, 9 ; and Sudhakar Chatterjee : *The Evolution of Theistic Sects in Ancient India* : pp 101-02.
৮. *Martin's Eastern India* : Vol-v : পৃ. ৬৭১।
৯. মৈত্রেয়ী দেবী : 'পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ' : পৃ. ৯৬।
১০. ভক্তি বিশ্বাস : 'অপরিচিত প্রতিবেশী ভুটান' : পৃ. ২১-২।
১১. P. D. Choudhury : 'Image of Goddess on a tiger. A sword placed on a pedestral is regarded as the goddess'. : *Archeology in Assam* : p. 32.
১২. পশ্চিমবঙ্গ প্রত্ন-অধিকার : 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' : ৪১-২।
১৩. J. A. S. B. : New Series [1939] : Vol v : p. 259-60.
১৪. নৃপেন পাল সম্পাদিত 'মহারাজ বংশাবলী' : পৃ. ১৭।
১৫. 'কোচবিহার সাহিত্যসভা পত্রিকা' [১৩৮৫] : ১ম সংখ্যা : পৃ. ১৬।
১৬. Daniel Wright : *History of Nepal* : p 38.
১৭. 'প্রবাসী' পত্রিকা [১৩২৯ : আষাঢ়] : পৃ. ৩৪০-৫১।
১৮. Dalton : *Descriptive Ethnology of Bengal* : pp. 200-01.
১৯. বিশ্বভারতী : 'সাহিত্য প্রকাশিকা' : ৪র্থ খণ্ড : পৃ. ৪৬।
২০. ঐ : ঐ : ঐ : পৃ. ৭৮।
২১. A. Mukherjee : *Indian Primitive Art* : p. xvii.
২২. *Primitive Culture* : Vol II : p. 237-8.
২৩. ড. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালীর ইতিহাস' : আদিপর্ব : পৃ. ৮৫।
২৪. J. D. L. ; Vol. VIII : p. 141-206 এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [১৩১৯] : পৃ. ১৬৭-৭০।
২৫. 'জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ' : পৃ. ২০৬।
২৬. রজনীকান্ত চক্রবর্তী : 'গৌড়ের ইতিহাস' : ২য় খণ্ড : পৃ. ৭৮।

২৭. প্রভাসচন্দ্র সেন : 'বগুড়ার ইতিহাস' : পৃ. ৪৪।

২৮. এম. এ. রহমানী : 'হায়াতে একরাম' : পৃ. ১৩।

২৯. ঐ : ঐ : পৃ. ২০৭।

৩০. ঐ : ঐ : পৃ. ১১৩-৪।

৩১. বিশ্বভারতী : 'পুঁথি পরিচয়' : ২য় খণ্ড : পৃ. ৩৭৮।

৩২. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' : ৩য় খণ্ড : পৃ. ৫০৩।

৩৩. Dr. C. Sannyal : *The Meches and The Totos* : পৃ. ৭৪।

৩৪. 'মধুপর্ণী' : বসন্ত সংখ্যা [১৩৮৪] : পৃ ৯-১৮ এবং 'প্রবাসী' : ফাল্গুন [১৩১৮] । পৃ. ৪৮২-৬।

৪৫. 'নবলিপি' : [৩ বর্ষ : ২ সংখ্যা] : পৃ. ১২-৮।

৩৬ দ্র. ৮নং পাদটীকা : পৃ. ৪৪১।

৩৭. দ্র. ৩৭নং পাদটীকা : বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা : পৃ. ১২৩।

৩৮. 'ত্রিবৃত্ত' : ১৫ই কার্তিক : ১৩৮০।

৩৯. দ্র. ১৯নং পাদটীকা : পৃ. ২৩৫।

৪০. 'বঙ্গীয় জীবনী-কোষ' : পৃ. ১৩১।

৪১. অধ্যাপক ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪২. দ্র. ৩৭নং পাদটীকা : পৃ. ১২৫।

৪৩. শারদীয় 'উত্তরমেঘ' [১৩৮৪] পৃ. ১-৭।

৪৪. 'চতুষ্কোণ' : [চৈত্র : ১৩৮৩] : পৃ. ৯০১।

৪৫. 'কোচবিহার দর্পণ' : [১।৬।১৩৪৮] : পৃ. ১৩১।

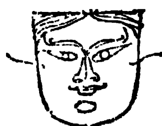
৪৬। 'উত্তর সৈকত' : [শারদীয় সংখ্যা : ১৩৮৪] : পৃ. ১-৬।

৪৭. Dr. C. Sannyal : *The Rajbansis of North Bengal* : পৃ. ১৪২।

৪৮. ড. গিরিজাশঙ্কর রায় : 'রাজবংশী দেবদেবীর পূজা-পার্বণ' : পৃ. ৫৫।

৪৯. 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা : 'চণ্ডীদেবীর স্বরূপ' [আশ্বিন ১৩৬৬]।

৫০. অশোক মিত্র : 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' : ১ খণ্ড : ২২১।



দক্ষিণরায়

[ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত একটি লোক-দেবতা]

ড. দুলাল চৌধুরী

প্রথম পর্ব

এক : প্রস্তাবনা

দক্ষিণরায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একজন বহু আলোচিত লৌকিক দেবতা। বিভিন্ন গবেষক এই লৌকিক দেবতাকে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। নৃ-বিজ্ঞানী থেকে প্রত্ন-অনুসন্ধিৎসু সকলেই আপন আপন কক্ষ থেকে দক্ষিণরায়কে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ফলে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়েছে এই আলোচনা—রসে ও রূপে। আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণরায়কে জ্ঞাতি-বিদ্যার আলোকে সাম্প্রতিক প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বিচার করার চেষ্টা করা হবে। যেহেতু কোন জ্ঞানই সীমান্তিক নয়, সেজন্য বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে যে আলোচনা আমি শেষ করব, আগামী বছরগুলিতে হয়ত নবাবিষ্কৃত তথ্য এসে আমাদের বর্তমান বক্তব্যকে অতিক্রম করে যাবে। এটাই স্বাভাবিক বিদ্যা-চর্চার প্রবাহ। অতএব আমার বক্তব্য চূড়ান্ত এ দাবী আমার নেই। বরং আমার এই আলোচনার স্রোত আগামী দিনের বিদগ্ধ আলোচনায় চরিতার্থ হোক; তাতেই আমার আনন্দ।

আলোচনার শুরুতেই অন্যান্যরা এই দেবতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেবিষয়ে একটু সিংহাবলোকন করা যাক। মুন্সী বয়নুদ্দীনের 'বনবিবির জহুরা-নামায়' দক্ষিণরায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: ১. 'দণ্ডবক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান / দক্ষিণরায় নাম আমি তাহার সন্তান।' দক্ষিণরায় ধনা মৌলেকে স্বপ্নে বললেন: 'যদি তুমি নরবলি-পূজা পার দিতে / সাত-ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে।'

২. কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'কাব্যে দক্ষিণরায় আপন পরিচয়ে বলেছেন:

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায়

আঠারো-ভাটিতে পূজে সবে।

পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে ॥

৩. ড. সুকুমার সেন শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রায়মঙ্গল'[১] কাব্যের ভূমিকাতে লিখেছেন : "দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্র দেবতা আমি বলেছি, এবং এ উক্তি আমার মৌলিক গবেষণালব্ধ নয়। সকলেই বলেছেন ও বলেন। এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি নয়।......'ব্যাঘ্রদেবতা' কথাটির দু-রকম মানে হতে পারে। এক. ব্যাঘ্রের দেবতা—অর্থাৎ বাঘের ঠাকুর। দুই. ব্যাঘ্ররূপী দেবতা। দ্বিতীয় অর্থে দক্ষিণরায় কিছুতেই ব্যাঘ্রদেবতা নন। প্রথম অর্থেও তাঁকে ব্যাঘ্রদেবতা বলা চলে না। দক্ষিণরায় দক্ষিণ দেশের রাজা। কৃষ্ণরাম তাঁকে বলেছেন 'দক্ষিণের ভূপ।' দক্ষিণ দেশ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘই প্রধান হিংস্র জন্তু তাই স্বভাবতই বাঘ রায়ের প্রধান শক্তি"।'[২]

৪. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, : 'ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের মত কুমীরের দেবতা কালুরায়ের পূজা নিম্নবঙ্গের প্রধানতঃ সুন্দরবন ও তাহার সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের লোকোৎসব।'[৩] তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণরাজ বা দক্ষিণরায়।' 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [৫ম সংস্করণ] পৃঃ ৮২৬। তিনি আরো বলেছেন : 'ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজাও পশু পূজার অন্তর্গত।'

৫. কালিদাস দত্ত লিখেছেন, 'গাজির ভয়ে ভীত হইয়া মুকুট রায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তৎকালীন শক্তিশালী হিন্দু নেতা দক্ষিণ রায়ের শরণাপন্ন হন এবং তিনি তাঁহার পক্ষে খনিয়াতে গাজির সহিত যুদ্ধ করেন।' [বড় খাঁ গাজির গান / 'ভারতীয় লোকযান' Vol. III / No. I / ১৯৬৩][৪]

৬. শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, 'কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপাল হিসাবে, অরণ্য অঞ্চলের বাইরে বাস্তু ভিটা প্রতিষ্ঠা কালে, ব্যাঘ্র ভয় নিবারণের জন্য, কুমীর আক্রমণের ভয় নিবারণ করিবার জন্য দক্ষিণ রায়ের পূজা করা হয়।' 'সুন্দরবন অঞ্চলে যে দেবতাটির পূজা প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে নব নাম বা আকৃতি গ্রহণ করলেও তিনি যে আদিতে ব্যাঘ্রদেবতা তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৫]

৭. সম্প্রতি সংগৃহীত এক পালাগানের পুঁথিতে[৬] বলা হয়েছে : 'পাত্র-মিত্র বলে রাজা শুনহ বচন। / দক্ষিণরায়ের বাহন তবে যত শার্দুলগণ॥' এই কাব্যেরই বন্দনাংশে দ্বিজ ভৃগুরাম আরও বলেছেন : 'অবনী লোটায় কায়

বন্দিলাম দক্ষিণরায় করলো বাঘে আরোহণ। / রূপারায়-কালুরায় বন্দিলাম দোঁহার পায় একত্রে ভাই তিনজন ॥'

৮. প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন: 'দক্ষিণরায় যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর।'[৭] তিনি আরও বলেছেন: 'দক্ষিণরায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা'।[৮]

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন: 'স্বধর্মনিষ্ঠ মুকুট রায় প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য করিতেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তাঁহার আত্মীয় ও সেনাপতি দক্ষিণরায়।'[৯] ঐ গ্রন্থেই মিত্র মহাশয় এক মুসলমানী পুঁথি থেকে এইরকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোসাঞি / তার সমতুল বীর ত্রিভুবনে নাই।'

১০. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: 'দক্ষিণরায় একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন।'

১১. ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন: 'এই দেবতাটি একটি অপৌরাণিক বনদেবতা।'

১২. বিমলাচরণ বটব্যাল লিখেছেন: 'দক্ষিণরায়ের উৎস রহস্যাচ্ছন্ন'। ইনি আদিম যুগের বনদেবতা'।[১০]

১৩. গুরুসদয় দত্ত ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন: দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা [God of tigers]।[১১]

১৪. ড নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'সর্প ও ব্যাঘ্র ভীতি থেকেই মধ্যযুগে মনসা পূজা এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্রদেবতা পূজার বিস্তৃত প্রচলন'।[১২]

১৫. স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন: 'সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত এক মৃৎফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে দেখতে পাওয়া যায় দুটি ব্যাঘ্রের মাঝে রুদ্র, রুদ্রের মাথায় কিরণছটা, রুদ্র হলেন পশুপতি। ভারতে ব্যাঘ্রই পশুপতি—সিংহ নয়—এই রুদ্রই বঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়।[১৩]

১৬. বিনয় ঘোষ বলেছেন: "দক্ষিণবঙ্গের 'দক্ষিণরায়' মানুষ নন, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা। ['বাঘের দেবতা' কথার অর্থ ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নয়। বাঘের উপর আধিপত্য যাঁর বেশি, তিনিই বাঘের দেবতারূপে কল্পিত দক্ষিণরায়।"][১৪]

১৭. ড. পঞ্চানন মণ্ডল দক্ষিণরায়ের নিম্নলিখিত রূপ-সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন: দক্ষিণ রায়= ১. রায়মল্ল। ২. ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত। ৩. মুণ্ডমূর্তি। ৪. কুম্ভপুরুষ—বারা প্রতীক। ৫. ক্ষেত্রপাল—শিবসুত।[১৫]

১৮. সুধাংশুকুমার রায় লিখেছেন: 'দক্ষিণ-দার দক্ষিণ প্রদেশের অধিপতি এবং বদিন-দার ছিলেন উত্তর দেশের অধিশ্বর।' তাঁর আরও অভিমত, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে বঙ্গে দুটি অঞ্চল ছিল—একটি দক্ষিণ-দেশ অন্যটি উত্তরদেশ। এই দেব-মুণ্ডগুলি মূলতঃ হারানো বাংলার দুই অঞ্চলের অধিশ্বরদের।[১৬]

১৯. ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'স্থানকাল ভেদে এবং উচ্চ সমাজ ও শাস্ত্রীয় পৌরাণিকতার প্রভাবে যে নাম বা রূপেই, পরবর্তী অধ্যায়ে, দক্ষিণ রায়কে বর্ণিত করার চেষ্টা হোক না কেন, দক্ষিণরায় যে মৌলিক উৎসে মুণ্ড-বিশেষ এবং মৌলিক তাৎপর্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট উর্বরতা জাদু-বিশ্বাসজাত লৌকিক দেবতা এ সত্য অনস্বীকার্য।[১৭]

২০. অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র বলেছেন: 'শুধু এইটুকুই বললেই যথেষ্ট হবে যে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের কৃষিজীবী-সম্প্রদায় তাঁদের ফসল তোলার সূচনায় সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের মুণ্ড পূজা করেন—যে মুণ্ড শনির কোপ দৃষ্টিতে [যমের] দক্ষিণ দুয়ারের দিকে উড়ে গিয়েছিল। একে ক্ষেত্রপালের পূজা বলে গ্রহণ করতেও আপত্তি দেখি না।'[১৮]

২১. **'Dakshin Roy is worshipped in the Southern part of 24 Parganas. But his class character is revealed in the Bana-bibi episode. He exacts human life as rent. He is ranked with a Royal Bengal Tiger.'**[১৯]

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আরো অনেক গবেষক কাজ করেছেন বা করছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সবগুলির আপাত প্রয়োজন নেই। পাঠক ও অনুসন্ধিৎসুদের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য এই সিংহবলোকন প্রয়োজন ছিল। এবার ক্রমপর্যায়ে আমি সুন্দরবনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, জনবিন্যাস, সমাজ, সাহিত্য, লোকাচার, দক্ষিণরায় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সমীক্ষালব্ধ তথ্যাদি, দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর, বারা-শব্দার্থ, মূর্তি-প্রকরণ, বিস্তার ক্ষেত্র, অনুমান ও সিদ্ধান্ত, চিত্রাবলী উপস্থিত করব। দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুরকে নিয়ে এ-যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে,তাতে আমার মনে হয়েছে,

কোথাও সামগ্রিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে, লোকসংস্কৃতি-রেণু বিচার করে দেখা হয়নি। ফলে খণ্ড খণ্ড রূপ আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েছে। যে কোন সংস্কৃতি-বলয়ে এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপকরণ জনমানসের অনিবার্য আবেগে ও প্রয়োজনে উদ্গত হয়। সুন্দরবনেও দক্ষিণ-রায়, বারা ঠাকুর, বড়খাঁ গাজী, বনবিবি বা নারায়ণী, কালুরায় ইত্যাদি লৌকিক দেবতা সমকালীন সমাজ-মানুষের কর্ম এবং ধর্ম-প্রয়োজনে বিকশিত হয়েছে। একটি স্থানিক, কালিক ধারণা বা মনন কখনও কোন সমাজে ধ্রুব নয়। কারণ সংস্কৃতির রেণু অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সতত চঞ্চলা। মানুষের নিরন্তর প্রবাহ পথে কালে কালে সমাজের যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সমাজান্তর্গত মানস ফসলের ও বস্তুগত রূপের একটা যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত রূপান্তর ঘটেছে। সমাজ সৃষ্টির মূল প্রেরণায় রয়েছে মানুষের আত্মসংরক্ষণের তাগিদ। শ্রম ও বুদ্ধির নিরন্তর আপেক্ষিক সমন্বয়ে ও প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে সে মানুষ দেশ-কালের অবিচ্ছিন্ন ধারায় নিজেকে ভূমিমৌল সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলাহরণ, ফলচয়ন থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন প্রয়োজনে অধি-মানসিকতার ব্যাবহারিক প্রয়োগে আপন আপন স্বভাব-সমৃদ্ধ প্রকৃতি ও বস্তু-লগ্ন এক একটি দেব-দেবীর সৃষ্টি করেছে। লোকায়ত সমাজে দেব-দেবী একান্তভাবে মৃত্তিকালগ্ন; স্বর্গাশ্রয়ী নয়। বরং স্বর্গের দেবতা মানুষের কাছে কাতরভাবে পূজা প্রার্থনা করেছে [মনসা স্মর্তব্য]। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র-লোনাভূমি ও অরণ্যাঞ্চলের শ্বাপদসঙ্কুল বিভীষিকা মানুষকে [প্রাচীন বাঙ্গালী] করেছিল বিহ্বল। তাই তাৎক্ষণিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘাতে সৃষ্টি করেছে আপন আত্মরূপঋদ্ধ দেবতা। কালের তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংঘাত-সমন্বয়ে দেবকুল ক্রমশঃ পেয়েছে বৃদ্ধি। প্রথমে সংঘর্ষ, পরে আপোষ ও শান্তি—এই বিচিত্র লীলারই কাব্য লেখা আছে সুন্দরবনে।

দুই : সুন্দরবন ও চব্বিশ পরগণার প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমিকা

সমগ্র সুন্দরবনের আয়তন চোদ্দ হাজার বর্গমাইল। চব্বিশ পরগণা জেলায় সুন্দরবনের আয়তন ৭.৯১ হেক্টর। জনসংখ্যা ১৫,৩২,১০২ জন। সুন্দরবন ভারত বিভাগের পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় অংশে রয়েছে চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথর-প্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, কুলতলি,

ক্যানিং, বাসন্তি, গোসাবা, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালি। একশত তেষট্টি লাটে [Lot] সুন্দরবনাঞ্চল বিভক্ত।

'সুন্দরবন' নাম কবে থেকে প্রচলিত, তা ইতিহাসে লেখা নেই। প্রচুর 'সুন্দরী' [Heretiera Thyron] বা সুঁদরীগাছ এখানে জন্মাত বলেই এই বন-ভূমিকে বলা হয়েছে সুন্দরবন।[২০] কেউ কেউ মনে করেন 'সমুদ্রবন' বা 'চন্দ্রদ্বীপ বন' থেকে হয়েছে সুন্দরবন। আবার কেউ মনে করেন 'চণ্ডভাণ্ড' নামে বন্যজাতি থেকে হয়েছে সুন্দরবন [চণ্ডভাণ্ড=চন্‌বন্‌=চুন্‌বন=চুনরবন=সুন্দরবন]। জোয়ারের সময় বনভূমি জলে ডুবে যেত আবার ভাঁটির টানে জেগে উঠত বলেও এই বনাঞ্চলকে বলা হত 'ভাঁটিদেশ'। সপ্তদশ শতকের পূর্বেও এই নাম প্রচলিত ছিল।[২১] অধুনা যে বিস্তৃত অঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত একদা সেই ভূমিতেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা। এমন কি কোলাহল মুখর বন্দরও ছিল। "পৌরাণিক যুগে পাতাল, রসাতল বা ম্লেচ্ছরাজ্য, মৌর্য ও গুপ্ত যুগে 'গংগারিডি', পাল ও সেনযুগে 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে এবং বিভিন্ন সময়ে 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'গৌড়', 'ত্রিপুরা', 'যশোহর' প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং বাণিজ্য গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে এই অঞ্চল উন্নতি-শিখরে আরোহণ করেছিল। মোগল যুগের প্রতাপাদিত্য এখানকার সর্বশেষ স্বাধীন নৃপতি"।[২২] সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রাচীনত্বের কতকগুলি স্মারকচিহ্ন আজও জীবন্ত রয়েছে।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই মনে করেন 'customs die hard'—লোকাচার অমর। এখানে কয়েকটি লোকাচারের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। যেমন, ছত্রভোগ ও বোড়ালের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী। চতুর্ভুজা, রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণা, রক্তবর্ণাম্বর পরিহিতা, দক্ষিণ-উর্ধ্ব করে কর্কট মুদ্রা। একদা তিনি তান্ত্রিক বিধানে পূজিতা হতেন। ছাগবলি, মদ্য নৈবেদ্য দেবার রীতি ছিল। বলি প্রদত্ত ছাগমুণ্ড নেবার জন্য স্থানীয় লোকেরা কাড়াকাড়ি করতেন। স্থানীয় লোকেরা এই রীতিকে বলতেন 'হুড়'। এর অর্থ যুদ্ধ।[২৩] যেমন,হুড়াহুড়ি। এই লোকাচার নিঃসন্দেহে আদিমতার অভিজ্ঞান। বঙ্গভূমির কোমাচারের নিদর্শন।

প্রসঙ্গত, ডি. ব্যারো ও ভ্যানডেন ব্রোকের মানচিত্রে বঙ্গোপসাগর সন্নিকটে পাঁচটি সমৃদ্ধশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম নগরী হলো 'ভি টিপোরা'। বাক্‌লার [বর্তমান খুলনার নিকটবর্তী/বাংলাদেশ] কাছে 'টিপোরিয়া' নামে এক জনপদ ছিল। সতীশচন্দ্র

মিত্র মনে করেন, টিপোরা আসলে 'ত্রিপুরা'। পর্তুগীজ ভাষায় 'টিপোরা' হয়েছে।[২৪] ত্রিপুরা শব্দ 'তুইপ্রা' থেকে আগত। 'তুই' শব্দের অর্থ 'জল' সম্ভবত 'তোয়া' শব্দাগত। [তু. 'করতোয়া']। 'প্রা' শব্দের অর্থ 'আকাশ'। 'জল ও আকাশ' যেখানে যুক্ত—তাই 'তুইপ্রা'।

বর্তমান ত্রিপুরার সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকাচারের একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবাড়িতে [আগরতলায়] 'চতুর্দশ দেবতার' মুণ্ড প্রতীক পুজার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে ত্রিপুরাবাসী এই লোকাচারকে 'ঋষি' ও 'কের' বলেন। 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'খাড়ি' এবং 'কের' শব্দার্থ হলো 'ঘের'।[২৫] খাড়ি সুন্দরবনে সুপরিচিত অঞ্চল, আর ঘের বা ঘেরী হলো মাটির বাঁধে ঘেরা ভূমি। সুন্দরবনে এই ধরণের বহু ভূমি আছে। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার মুণ্ড প্রতীকের সঙ্গে সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের বারামুণ্ড মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন সুন্দর বনাঞ্চলে একদা কিরাত গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করতেন। ত্রিপুরায় এই গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। অবশ্য প্রাচীন সেই জনগোষ্ঠীর সঠিক ঠিকানা আজও জানা যায়নি।

রায়দীঘির কাছে প্রাপ্ত 'জটার দেউল', হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতার [ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই] প্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন—পাথরের ছেদনাস্ত্র, হাতুড়ি, তুরপুণ, হাড়িকুড়ি, ভগ্ন মূর্তিগুলি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ন উপকরণ। বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলিও একই সাক্ষ্য বহন করে। মহাভারতে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী জনদের বলা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ'? আজকের বাংলার হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, চণ্ডাল এরাই ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ভুক্ত [?]। চণ্ডালেরা [বাংলাদেশের বর্তমান নমঃশূদ্র] নৃ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিষাদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খৃঃপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গঙ্গাবন্দর [গঙ্গারিডি / Gangaridae] বা গঙ্গারাষ্ট্র থেকে রোমে মসলিন রপ্তানি করা হত। বুদ্ধদেবের যুগে বিজয়সিংহ এখান থেকেই তাম্রপর্ণী ও লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করেছিলেন। মুঘলযুগে রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও মগ, পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গিদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে এই বন্দর ও জনপদ জনশূন্য হয়ে যায়। সম্ভবত মন্বন্তর ও প্লাবনে বিপর্যস্ত অধিবাসীরা আত্মরক্ষার্থে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলার উত্তরে বা পূর্বে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পার্জিটার[২৬] তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে বলেছেন, বার বার প্লাবনে সুন্দরবনাঞ্চল শস্যশূন্য হয়েছিল এবং সরকারের রাজস্ব এই অঞ্চল থেকে ক্রমাগত কমে যেতে থাকে। গঙ্গানদীর প্রধান জলস্রোত

ভাগীরথী থেকে পদ্মার দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিপ্লাবিত হয়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে আরো জনশূন্য হয়ে পড়ে সুন্দরবন।[২৭]

ঐতিহাসিক এবং ভূতত্ত্ববিদ্ টলেমির [Ptolemy] মানচিত্রে দক্ষিণ সাগর তীরবর্তী কয়েকটি বাণিজ্য বন্দরের উল্লেখ আছে। যেমন তাম্রলিপ্তি, পোলরা গঙ্গারিডি, ও তিলোগ্রামন। বর্তমান তমলুক, মগরাহাট, বাঘেরহাট ইত্যাদি সেই প্রাচীন বন্দরের আধুনিক স্মৃতি। আজকের সুন্দরবনাঞ্চলে বা বঙ্গোপ-সাগরতীরের সমুদ্রজীবী মৎস্য শিকারীরা কোনো হারানো আদিম জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী হতে পারেন।[২৮] গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগে ছিল না। সেখানে ছিল উত্তাল সমুদ্র। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তখন ছিল সমুদ্রগর্ভে। উয়াঙ চুয়াঙ ভারত ভ্রমণকালে সমতট ও কামরূপের মধ্যে সহস্রক্রোশ ব্যাপ্ত হ্রদ দেখতে পেয়েছিলেন। একদা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নাম ছিল 'বকদ্বীপ'। বৌদ্ধ আমলে 'বগদী' এবং সেনরাজাদের সময়ে 'বাগড়ি' বা ব্যাঘ্রতটি [Tiger coast]। ব্যাঘ্রের প্রাচুর্যের জন্যই এই নাম।

'রায়মঙ্গল, পাঠে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, কালীঘাটের দক্ষিণে, প্রাচীন আদিগঙ্গা নদীর পূর্বাংশে অবস্থিত মেদনমল পরগণার শাসনভার রাজা মদন রায় নামে জনৈক ভূস্বামীর উপর অর্পিত ছিল। সেই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করতেন।[২৯] আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে এই দক্ষিণাঞ্চল সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁর অধীনে ছিল। সরকার সাতগাঁ তখন ৫৩টি মহালে বিভক্ত ছিল।[৩০]

রায়মঙ্গলে বর্ণিত [সপ্তদশ শতকের] আদি-গঙ্গাপ্রবাহের তীরলগ্ন রাজপুর [প্রাচীন বরদা ?], কল্যাণপুর, ডিহিমেদনমল, হোগ্‌লা, পাথরঘাটা, ও দক্ষিণ বারাসাত, খনিয়া [প্রাচীন খাদ—গঙ্গারবাদা নামক নিম্নভূমিলগ্ন স্থান], ছত্রভোগ, কাকদ্বীপ, গজামুড়ি, মগরা প্রভৃতি জনপদ আজও কিছু কিছু অতীত স্মৃতিসহ বর্তমান। অবশ্য গোজানা, ধামাই-বেতাই, গজামুড়ি, টিয়াখাল ও ও গঙ্গাদ্বার ইত্যাদি হারিয়ে গেছে কালের রথচক্রতলে। বড়ুক্ষেত্রের [বর্তমান বহড়ু] অম্বুলিঙ্গ [শিব], দক্ষিণ বারাসাতের আদিমহেশ, বারুইপুরের বিশালাক্ষী, কল্যাণপুরের কল্যাণ-মাধব শিব এখনও বর্তমান। নানা প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রিক উপপ্লবের ফলে সুন্দরবন বার বার জনশূন্য হয়েছে।[৩১] এখনও আটিসারা, মজিলপুর, বারুইপুর, ছত্রভোগ,

বেড়াচাঁপা, দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর থেকে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক, প্রত্ন-সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে।

তিন : জনবিন্যাস ও লোকসমাজ : সেকাল ও একাল

ডি. ব্যারোর মানচিত্রে সুন্দরবনে পাঁচটি নগরীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন—কুইপিটাভীজ, নলদী, ডাপারা, প্যাকাকুলি, ও টিপারিয়া। 'কুইপিটাভিজ' সম্ভবত খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট। কুইপিট=খলিফাত, আভাজ=আবাদ। ভ্যান-ডেন-ব্রুক ও ও'মালী এই মত সমর্থন করেন। সুন্দরবনে জনবসতির অথবা জনসমাবেশের পর্যায়ক্রমে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। যেমন :

ক. দ্রাবিড়, মঙ্গোল, অষ্ট্রোলয়েড ও ভেড্ডিড [অধিকাংশই ভাষাগোষ্ঠী]।

খ. নিষাদ, কিরাত ও দামিল।

গ. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা তপশীলীভুক্ত হিন্দু, মাহিষ্য, মুসলমান প্রভৃতি।

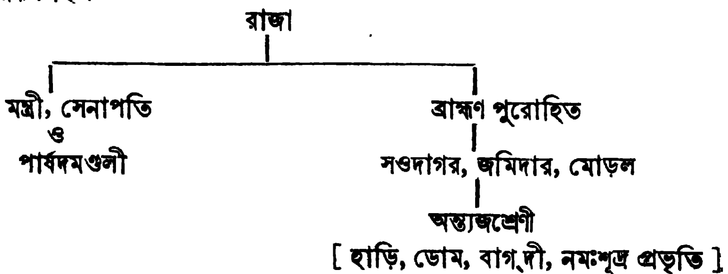
রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে বসন্ত রায় সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে-ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন নমঃশূদ্ররাই তাঁর সহায় ছিল। প্রতাপাদিত্য বাংলার বারভুঞাদের মধ্যে অন্যতম। ভুঞা শব্দের অর্থ ভূঁইমালি বা ভৌমিক, রাজা। রঘুবংশে সুন্দরবনাঞ্চলের বা দক্ষিণবঙ্গের লোকদের বলা হয়েছে, ধান্যচাষী এবং নৌজীবী। দামিল জাতি প্রসঙ্গে 'ভোল্গা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থে রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন বলেছেন, 'এই দামিল জাতি চাষবাস ও শিল্পকার্যে বেশ দক্ষ ছিল। গ্রাম প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম কীর্তি।' পুণ্ড্ররা সমুদ্র উপকূলে বসবাস করত। পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ রূপ হলো পুঁড়া বা পোদ। পুণ্ড্রগণ অনার্য। চণ্ডালরা বরেন্দ্রভূমি থেকে উপবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। চণ্ডালদের অন্যনাম নমঃশূদ্র। সম্ভবত এরাই সুন্দরবনে ঐতিহাসিক কালের আদিম বাসিন্দা। 'গোপীচাঁদের গানে' ভাটি দেশের 'বাঙ্গাল' নামক এক জনগোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ['ভাটি হইতে আইলা বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ী']

'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গ' বা 'বাং' নামে যে জনগোষ্ঠী একদা বঙ্গভূমিতে বাস করত তাদের নামের সঙ্গে 'আল' [বাঁধ] যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বাঙ্গাল'। হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' ও যশোধরের 'জয়মঙ্গলে' ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলকে 'বঙ্গ' বলে উল্লিখিত। বিচ্ছিন্ন উল্লেখ ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট তথ্য এই

প্রসঙ্গে দুর্লভ। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের পূর্বেকার বঙ্গভূমির ইতিহাস আজও কুয়াশাচ্ছন্ন।

দক্ষিণবঙ্গে বা সুন্দরবনাঞ্চলে বা সাগর উপকূলে জনবসতি বার বার বন্যায়, ঝড়ে বা জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত হয়েছে। সেখানকার আদি বাসিন্দারা ঝড়ের কারণে হয় স্থানত্যাগ করেছেন, নয়ত জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কথা লিখেছেন। তখন বহুলোক প্রাণ হারায়। এমনকি বাকলারাজ জগদানন্দ রায়ও প্রাণ হারান। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনে প্রবল ঝড় হয়। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্লাবন ও ঝড়ে সুন্দরবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আবার প্রচণ্ড ঝড় ও জলস্ফীতি ঘটে এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে মহামারীতে সুন্দরবন, বাখেরগঞ্জ জনশূন্য হয়ে পড়ে। ১৮২২ থেকে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে মধ্যে আরো চারবার ঝড়, বন্যা, প্লাবন সংঘটিত হয়। ফলে পুনঃপুনঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের জনবসতির ইতিহাস গতিচঞ্চল। পার্জিটার তাঁর খাজনা সংক্রান্ত বিবরণীতে তাই সুন্দরবনের অবনমন ও খাজনা হ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনে জন-সমাজের স্থানান্তরণ ঘটেছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেও অনুরূপ জনপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

নিষাদ, কিরাত ও বাগ্‌দীরা যশোহর, খুলনা, ও ব্যাঘ্রতটিতে সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করত। বুদ্ধদেবের সময়ে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত হয় এবং অনেকে বৌদ্ধ হয়ে যান। মাহিষ্য, কপালি, নমঃশূদ্র, যোগী, ভড়ং, তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অনেকেই বৌদ্ধ হয়েছিলেন। এর সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করত কায়স্থ, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য জাতির লোকেরা। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কাল থেকে সুন্দরবন ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গ্রাম্য-সমাজ কাঠামো নিম্নরূপ ছিল:



চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েক হাজার জন পৌণ্ড্র আছেন। তাদের পেশা, মৎস্য শিকার, চাষ-আবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পৌণ্ড্রদের পর মৌলে, বাউলে, কাঠুরেরাই সুন্দরবনের গহন বনচারী মানুষ। বাউলেরা মূলত গুণিন। গুণের বাউলে ও হুকুমের বাউলে। এরাই বনবন্দী ও বাঘবন্দীর মন্ত্রজ্ঞ। এরাই জঙ্গলের গুরু। পীর, ফকির, বনের দেবতা এদের অন্তরঙ্গ সহচর।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কথা। প্রাচীর বাংলায় যে কটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম। গুপ্ত যুগের শিলালিপিতে প্রথম উল্লিখিত পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি পাল ও সেন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন। হিমালয় থেকে সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল।[৩৩] লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন দানপত্রে খাড়ির উল্লেখ রয়েছে। ডাকার্ণবে একষট্টি পীঠের অন্যতম বলা হয়েছে খাড়ি অঞ্চলকে। পৌণ্ড্রজনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, 'পৌণ্ড্ররা হলেন অবনমিত ক্ষত্রিয়। তারা হলো দ্রাবিড়, সাইথীয়ান, চীনা ও অন্যান্য বহিরাগত জনগোষ্ঠীর সমগ্রোত্রীয়'।[৩৪] "বঙ্গজাতি যেমন কার্পাস চাষের ও বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল, পুণ্ড্র জাতি তেমনি আখচাষের ও গুড়শিল্পের এবং রেশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ এক জাতের আখ। এখনও দেশি আখের নাম 'পুঁড়ি' [=পৌণ্ড্রিক]। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন 'গৌড়' দেশনামটি 'গুড়' থেকে উদ্ভূত। সুতরাং পুণ্ড্র [পৌণ্ড্র] নামের সঙ্গে সম্পর্কিত।" [ডঃ সুকুমার সেন : 'বঙ্গভূমিকা' ১৯৭৪, পৃ. ৯]

বর্তমান তপশীলভুক্ত হিন্দু ও আদিবাসী জনসংখ্যার [২৪ পরগণা, সুন্দরবনসহ] অনুপাত নিম্নরূপ :

	তপশীলভুক্ত হিন্দু		তপশীলভুক্ত আদিবাসী
বনগাঁ মহকুমা :	১৭০,৫৮১	:	১১,৬৭০
বারাসাত মহকুমা	১৩৩,৬১৫	:	৯,১৫২
ব্যারাকপুর মহকুমা	১০৩,৬৭৬	:	৭,৪২৯
সদর	৩৯৭,৪৮০	:	২৮,৬৪৫
বসিরহাট	৩৭৪,৩৯৭	:	৭৫,৪১০
ডায়মণ্ডহারবার	৪৩১,০৫৮	:	৪,৮৯১
বনাঞ্চল	১,২৩৯	:	১০২

মোট জনসংখ্যা : [হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় সহ] ৮,৪৪৯,৪৮২ জন ; আদিবাসী ১৩৭,১৯৭ জন ; বর্ণহিন্দু : ১,৯১০,৮০৭ জন।

দক্ষিণবঙ্গে একদা দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বাস করত। 'দ্রামিল'-তামিল' ইত্যাদি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। "বাংলাদেশের স্থানের নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' [বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বগুড়া] 'গুড়ি' [শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি] 'জুলি' [নয়নজুলি], 'জোল' [নাড়াজোল], 'জুড়' [ডোমজুড়], ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষার" ।[৩৬] ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'নব্য প্রস্তর যুগের ওই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নাগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর', 'কুট' প্রভৃতি নগর-জ্ঞাপক যে সব শব্দ আছে, সেগুলি প্রায় সবই দ্রাবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত।[৩৭] যেমন বারুইপুর, সোনারপুর, মজিলপুর, ভগবতীপুর, বাসুদেবপুর ইত্যাদি এবং ছোট বাঁকড়া, গোবিন্দপুর ধোকড়া, কাঁকড়া, আটঘরা, নওপাড়া, গোড়খাড়া, আঁটিসারা ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। 'বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাঁটুল, তরবারি, তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ' ।[৩৮] দ্রাবিড় সমাজ-কাঠামো ছিল এই রকম [৩৯] : মলোর বা উচ্চশ্রেণী=রাজা বা মাল্লের= বল্লাল বা সামন্ত রাজা= বেল্লাল বা ক্ষেত্রস্বামী ও কৃষক= 'বণিক' বা ব্যবসায়ী= [নিম্নশ্রেণী] 'বিলইবলার' বা শ্রমজীবী= 'আদিওর' বা দাস জাতি।

কুলদেবতা ও কৌলিক পদবীতে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের শৌর্যশালী বিভিন্ন জাতি ছিল। যেমন আজরি, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, বাগ্‌দী, বীরবংশী প্রভৃতি এখনও বাঘের পরিচয় বহন করছে।

চার : দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুর

দক্ষিণরায় ব্যাঘ্র সম্পৃক্ত দেবতা। অবশ্য ঘোড়াও তাঁর বাহন। [দ্রষ্টব্য : ধপ্‌ধপির মন্দিরের দক্ষিণ রায় চিত্র]। কিন্তু বারাঠাকুর একটি মুণ্ডমূর্তি মাত্র। তাঁর বাহন নেই। তিনি থানেই অধিষ্ঠিত। বাদায় অথবা গৃহ পার্শ্ববর্তী মাঠের প্রান্তে, ধান ক্ষেতের আলে এই দেবতার পূজা করা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে ও পয়লা মাঘে। দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তি খুব বেশি পাওয়া না গেলেও ধপ্‌ধপি এবং ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার কয়েকটি গ্রামে পরিলক্ষিত হয়।

বারাঠাকুর এখনও আদিমস্তরে বা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে পারেন নি।

এই দুই দেবতাই অর্বাচীন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ও সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে একই ভাবানুষঙ্গে সম্পৃক্ত। বারাঠাকুরকেও অনেকে 'দক্ষিণেশ্বর' বলে পূজা করেন। বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এই দুই দেবতার শব্দার্থ পর্যালোচনা করা যাক। প্রথমে 'বারা' শব্দের উৎস ও অর্থ পর্যালোচনা করা যাক :

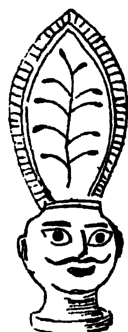
ক. বারা :

১. "সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু প্রভৃতি আদিম জাতিদের ভাষায় 'বারেয়া' 'বারিয়া' ও 'বার' শব্দ আছে। যার অর্থ দুই"।[৪৩] ২. 'ইহা যমজ দেবতার [Twin Gods] প্রকৃষ্ট নিদর্শন'।[৪৪] ৩. 'আদিম যুগের চ্যাং-পূজা, নরবলি, শিরোব্রত, এই মুণ্ড পূজারই এক একটা রূপান্তর'।'[৪৫] ৪. বারোয়া= বারো=বারা=মুণ্ড। ৫. বাউরা= বাউর=বার=বারা? [সং রাতুল—প্রা· রাউল=বা°র][৪৬] র=র; সুতরাং রারা=বারা। ৬. বেআড়া [পারসিক প্রত্যয় 'বে', বৈদিক 'বি'] = বিআড়া = বাড়া = বারা=মুণ্ড। ৭. বার [আরবী Barr] অর্থ হলো দেশ বা ভূমি। বার = বারা। যেমন, মালাবার। মালা=পাহাড়, পর্বত [দ্রাবিড়]; বার=ভূমি। ৮. 'রা' [R-a], শির, মুণ্ড।[৪৭] ৯. বা [b-a]—ভূমি।[৪৮] সুতরাং ৮ অংশের 'রা' যদি মুণ্ড বা শির হয়, তবে 'বা-রা' একত্রে 'ভূমিলগ্ন মুণ্ড' দ্যোতনা করে। ১০. বাড়=গ্রাম, পাড়া [কোল গোষ্ঠীর শব্দ]। সূক্ষ্ম উপভাষায় 'বাড়' বহুল ব্যবহৃত। যেমন, শত বাড়ের লোক অর্থাৎ সাত গ্রামের লোক। 'বাড়ের' সঙ্গে উয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বাড়ুয়া' অর্থাৎ 'মোড়ল।[৪৯] ১১. বৌদ্ধ দেবী তারা = বারা হতে পারে? ১২. বুরু [মারাঙবুরু / সাঁওতালদের অন্যতম দেবতা] = বুরা = বারা? ১৩. বেশ কয়েকটি গ্রাম-নামের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের নামের সঙ্গে 'বারা' শব্দটি যুক্ত আছে। যেমন: বারাসাত [২৪ পরগণা], দক্ষিণ বারাসাত, বারাতলা, বারাগ্রাম [বীরভূম], বারাদ্রোণ [২৪ পরগণা], বারাণসী [উত্তর প্রদেশ: বরুণা+অসি ?]। ১৪. বারা : [বার+অ ; অপ্র][৫০] ক. বাহির হওয়া। খ. অঙ্কুরিত হওয়া। গ. প্রস্থান করা, যাত্রা করা। ১৫. বাটিকা=বাটি=বাড়ি=বেড়া=বাড়া= বারা। বেড়া মূলত কার্পাস ক্ষেত্রের আল্‌কে বোঝাত। ১৬. বাড়া =

বারা। বৃদ্ধি পাওয়া; পরিষ্কার করা; বেড়ে দেওয়া।[৫১] ধনে, কুলে, শীলে বাড়ান; আগ্ বাড়ান; রাজস্বের পরিমাণ বাড়ান; বাইরে।[৫২]



ধপধপির দক্ষিণ রায়



বারামুণ্ড

১৭. বাদা-বি [আ 'বাদিয'-বন] জলপ্রায় জঙ্গলময় নোনাদেশ।[৫৩] ১৮. সংস্কার=প্রা. দুবার, বার=বার+আ=বারা। অর্থ দুয়ার; ১৯. বার [বহির্দেশ, গৃহের বহির্ভাগ]+আ=বারা। প্রসঙ্গত, বারাত—বাহিরে বা বার্য়া—বাহির হইয়া।[৫৪] ২০. বারি—দেবতার অধিষ্ঠানভূত মৃত্তিকাদির কলস বা ঘট।[৫৫] ২১. বাড়্রা=[নো]-বিণ, বেঁটে, ক্ষুদ্র ॥ [=বাঁট [=বণ্ঠ সং]+উয়া প্রা.][৫৬] ২২. 'বারা' ও 'দক্ষিণদার'—নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা।[৫৭] বারা—স্তূপ; বা-রা=যমজ ঠাকুর বা দেবতা। ২৩. বারী[৫৮] [A. n. The creator, God.] =বার=বারা। ২৪. বারীতলা[৫৯][A. n. The most high God.]=বারতলা=বারাতলা। ২৫. বাড়াম্=বাড়া=বারা=একটি লৌকিক দেবতা। ২৬. বনরাজা=বনরাজা=বনরাআ=বংরাআ=বারা=বনভূমির অধিপতি। ২৭. বেড়া [মুণ্ডারীশব্দ] সূর্য=বড়া=বাড়া=বারা। ২৮. বার [Var, n], **water, respectable waters, the ocean, stagnant water, a pond, a protector, defender.**[৬০]

খ. দক্ষিণরায় :

'রায়' শব্দ রাজা' শব্দাগত। রাজা ভূম্যাধিপতি, ভূস্বামী, প্রকৃতি-পালক। 'স্বামী' শব্দও রাজাবাচক। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের বহুনাম পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা অনেকেই 'রায়' অন্তিক ; যেমন : বাঁকুড়া রায় [বেলডিহা/বাঁকুড়া/দ্রষ্টব্য মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল], অচল রায় [মেমারি/বর্ধমান], ক্ষুদিরাম [বোড়াল/২৪ পরগণা], কালু রায় [জাড়াগ্রাম/বাঁকুড়া], শ্যামরায় [বন্দিপুর/বর্ধমান] গোঁসাই রায় [খুকড়ামুড়া/পুরুলিয়া] প্রসঙ্গত দক্ষিণবঙ্গের কুমীর বাহন কালুরায় ও উত্তরবঙ্গের সোনা রায় [ব্যাঘ্রবাহন] দক্ষিণ রায়ের সমগোত্রীয় লৌকিক দেবতা।

বাংলার বারভূঞাদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য। তিনি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ [যশোর জেলা সহ] শাসন করতেন। তাঁর ভ্রাতা মুকুট রায় ও বসন্ত রায় বীর সেনা হিসেবে সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনেকের ধারণা, দক্ষিণরায় 'বসন্ত রায়ে'র নামান্তর এবং উভয়েই অভিন্ন। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'দক্ষিণ রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি'। 'রায়' উপাধি যুক্ত রাজন্যবর্গ—কন্দর্প রায়, কেদার রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি।

গ. রায় :

সং রাজন্=প্রাকৃতে রায় =য়=রায় [বঙ্গীয় শব্দকে]। রাজা=রায়া=রাঅ=রায়। ১. রাজা [ত্রিদেশের রায়/চৈতন্যভাগবত], দৈত্য কংস। ২. রাজপুত্র। ৩. পশুর রাজা।। ৪. দেবরাজ বিষ্ণু। ৫. শ্রেষ্ঠ, প্রধান। ৬. দেব। ৭. প্রভু, পতিদেবতা। ৮. সম্ভ্রমসূচক মহাশয়। ৯. আদর-সূচক। ১০. হিন্দুর উপাধি বিশেষ। যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, কবি রায় গুণাকর [ভারতচন্দ্র] ইত্যাদি।

ঘ. রায়বাচক নাম :

রায়কছম্, রায়গড়, রায়দীঘি, রায়চাগ, রায়পুর, রায়বাঘিনী, রায় বেঁশেনাচ, রায়শেখর, রায়না, ইত্যাদি।

ঙ. দক্ষিণ :

দিগ্ বিশেষ। দক্ষিণাচার—তান্ত্রিক আচার বিশেষ। সূর্যের দক্ষিণ দিগ্ যাত্রাকে বলে 'দক্ষিণায়ন'। শ্রাবণ-পৌষ মাস এই গতির কাল।

'দক্ষিণ রায়' শুধু দক্ষিণ বঙ্গের দেবতা বা অধীশ্বর। ২৪ পরগণা বা সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া অন্যত্র দক্ষিণ রায় দুর্লভ। দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রবাহন, কোথাও বা ঘোটক বাহন। পূর্বে এঁকে 'বাঘের দেবতা' বলে পূজা করা হত। 'নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম রাজ বা দক্ষিণ রায়' [ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', ৫ম সং]।

"ইংরাজীতে রাজাকে King বলে। ফরাসীরা Roi বলে কিন্তু King বা Roi শব্দের আদিম মৌলিক অর্থ কি ? King শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ জনক, Roi শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ 'রাজন্'। জনক অর্থ জন্মদাতা। 'রাজন্' অর্থ যিনি বিরাজ করেন বা প্রকৃতি রঞ্জন করেন, সমাজ সুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আর্যগণ যে এক একজন প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাহাদের এই দুইটি গুণ দেখিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিলেন [রমেশচন্দ্র দত্ত : 'ঋগ্বেদের দেবগণ']।

চ. দক্ষিণরায়ের আঞ্চলিক বিস্তারণ :

১. ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ। ২. হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ। ৩. খুলনা জেলার সুন্দরবনাংশ। ৪. যশোহর জেলার সুন্দরবনাংশ। ৫. নোয়াখালী। ৬. সুন্দরবন।

ছ. পূজারী :

মউল্যা, বাউল্যা, মালঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী ও পাটনী [অর্বাচীন সমীক্ষালব্ধ]।

জ. পূজার কাল :

পৌষ সংক্রান্তি/১লা মাঘ।

ঝ. থান : দেউল :

বট, অশ্বত্থ, বিল্ব ও নিম গাছের তলা, মাটির ঢিপি, মন্দির [ধপধপি]।

ঞ. পূজার প্রচলন :

'খুব সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতার পূজার অত্যন্ত বেশী প্রচলন আরম্ভ হয়' [দ্র. ১নং পাদটিকার গ্রন্থ।]। এর পূর্বে দক্ষিণরায়ের পূজার প্রচলন ছিল না এমন প্রমাণ নেই। অবশ্য

এই শতকেই কৃষ্ণরাম দাস, মাধবাচার্য ও হরিদেব 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এই মঙ্গলকাব্য অর্বাচীন। তাই এর উপর ভিত্তি করে কোন ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

দক্ষিণবঙ্গেই ব্যাঘ্রদেবতার সংখ্যা বেশি। হিন্দুদের দক্ষিণরায়, মুসলমানদের বড়খাঁ গাজী বা মোবারক গাজী আর বনবিবি বা বন-দুর্গাই প্রধান। উত্তরবঙ্গের রংপুরে, কোচবিহারে সোনারায়, পাবনায় পীর মোনারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাঘ্র বাহন বেশ কয়েকটি দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় দেবমণ্ডলে যেমন : ১. মহাযান তান্ত্রিক দেবতা 'মঞ্জুশ্রীর' বাহন বাঘ। ২. শিবের প্রাচীনতম বাহন বাঘ। ৩. সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত রুদ্রের দুপাশে দুইটি ব্যাঘ্রমূর্তি পাওয়া গেছে [মৃৎফলকে]। ৪. দুর্গার প্রাচীনতম বাহন বাঘ। ৫. বন-বিবির বাহন বাঘ [এলাচিগ্রাম/দক্ষিণ ২৪ পরগণা]। ৬. সোনারায়ের বাহন বাঘ [উত্তরবঙ্গ]। ৭. বরখাঁ গাজীর বা মোবারক গাজীর বাহন বাঘ, মতান্তরে ঘোড়া [দক্ষিণ ২৪ পরগণা]। ৮ বাঘেশ্বর [মির্জাপুর উত্তরপ্রদেশ]। ৯. বাঘেশ্বরী [গয়া বিহার]। ১০. বাঘ ভৈরব [নেপাল]। ১১. বাঘদেও [মধ্যপ্রদেশ]। ১২. বনরাজা [বিহার]। ১৩. বাঘবাহনা চণ্ডী-ভগবতী [ধর্মমঙ্গল]। ১৪. বাঁকুড়া রায় ও ক্ষুদিরায় ব্যাঘ্রবাহন।

ট. দক্ষিণরায়ের ধ্যানমন্ত্র :

১. "দ্বিভুজং রক্তবর্ণং জটিলং রুদ্রমূর্তি ধারণং
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানং নানালংকারং ভূষিতম
ব্যাধিনানোশ্বরং দেবং দক্ষিণশ্বরং মহং ভজেৎ।
দক্ষিণেশ্বরায় রুদ্রায় ভৈরবায় সর্বপাপ হরয়েচ
নিবেদয়ামি আত্মানাং ত্বংগতি পরমেশ্বর।"

[ধপধপির দক্ষিণরায় মন্দিরের পুরোহিত শ্রীরণজিৎকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংগৃহীত, ১৯৬৮]

ঠ. প্রসঙ্গত ক্ষেত্রপালের ধ্যানমন্ত্রটিও স্মর্তব্য :

১. 'ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধরং ত্রিনয়ং নীলাঞ্জনাদ্রি প্রভং
দোর্দ্দণ্ডাও গদাকপালবরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখল ঘর্ঘর ধ্বনিমিলজ্জ ঝঙ্কার ভীমং বিভুং
বন্দেহহং সিত সর্পকুণ্ডল ধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা।

—ইনি ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতা। ডাকিনীতন্ত্রে ইনি শ্বেত বর্ণাভ ও রক্তবস্ত্র। কৌলাবলী গ্রন্থে ইনি ত্রিশূল, ডমরু ও খট্বাঙ্গধারী।'

[দ্র. 'ভারতকোষ' (২য় খণ্ড) : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং : পৃ. ৫০৯।]

২. ব্রহ্মানন্দম্ পরমসুখদম্ কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
দণ্ডাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণম্॥
একং নৃত্যং বিমলমঅচলম্ সর্বাদি সাক্ষীভূতম্।
ভবাতিতং ত্রিগুণরহিতম্ দক্ষিণদ্বারং নমাম্যহম্॥

[দক্ষিণ ২৪ পরগণার 'নউশা' গ্রামের দক্ষিণদ্বার ঠাকুরের পুরোহিত শ্রীহলধর চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংগৃহীত]

৩. ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নবাসন গ্রামের দক্ষিণরায় ঠাকুরের পুরোহিত শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় যে গায়ত্রী মন্ত্রটি পূজারম্ভে বলেন, সেটা এই : 'ক্ষেত্রপালাদি ভূমিদেবতাগণেভ্যঃ নমঃ। ওঁ ফট্।' নউশা গ্রামে 'দক্ষিণদ্বার' একটি বিশাল বটগাছ [Ficus Bengalensis] তলায় প্রতিষ্ঠিত। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান। মূর্তিটি মাটির ধড়-মুণ্ড [বারা ঠাকুর]। মাথায় মুকুট। মুকুটে বনজ ফুল আঁকা। গোঁফ ও গালপাট্টা বর্তমান। আয়তনেত্র। মূর্তিটির দক্ষিণপাশে চারটি ছোট ছোট ঘট ও একটা বড় ঘট। বামপাশে মনসা ও ষষ্ঠী। সামনে রয়েছে একটি 'মোকাম'। মোকামটি মাটির ঢিবি দিয়ে তৈরী। চারকোণে চারটি তীর পোতা রয়েছে। শোলার ঝারা ও মালা সামনে দেওয়া হয়েছে। মূর্তিটি তৈরী করেছেন নউশা গ্রামের কুমোর।

উল্লেখ্য, দক্ষিণদ্বারের থানের পাশেই রয়েছে 'বিমিমার' থান। সেখানে সাতটি মাটির ত্রিভুজাকৃতি ঢিবি। নাম সাতবোন বা সাত-বিবি। দক্ষিণদ্বার দক্ষিণমুখী। সাতবিবি পূর্বমুখী। প্রসঙ্গত 'জাঁতালের' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে দক্ষিণদ্বারের বার্ষিক পূজায়। নউশায় 'জাঁতাল' হয়। [জাত্+আল্=জাতাল।] জাতশব্দ সংস্কৃত যন্ত্র=জাঁত+আ=জাঁতা=পেষণযন্ত্র। 'জাঁতার' অর্থ অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ যন্ত্রবিশেষ। আল, আলি, আইল [সং অল্-বাধা দেওয়া] বি. সীমা; বেড়া; ঘের; আইল। প্রসঙ্গত 'আলিদুর্গা' স্মর্তব্য। ক্ষেত্রের 'আলিতে' পূজিতা 'দেবীদুর্গা'—'আলিদুর্গা' [এই অর্থগুলি জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১ম ভাগ) থেকে নেওয়া হয়েছে।]

ঙ. মূর্তিপ্রকরণ :

মুখবর্ণশ্বেত, অন্তর্বাস হরিদ্রাবর্ণ, বহির্বাস নীলাভ, হস্তযুগল সবুজ। প্রহরণ—ত্রিশূল, তীরধনুক, কৃপাণ, ঢাল, তূণ, বন্দুক। দক্ষিণমুখী, আয়তনেত্র, সুপুরুষ। বামপার্শ্বের কোমরে কৃপাণ। [ধপধপির মূর্তি অনুসরণে]

চ. বাহন :

বাঘ ও ঘোড়া। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে ডানদিকে বাঘ ও বাঁদিকে ঘোড়া ছিল। ধপ্‌ধপি মন্দিরের পূজারী শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য এই তথ্য জানালেন।

ণ. পূজার উদ্দেশ্য :

অনেকে মানত করেন। রোগ-শোক নিবারণের জন্য, মনস্কামনা পূরণের জন্য পূজার্চনা করেন। ভক্ত্যারা [পুরুষ-মহিলা] দণ্ডি কাটেন মন্দির প্রাঙ্গণে। সামনেই জলাশয়। জলাশয়ে স্নানান্তে জলসিক্ত বস্ত্রে দণ্ডি কাটা বিধেয়। মন্দিরের প্রবেশ পথে '৺শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর' নামপত্র প্রস্তরে খোদিত রয়েছে। দক্ষিণ রায় শুধু রোগ নিবারক দেবতা, অনেকে এঁকে বৃষ্টি ও শস্যের দেবতাও বলেছেন।[৬২]

পূজার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আমাদের বিস্তৃত সমীক্ষার[৬৩] ফল সাজানো হলো : ১. হারানো প্রাপ্তির দেবতা [যে কোন দ্রব্য বা গরু, ছাগল ইত্যাদি হারিয়ে গেলে গাঁজা মানত করা হয়]। ২. মাছ ধরার জন্য মানত করা হয়। মানত করেন হুগলী নদীর উপকূলবাসী জেলেরা। বিশেষত ইলিশ মাছ ধরবার জন্য জেলেরা ইলিশ মানত করেন। মাছ রান্না করে নৈবেদ্য দেওয়া হয় এই গ্রামে। ৩. রোগ-শোক নিবারণের জন্য পাঁঠা বলি দেন। সর্বজাতের লোক মানত করেন।

মুণ্ড প্রসঙ্গে একটি লোকবিশ্বাসমূলক কাহিনীর[৬৪] কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হলো : দুখে নামে এক অনাথ বালক ছিল। দুখে তার কাকা ধনার সঙ্গে মধু ভাঙ্গতে গিয়েছিল। সেখানে তাকে ধনা রান্না করে দিত। দুখের বিধবা মা বলে দিয়েছিলেন বনে বনবিবি আছেন। তিনি সকলের মা। বিপদে পড়ে ডাকলে সাড়া দেন। দুখে রাঁধতে জানে না। বনের মধ্যে বসে সে শুধু মা, মা, বলে কাঁদে। বনবিবি তার কষ্ট দেখে, এসে রান্না করে দিতেন।

অন্যদিকে দক্ষিণরায় ধনাকে বল্লেন একদিন, যদি দুখেকে বলি দিস, তবে তোর সব ডিঙ্গা মধু দিয়ে ভরে দেব। প্রথমে ধনা আপত্তি করে, পরে রাজি হয়। দুখেকে দক্ষিণরায় বাঘের বেশে[৬৫] ধরতে আসে। ভয়ে দুখে মা, মা, বলে কেঁদে উঠে।

বনবিবি পাটে বসে ছিলেন। তিনি ডাক শুনে ছুটে গিয়ে খড়ম দিয়ে বাঘের মাথা উড়িয়ে দেন। মাথা খসে পড়তেই দেখা গেল সেটা দক্ষিণ রায়ের। [মতান্তরে, বনবিবি তাঁর ভাই শা জাঙ্গলীকে পাঠিয়েছিলেন বাঘকে শায়েস্তা করতে] তিনি গদা দিয়ে বাঘের মাথার খুলি উড়িয়ে দেন।] সেই 'মুণ্ডই' দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর হিসেবে পূজিত হচ্ছে।

ত. মুণ্ডমূর্তি :

পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘে দিনে ও রাত্রে বিশেষ পূজা করা হয় দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড প্রতিমার [?]। এই মূর্তিও আয়তনেত্র, স্থিরভয়-বিহ্বল দৃষ্টি, গালপাট্টা ও গোঁফ সমন্বিত। মাথায় পুষ্প-মুকুট। [তু. রুদ্রের মুকুট। বাঁকুড়ার জোড়া দেবতার চালচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। আদিম লক্ষণাক্রান্ত] উন্মুক্ত বাদায় ও মাঠে এঁর থান।

অনেকের ধারণা, শনির দৃষ্টিতে উড়ে যাওয়া গণেশ-মুণ্ড দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডরূপে নিম্নবঙ্গে উদ্ভূত হয় [দ্র. ১৩০৩ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত বোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ]। হাওড়া অঞ্চলেও গণেশমন্ত্রে দক্ষিণরায়ের এই মুণ্ডমূর্তির পূজার উল্লেখ রয়েছে। [ছড়ামুড়া ক্ষেত্রপাল]। ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন, এই মূর্তি অপৌরাণিক বনদেবতা।

কৃষ্ণরাম বলেন, 'এই মুণ্ড গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত বীরমল্ল দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড।' ['কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে'] 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মুণ্ডপূজা ও উত্তর-বৈদিক ঔপনিষদ যুগের ক্রমবিবর্তিত 'রুদ্র' ভাবনার সমন্বয়ে, দক্ষিণাধিপতির মুণ্ডপূজার প্রবর্তন হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ভাবেই করা যাইতে পারে'। [ড. পঞ্চানন মণ্ডল : 'সাহিত্য প্রকাশিকা' : ৪র্থ খণ্ড : ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। বাংলাদেশে মুণ্ড পূজার প্রচলন সুদীর্ঘকালের। দুর্গা, কালী প্রভৃতির মুণ্ডপূজা যথাক্রমে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে, কুচবিহারে ও

মালদহ জেলায় পরিলক্ষিত হয়। ঘটে, পটে, মুণ্ডে পূজা মূলত প্রতীকীভাবনার প্রকাশক। মুণ্ডাকৃতি দেব বা দেবীর নিকটে মুণ্ডপূজা প্রশস্ত। [তু. 'কালীঘাটে মুণ্ডপূজা অঙ্গ বলি দিয়া'] প্রসঙ্গত স্মর্তব্য "কালুরায়ের মূর্তির বিকল্পে 'বারা' বা মুণ্ড প্রতীক পূজিত হয়" ['ভারতকোষ' (২য় খণ্ড) : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : পৃঃ ৩১০]।

থ. কুম্ভপুরুষ বারা প্রতীক :

কাটামুণ্ড পূজার নাম 'বারা পূজা'। 'একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তাই'—কৃষ্ণরাম সমকালীন দক্ষিণবঙ্গে অবশ্যই এই মূর্তি দেখে থাকবেন। পাঁচমুড়ার কুম্ভকারেরা এখনও মনসার 'বারা' তৈরী করেন। পাঁচমুড়া শব্দটিও পঞ্চ মুণ্ড' থেকে সৃষ্ট। কালীঘাটেও মুণ্ড পূজা করতে হয়। এখানে 'অঙ্গ বলির' প্রথা রয়েছে। [ড. পঞ্চানন মণ্ডল : 'সাহিত্য প্রকাশিকা' : ৪র্থ খণ্ড : ভূমিকা দ্র] ধর্মঠাকুরের ভক্ত্যাদের 'শবনৃত্য' মুণ্ড পূজার এক তান্ত্রিক রূপ মাত্র। এপ্রসঙ্গে বোলান ভক্ত্যাদের মড়ার কর্তিত মুণ্ড নিয়ে নৃত্যের কথাও স্মরণ করতে পারি। দক্ষিণরায়ের এই 'বারা' একটি পারিভাষিক নাম। এর অর্থ ঘট।[৬৬] কৃষ্ণরামের কাব্যেই আমরা পাই :

> দক্ষিণরায়ের বারা ঝারা মাথায় করিয়া
> কৃষ্ণরাম কবি গায় দক্ষিণরায় ভাবিয়্যা।

হরিদেবও ঘট অর্থে 'ঝারা বারা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বারা' শব্দ অন্বিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচুর শব্দ ও গ্রামনাম যে প্রচলিত আছে সে বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ড. পঞ্চানন মণ্ডল সিদ্ধান্ত করেছেন: "বিঘ্ন বিনাশের এবং প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্যের কামনা করিয়াই মনে হয়, একদা আদিম যুগে 'বরাম' বা 'বারাপূজা' প্রচলিত হয়েছিল ; ক্রমে দর্শনতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে সে ঐশ্বর্য, ইহলোক থেকে পরলোকেও বিস্তার লাভ করিয়া, কাটামুণ্ডে 'ঝারা বারা' প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যাত হতে লাগল। কেবল দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ডের সঙ্গে এই 'বারার' যোগাযোগের কল্পনা, 'চাষা ভোলানো ভাষা' বা লোক-ভোলানো জোড়াতালি মাত্র" [দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ]। এই সিদ্ধান্ত ও অনুমান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য যথাস্থানে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' [১৭ কার্ত্তিক ১৩৭৭] 'বারা ঠাকুর কী' ? এই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে বারুইপুর থানার সাউথ রামনগর গ্রামের শ্রীঅমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন: "নিম্নবঙ্গের মধ্যে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রতি বৎসর ১ মাঘ কোথাও আবার সারা মাঘ মাস ধরে দিনে বা রাত্রে 'বারা ঠাকুর' নামে এক দেবতার বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়। যুগ্মমূর্তি থাকলে একটি পুরুষ অপরটি স্ত্রী দেবতা। পৌরুষের বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র এক জোড়া গোঁফে। লতা-পাতা আঁকা সোজা উঁচু মত মাথার মুকুট এবং গলা পর্যন্ত মূর্তির গঠন সর্বত্র সীমাবদ্ধ। বনে জঙ্গলে, উন্মুক্ত স্থানে এঁর পূজা এবং তা আর্য ব্রাহ্মণেরাই করে থাকেন।" অবশ্য পরে তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন: 'এই বারা ঠাকুর দক্ষিণরায়, গণেশ, শিব, নারায়ণী প্রভৃতি কিছুই নন। তবে কী' ? ইত্যাদি।

এই পত্রিকাতেই [২ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭] তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর লিখেছেন: 'এ সম্বন্ধে জানাচ্ছি—এটি ব্রহ্মা মূর্তির পূজা। শূন্যবাদীদের ব্রহ্ম'পূজা। ব্রহ্মার ধ্যান করা হয় বলেই ব্রাহ্মণরা এর পূজা করেন। আসলে ছিল ব্রহ্মাপূজা। নাম ছিল বারমতি পূজা, বারুমতি পূজা, বার্মতি পূজা, বারাং পূজা। যে পূজায় বারটি তিথি বারদিন বারটি মাস ধার্য করা হয়, তার নাম বারমতি গৃহভরণ [ধর্মপূজা বিধান]।' তিনি আরো লিখেছেন: "ধর্মপূজার ব্যবস্থায় বার বৎসরে পূজা সমাধানের ব্যবস্থা। অন্তে পুত্র বলিদান। এটি ২১ পয়ারের বারা ঠাকুর গীত [শূন্যপুরাণ ৯৯/১৩৮] অনাদি মঙ্গল 'বারামতি গীত শুনি' বারমতি পূজা দেয়। ['দ্বিধা হৈল বারা দেব ধর্মের পূজায়'।] 'শূন্য-পুরাণেও' 'বারমাসে বারা পূজা বার ফুল দিয়া। বার ভাই আসি করে বারার আয়তি [আরতি ?]।'"

বারা ঠাকুরের সৃষ্টিতে বৌদ্ধ অথবা ধর্মঠাকুরের প্রভাব আছে কিনা বিবেচ্য। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'সুন্দরবন' [ড. শ্রীদিলীপ হালদার সম্পাদিত একটি স্মারক পুস্তিকা, ১৯৬৮] শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলেছেন: 'বারা ঠাকুরের মুণ্ডপূজা কালীপূজারই একটি অত্যন্ত আদিম রূপ। কালীমূর্তির পরিকল্পনা পরবর্তী, পূর্বে কেবলমাত্র মুণ্ডই পূজিত হইত।' মুণ্ডমূর্তি এখনও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিত হয়। বেলিয়াতোড়ে দুর্গার মুণ্ড, কালীঘাটে কালীর, মালদহে কলিগ্রামে কালীর মুণ্ডমূর্তি এখনও পূজিত হচ্ছে।

'রা' [Rā] নামে মিশরীয়দের একজন সূর্যদেবতা আছেন। হেলিওপোলিস

ও থেবিসের যথাক্রমে 'রা' ও 'আমন' দেবতা যুক্ত হয়ে গড়ে উঠলো 'আমন-রা' [Amon-Rā]।[৩৭] 'ফারাও' হলো 'আমন-রা'র পুত্র। আদিমকালের মানুষ বহু দেবতার কল্পনা করেছিল। দেবতারা কল্পলোকের বাসিন্দা নন। এঁরা আমাদেরই পরিচিত জগতের সর্বগুণসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানব। সেই বিস্মৃত-প্রায় পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত আদর্শায়িত রূপ আমরা রচনা করেছি দেব-মূর্তিতে। মিশরে, গ্রীসে, রোমে ও প্রাচ্যদেশে 'পূর্বপুরুষ' পূজার [**ancestor worship**] ধারা আজও প্রবহমান। প্রাচীনকালে মানুষ ছিল দেবোপম, আর দেবতা ছিল মনুষ্যপ্রতিম। যে সমাজ যত আদিম স্বভাবাবিষ্ট, সেই সমাজের সৃষ্ট দেবতারাও বহুবিচিত্র।

'আমন-রা' প্রসঙ্গে আমরা অনুমান করতে পারি প্রাচীনতম বঙ্গভূমিতে 'বাঙ্' ও 'রা'—এই দুই দেবপুরুষের মিলনে অথবা দুই ভূখণ্ডের অখণ্ডতায় জন্ম নিয়েছে 'বা-রা' ; পরে হয়েছে 'বারা'। তেলেগু ভাষায় সোনাকে বলে 'বাঙ্গারা' বা 'বাঙ্গারম্'। অনুমান করতে পারি এই 'বাঙ্গারা' শব্দ থেকে 'বাঙ্গালা' এসে থাকবে। আর বাঙ্গারা থেকে 'বারা'ও হতে পারে। এভাবে কয়েকটি সতর্ক অনুমান পাঠকদের কৌতূহলের জন্য এখানে পেশ করা হলো।

দ. জাঁতাল ঃ

> দক্ষিণরায় পূজা-উৎসব প্রসঙ্গে জাঁতালানুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণরায়ের প্রসিদ্ধ 'জাঁতাল উৎসব' সতর্ক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই 'জাঁতাল' শব্দ মূলত জাতিবাচক 'জর্তিল' শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে [দ্র. 'সাহিত্য প্রকাশিকা' ঃ ভূমিকা]। মহাভারতে 'জর্তিল' জন-গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। ব্রাত, গণ, 'শিবি' [শিবাই], 'আভীর' এরা অরণ্য-পর্বতচারী আদিম আর্য [ঐ]। ব্রাতপতি শিব, গণপতি গণেশঠাকুর, গদাডোমরূপী ধর্মরাজ, গণেশমুণ্ডরূপী দক্ষিণরায় এঁরাও আদিম ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা বলে অনুমান করা ধর্মভাবনার বা দেবভাবনার দিক থেকে অযৌক্তিক নয়।

জাঁতাল প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীক্ষালব্ধ তথ্য[৩৮] এখানে সন্নিবেশ করা যেতে পারে ঃ সিজবেড়িয়া গ্রামের পূর্বপ্রান্তিক সীমানা থেকে আউসবেড়িয়া গ্রামের সুরু। এখানেই জাঁতালের থান অর্থাৎ ধান ক্ষেতের প্রান্তলগ্ন এক ফালি ঘেসো জমি। এখানেই পুরুষানুক্রমে 'জাঁতাল পরব' হয়ে আসছে। এই জাঁতাল থানে দুই গ্রামের লোক অংশ গ্রহণ করেন। যাঁরা জাঁতাল করেন তাদের বলা

হয় 'জাঁতালের চাকরান্'। কাছেই রয়েছে 'জাঁতাল পুকুর'। থানে রয়েছে হাড়িকাঠ বসানোর জায়গা। পাশেই কিছু বনঝোপ।

গ্রামের শ্রীবিভূতিভূষণ কয়াল জানালেন, দক্ষিণদ্বারের নামে কিছু 'দেবত্র' জমিও গ্রামে রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল বারুইপুরের জমিদার রায়-চৌধুরীদের জমিদারীর অংশ হলো সিজবেড়িয়া গ্রাম। দক্ষিণদ্বারের নামে কিছু 'দেবোত্তর' জমি জমিদারেরা দিয়েছেন। সেবায়েতরা জমির ধান-চাল দিয়েই দক্ষিণদ্বারের পূজার্চনা চালান। গত কয়েকবছর ধরে দক্ষিণদ্বারের পুজোটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। দক্ষিণদ্বারের 'চাকরান্‌রা' অধিকাংশই কৃষক।

জনশ্রুতি, একদা এই গ্রাম ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন-জঙ্গল ছিল। এটা সুন্দরবনের অঙ্গ ছিল। জঙ্গল হাসিল করে ১লা মাঘ দক্ষিণদ্বারের বার্ষিক পূজা করা হোত। এই পূজারই অপরিহার্য অঙ্গ 'জাঁতাল'। প্রবাদ আছে, 'জাঁতাল খায়, মাতালে'। বস্তুত, জাঁতালে যে পশু বলি [পাঁঠা] দেওয়া হোত, সেই মাংস তরি-তারকারি সহযোগে রান্না করে গ্রামস্থ সকলকে প্রসাদ দেওয়া হোত। প্রচলিত রীতি অনুসারে সকলেই জাঁতালের প্রসাদ গ্রহণ করত। সঙ্গে মদ্য নিবেদন [দক্ষিণদ্বারকে] ও গ্রহণ উভয়ই চলত। যেমন আজও চলে পঞ্চানন্দকে গাঁজা নিবেদন। গ্রামের বর্ষীয়স শ্রীজলধর কয়াল [মাহিষ্য] জানালেন, 'জাঁতালের হাঁড়ির [অর্থাৎ যে হাঁড়িতে মাংস রান্না করা হয়] জল পান করলে 'মৃগী' রোগ সেরে যায়। অনুসন্ধানে, আরো জানা গেল, কাঁচাপাতা দিয়ে জাঁতালের রান্না করা হোত। খাবার অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সকলে 'দক্ষিণদ্বারের কৃপায় হরিবোল' বলে ধ্বনি দিত। তারপর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করা হোত।[৬৯]

মদ্য 'গঙ্গাভাটির' দক্ষিণরায়ের পুজোপচার। সুন্দরবনের 'রাক্ষসখালি'তে বনের চারদিকে আগুন জেলে রাত্রে জাঁতাল করা হতো। সম্ভবত 'বাঘ তাড়ানোর' জন্য এই আগুন জ্বালানো। জাঁতাল মূলত নিষাদাচার সম্পৃক্ত ক্ষেত্রপূজা। প্রস্তর যুগের লোকেরাও অগ্নিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করত।[৭০]

জাঁতাল পূজায় মদ্য-মাংস দেওয়ার রীতি সুপ্রাচীন। দক্ষিণদ্বার পূজার পরদিন জাঁতাল পালন করা হয়।[৭১] নউসাগ্রামে [ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা] পূর্বে জাঁতালে 'বলির মাংস' রান্না করে ভোগ দিতেন। এই গ্রামের পূজারী বা ভক্ত্যারা 'কারণবারি' সেবন ও 'বাবা'কে নিবেদন করতেন। বেশ কিছুদিন থেকে তা রহিত হয়েছে।

৺. ব্যাঘ্র বাহন

দক্ষিণরায়ের বাহন শুধু ব্যাঘ্র নয়। ঘোড়াও তাঁর বাহন। কবি কৃষ্ণরাম লিখেছেন :

বহে হীরারাম ঘোড়া পরিধানে দিব্য জোড়া
উড়নী ঘুরনী পরিপাটি॥

আবার অন্যত্র [রায়মঙ্গল কাব্য] বলেছেন :

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশ্বর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥

ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যে সূর্য ও ইন্দ্রের বাহন অশ্ব। বেদে সূর্যের বাহন অশ্ব। হরিৎবর্ণ সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্র রথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমণ করেন ['সপ্ত তা হরিতো রথে বহন্তি দেবসূর্য।' ঋক : ১ : ৫০ : ৮]। সূর্যের মত সবিতার বাহনও অশ্ব। ঋগ্বেদে অশ্ব ও সূর্য একাত্ম। অশ্বের চতুর্গুণ : তেজ, সৌন্দর্য, গতি ও জাতি। সূর্যেরও অনুরূপ গুণ রয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব। হরিৎবর্ণ সহস্র অশ্ব ইন্দ্রের রথ বহন করে [ঋক্ : ৪ : ৪৬ : ৩]।

ভারতীয় হিন্দু দেবদেবীর প্রত্যেকেরই প্রায় এক বা একাধিক বাহন রয়েছে। যেমন, ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, শিবের ষাঁড় [নন্দী], যমের মহিষ, কার্ত্তিকের ময়ূর, কামদেবের মকর, অগ্নির ভেড়া, বরুণের মৎস্য, গণেশের ইঁদুর, বায়ুর নেকড়ে বাঘ, শনির শকুন, দুর্গার সিংহ [মতান্তরে বাঘ], সরস্বতীর হংস, লক্ষ্মীর পেঁচা, ষষ্ঠীর বিড়াল, গঙ্গার মকর, শীতলার গর্দভ, মনসার হংস, অগ্নির ছাগল, বিশ্বকর্মার হস্তী, যমের মহিষ, গন্ধেশ্বরীর ও জগদ্ধাত্রীর সিংহ, পবনের মৃগ।

এই বাহন প্রধানত কৌলস্মারক বা কুলদেবতা [**totem-god**]। একদিন পশু আমাদের আরাধ্য ছিল। দেবদেবীর আত্মপ্রকাশ এক বিস্ময়কর ধর্মনৈতিক ঐতিহাসিক ঘটনা। দেবতার পূর্ণাবয়ব সংস্থান শিল্পের [মৃৎ, কারু, দারু ইত্যাদির] এক চরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। দেবতারও মানুষের মত জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য বা জরা আছে। কোন দেবতাই যৌবন নিয়ে জন্মাননি। মূর্তি প্রকরণ

ও বাহন সংস্থানের দিক থেকে ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বা আঞ্চলিক রূপমণ্ডলের অভিঘাতে ও আদিম-লোকায়ত-চিরায়ত মানবকল্পনার ক্রম-বিস্তারে দেবতার ধারাবাহিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।[৭২] কোথাও আমরা দেখি দেবতার মুণ্ড, কোথাও বা প্রস্তর খণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড বা বৃক্ষশাখা, কোথাও পশু, আর কোথাও বা পশু-পক্ষিবাহনা দেবদেবী। প্রসাধনকলা ও বর্ণ-সমাবেশের বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিকে বিচিত্রগামী করে। কোন দেবতার সামগ্রিক বিচার-বীক্ষণে সমুদয় উপকরণের ও উপসৌধের বস্তুনিষ্ট, ভূমিলগ্ন বিচারই বিজ্ঞান সম্মত।

দক্ষিণরায়কে ব্যাঘ্র-সম্পৃক্তির জন্য অনেকে বলেছেন, 'বাঘের দেবতা'। ব্যাঘ্র-প্রতীক অর্থে বহুবিধ তাৎপর্য বহন করে। গ্রীসে দিওন্যুসাস দেবতার সঙ্গে যুক্ত ব্যাঘ্র, বিপর্যয় ও ক্রূরতার প্রতীক। চীনে সে অন্ধকার ও চন্দ্রিমার প্রতীক [**J.E. Cirlot :** ***A Dictionary of Symbols*** **: 1967 p.**]। শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচায়ক ভারতীয় ব্যাঘ্র। বাংলার বাঘ [সুন্দরবনের **Felis Tigris**] সৌন্দর্য, শক্তি ও সাহসের প্রতীক। ভারতীয় শাস্ত্রে যে 'পঞ্চনখী'র [ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুর, শৃগাল ও হাতি] কথা বলা হয়েছে 'বাঘ' তাদের অন্যতম।

সুন্দরবনাঞ্চলে এবং সাগরদ্বীপের বহরদার গুণিনেরা 'বাঘবন্দীর' বা বাঘ পোষমানানোর জন্য বহু মন্ত্র [ছড়া] ব্যবহার করে থাকেন। সাগর দ্বীপের ধনচিবনের কাছে বহরদার [গুণিন] শ্রীচিন্তামণি বেরার কাছ থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে সংগৃহীত মন্ত্রের ছড়াটি এইরূপ :

'বাঘ চালি, বাঘ চালি, বাঘ করলাম ছাই।
বাঘের উপর তুরমুজ চালাই, কার আজ্ঞায় ?
বনবিবির আজ্ঞায়।'

[তুরমুজ=জোর-জুলুম]

প্রসঙ্গত, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার জোতঘনশ্যাম গ্রামের দক্ষিণরায়ের মন্দির দ্বারের দু-পাশে দুটো বাঘের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মন্দিরটি সাধারণ শিব মন্দিরের ন্যায় খিলান দেওয়া একচূড়া মন্দির। এই মন্দিরের দক্ষিণরায় ঠাকুরের পূজক হলেন শ্রীখুঁদুচরণ মণ্ডল। ইনি নমঃশূদ্র [চণ্ডাল]। এঁরাই পুরুষানুক্রমে পূজা করে আসছেন।

তুলনামূলক পুরাণবিদ বলেন, ব্যাঘ্র ও সিংহ সূর্যের প্রতীক-

দ্যোতক। ভারতের শিব, দুর্গা, ও গ্রীসের দিওন্যুসাস ব্যাঘ্রবাহন। শিবের ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘোড়া সূর্যের প্রতীক। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যরথ পুরাণে কথিত শুধু গল্প নয়, এক অসামান্য শক্তি ও তেজের প্রতীক-দ্যোতক। অশ্ব সৌভাগ্যেরও সূচক। গতির দ্রুততার জন্য অশ্ব সূর্যরশ্মিসম্ভব। ভারতীয় পুরাণে ও সাহিত্যে অশ্ব বহুরূপে চিত্রিত। ভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে পশু-পক্ষীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের সঙ্গে পশুর এই একাত্মতা আদিম তাৎপর্যবহ। ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে মানুষ ও পশুর সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অনেক পশু আবার শস্য-আত্মা প্রতীক।

'ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সূর্যকেই অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্যের বাহনও ঘোড়া।' ··ঋগ্বেদেও দিব্যঘোড়া 'দধিক্রার' কথা আছে।' ['আকাদেমী অব ফোকলোর' প্রকাশিত 'পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প ও শিল্পীসমাজ : ১৩৭৮ : পৃ.৯] ঘোড়া বা হাতির ক্ষুদ্রায়ত মৃন্ময় মূর্তি কুদ্র, বড়াম, ধর্মঠাকুর অথবা অন্য কোন গ্রামদেবতার থানে উৎসর্গ করা ধর্মীয় রীতি। লোকায়ত ধর্ম এই পশুমূর্তির মধ্য দিয়ে [জীবোৎসর্গ] আপনার মনোবাসনার পূর্ণায়ণ কামনা করেছে। এই পশু কোথাও দেব-দেবী আবার কোথাও পশুরূপে [বলির বিকল্প ?] উৎসর্গীকৃত।

ভারতের বেশ কয়েকটি আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাঘ্র যে কুলদেবতা এমনটি দেখা যায়। বাংলার বাগ, সিংহ ইত্যাদি কৌলিক পদবী সেই হারানো আদিম জীবনের স্মৃতিবহ নয় কি? টোটেম বিশেষত পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা বা কোন বস্তুও হতে পারে। টোটেম গোষ্ঠী জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংস্কার ও শ্রদ্ধাবোধে টোটেম গোষ্ঠীর রক্ত-লগ্ন আত্মীয় স্বরূপ। [দ্র. **Frazer : 'Totemism'**]।

মির্জাপুরের লাকারা-ধাঙ্গরেরা বাঘের মাংস খায় না। 'লাকর বাঘ' থেকে তাদের নাম হয়েছে 'লাকারা-ধাঙ্গর'। 'বাঘ বা হায়না তারা হত্যাও করে না। ওরাওঁদের 'বারা' সম্প্রদায় [**Bara Sect**] বার গাছের [**Ficus Indica**] পাতা খাবে না বা ডাল ভাঙ্গবে না।[৭৩] বাংলার দক্ষিণাংশে ব্যাঘ্রপূজার অন্তরালে ব্যাঘ্র কৌলচিহ্ন বা

কুলদেবতার [Totem] স্মৃতি যে সজীব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।[৭৪]

সুন্দরবনে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা ডোরাকাটা বাঘের প্রাচুর্য এখানকার লোকদেবতার বাহন-কল্পনার সহায়ক হয়েছে। 'এশিয়া মাইনর' থেকে বাঘ সম্ভবত আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে ভারতে প্রবেশ করেনি। কিন্তু মহেঞ্জোদারো ও চান্হুদরোতে প্রাপ্ত শীলসমূহে ব্যাঘ্র-বনদেবতার এক সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।[৭৫] সেখানে একটি অরণ্য, একাধিক বনদেবতা ও বৃক্ষদেবতা রয়েছেন। সে অরণ্যে একটি বাঘও বাস করে। বাঘ বনের অন্যান্য পশু হত্যা করে এবং বনকে মনুষ্যকবল থেকে সুরক্ষিত রাখে। একদা বনদেবতা মায়ারূপ ধারণ করে বাঘকে বিতাড়িত করলো। তারপর থেকে মানুষ বন কেটে আবাদ করতে শুরু করলো। প্রসঙ্গত বৌদ্ধদের 'ব্যাঘ্রজাতক' স্মর্তব্য। সুতরাং বাঘ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে এক মহিমময় আসন পেয়েছিল।

ন. মুকুট বা শিরস্ত্রাণ :

'মুণ্ডে মানুষের অসীম শক্তি নিহিত' : এই ধারণা থেকেই মুণ্ডপূজার সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট কুন বলেন : 'মস্তকে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আর দেহে প্রাণ শক্তি'।[৭৬] প্রাচীন মেসোপটোমিয়া ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অঙ্গভূষণাদির তাৎপর্য সুগভীর। শিরোভূষণ, সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অথচ গুণগত সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাবিলোনীয় ঐতিহ্যে এই তিনটি উপকরণ 'কেন্দ্রশক্তির' প্রতীক। হিন্দুদের সংস্কৃতিতেও বেদী, মন্দির, সিংহাসন, রাজপ্রাসাদ, নগর, সাম্রাজ্য ও বিশ্ব 'কেন্দ্রশক্তি'র দ্যোতক।

মুকুট বা শিরোভূষণ বহু প্রাচীন দেবদেবীর মস্তকে পরিলক্ষিত হয়। রাজার বা রাণীর মুকুট 'কেন্দ্রীয় শক্তির' সর্বোচ্চ প্রকাশক। অভিধানকার মুকুটের অর্থ প্রসঙ্গে এইভাবে লিখছেন : মুকুট—ক্লী √ মঙ্ক্ (মণ্ডন) + উট (উটন্)-ক ; মুকুল > মুকুড,-ট (?) শিরোভূষণ বিশেষ, কিরীট, শেখর (crown)। 'বারামূর্তির' শিরোভূষণ পুষ্পাঙ্কিত। লতাশ্রিত একক পুষ্পটি আবার পঞ্চপাপড়ি বিশিষ্ট। বর্ণ রক্তাভ, ঈষৎ কালো। বারামূর্তির গোঁফ ও গালপাট্টা উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে

গোঁফ, গালপাট্টাবিহীন বারামূর্তি দেখতে পাওয়া গেছে। যুগলমূর্তিতেও বারাপূজা হয়। অনেকের মতে একজন দক্ষিণেশ্বর [গোঁফ ও গালপাট্টা-যুক্ত] অপরজন নারায়ণী [দক্ষিণরায়ের জননী]। কিন্তু এককভাবে মুণ্ডপূজাও প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।

বারাঠাকুরের শিরস্ত্রাণে অঙ্কিত পুষ্পটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমার অনুমান, এই পুষ্পটি দক্ষিণবঙ্গের কোন ধর্মসম্প্রদায় অথবা রাজ-পরিবারের বা সাম্রাজ্যের জাতীয় চিহ্ন। আমরা আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে পুষ্প দেখতে পাই। যেমন, ইংলণ্ডের গোলাপ, ইটালীর শ্বেতপদ্ম, চীনের নার্সিসাস ফুল, বাংলাদেশের শাপলাফুল, জাপানের চন্দ্রমল্লিকা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'পদ্মের' বহু ফলক ও অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। বারাঠাকুরের শিরস্ত্রাণে ব্যবহৃত পুষ্পটি 'পদ্ম' বলে অনুমিত। দক্ষিণবঙ্গে পদ্মের প্রাচুর্য একদা ছিল। কারন, নদ-নদী ও তড়াগ এই অঞ্চলে ছিল, এখনও আছে।

হলদে রংয়ের ফুল সূর্য-প্রতীক দ্যোতনা করে। রক্তপুষ্প [লালফুল] পশু-সম্পর্ক, রক্ত এবং কামনার প্রতীক।[৭৭] পদ্মও প্রজননবাদের স্মারক। তবে অনেকের ধারণা জল, বীজ, লিঙ্গ প্রজননের যথার্থ প্রতীক। ভারতীয় লোকাচারে চাল উর্বরতাবাদের প্রতীক।[৭৮] দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অনেক লৌকিক দেবতার পূজায় ধান, চাল প্রয়োজন হয়। এমনকি ধানকাটার সময় বেশ কয়েকটি লৌকিক দেবতার উৎসব হয়। যেমন হালাকাটা [ধানের গোছাপূজা] বেণাকি, আটেশ্বর প্রভৃতি। বারাঠাকুর বা দক্ষিণরায়ের সঙ্গেও ফসল সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অথচ এঁরা মোটেই শস্য-দেবতা নন।

বারামূর্তির মুখ কুম্ভকারেরা যে ঘটে আঁকেন, সেই ঘটটি উল্টে মুখটা ভূমিমুখী করা হয় এবং ঘটের তলার দিকে শিরোভূষণ মাটির চালির মতন গড়ে জুড়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই মুণ্ডটি কুমোরেরা [২৪ পরগণার-দক্ষিণাংশে] পুড়িয়ে নেন খড়ের আগুনে। প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে যে হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধানে দেবদেবীর মূর্তি পুড়িয়ে গড়া নিষিদ্ধ। শাস্ত্রমতে দেবদেবী ঘট, পট ও প্রতিমায় পূজিত হয়। বারামূর্তি শাস্ত্রীয় ঘট নয়। আবার পূর্ণ লক্ষণযুক্ত প্রতিমা বা মূর্তিও নয়। এই মূর্তি কি বিকাশোন্মুখ মূর্তি?

লতাশ্রিত পুষ্প সন্দেহ নেই বনের বা বৃক্ষের প্রতীক। বৃক্ষ বা বৃক্ষ-আত্মা বৃষ্টি ও রোদ দেয় এটা সুপ্রাচীন ধারণা। কৃষি উৎসবে মুণ্ডারা আজও বনদেবতার পূজা করে।

প. বর্ণ ঃ

দক্ষিণরায় বা বারাঠাকুরের মূর্তির সবগুলিই শ্বেতবর্ণ। শুধু গোঁফ ও গালপাট্টা কালো, শিরোভূষণ কৌণিক। পুষ্প লালাভ, পঞ্চ পাপড়ি বিশিষ্ট।

লাল রং রক্ত, ক্ষত, মৃত্যু ও উদ্‌গমনের প্রতীক। পশুজীবনও দ্যোতিত হয়। যেমন বলিপ্রদত্ত পশুরক্ত সিঁদুরে প্রতিবিম্বিত। ভারতীয় শাস্ত্রে চরিত্র-গুণের নানা বর্ণ নির্দেশিত। যেমন ঃ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিবর্ণে-আভাসিত। সত্ত্বঃ=শ্বেতবর্ণ। এর ধর্ম হলো কেন্দ্রাতিগ [**Centrifugal tendency**]; তমঃ=কৃষ্ণবর্ণ। এর ধর্ম কেন্দ্রাভিগ [**Centripetal tendency**]; রজঃ = রক্তবর্ণ। এর ধর্ম চক্রবৎঘূর্ণন। রজঃ সৃজনধর্মী, বাসনাঋদ্ধ। রক্তবর্ণ ক্রোধেরও পরিচায়ক। শ্বেতবর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক, শুদ্ধরূপক। কৃষ্ণবর্ণ ভয় ও শিহরণ-বোধক।

পাঁচ : কাব্যে, সাহিত্যে, লোককথা, কিংবদন্তীতে দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর

দক্ষিণরায়, বারাঠাকুর, বনবিবি, বনদুর্গা ইত্যাদি ঠাকুর মূলত লৌকিক। লোকায়ত সমাজ [দক্ষিণবঙ্গে] তাঁদের নিয়ে অনেক কাব্য, ছড়া, কথা ও কিংবদন্তী রচনা করেছেন। অর্বাচীন মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে 'রায়মঙ্গল' [কৃষ্ণরাম, মাধবাচার্য ও হরিদেব] কাব্য, 'বনবিবির জহুরানামা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মউল্যা-মালঙ্গীর দেবতা দক্ষিণরায়। ব্যাঘ্র-ভীতি নিরোধক দক্ষিণরায়, দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গল মহলের, বাদার ও সুন্দরবনের শস্য রক্ষক ও প্রাণত্রাতা। কৃষ্ণরাম স্বপ্নে দেখেন দক্ষিণ রায়কে [রায়মঙ্গল]। দক্ষিণরায়ের রূপ বর্ণনা তিনি করেছেন এইভাবে ঃ

'রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন ॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালি-প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো-ভাটির মাঝে হইব প্রচার॥'

কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' রচনাকাল সপ্তদশ শতক [১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ]। হরিদেবের 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছিল ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে। রুদ্রদেবের 'রায়মঙ্গল' [খণ্ডিত পুঁথি/সংখ্যা ২২৬৬/বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ] রায়-গাজির সংঘর্ষের বর্ণনা আছে। গাজির সেনারা ফকির। দক্ষিণরায়ের বাঘ-সেনা। উভয়েই অপরাজিত এখানে। 'ঢেঁকিতে চড়িয়া নারদ আসিয়া যুদ্ধ মিটাইয়া দিয়াছে।' মূলতঃ প্রচলিত লৌকিক কাহিনীই 'রায়মঙ্গল' কাব্যগুলিতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনার বৈচিত্র্যের জন্য ও কাহিনীর পল্লব বিস্তারের জন্য কবিরা নতুন নতুন বিষয় বিন্যাস করেছেন। অনেক পৌরাণিক উপকরণ এই কাব্যধারায় সংশ্লেষিত হয়েছে।

'হরিদেবের দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বর শিবের সন্তান। তাঁহার মাথায় জরির পাতা ['স্বর্ণচিরৎ'], গায়ে খাসা জোড়া, কপালে চন্দন তিলক, তিনি নানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও ধনুকধারী এবং শার্দূলবাহন ক্ষেত্রপাল। তাঁহার কর্ণমূলে মুক্তা, কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র, ভুজ আজানুলম্বিত, অঙ্গে নানা রত্নালঙ্কার এবং উভয় গণ্ড সিন্দুর মণ্ডিত। দুই হাতে ঢাল তলোয়ার এবং বাহনরূপে ব্যাঘ্র পাইয়া ইনি দেবতাদের অগ্রে গমন করিলেন।'

প্রসঙ্গত, বৈদিক রুদ্রদেবতার মুকুট, অলঙ্কার ও নিস্কমালার সাদৃশ্য রয়েছে। নিঘণ্টুতে রুদ্র কৃষির দেবতা ও ক্ষেত্রপাল। দক্ষিণরায় রুদ্রশিবের পুত্র [?]। তাই তিনি কৃষির রক্ষক ও বনের অধীশ্বর। 'বৈদিক রুদ্রের পূর্বদেশীয় দুই পুত্র ভব ও শর্বকে যথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও কালু রায় বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে।......ভব ও শর্ব উভয় দেবতা আদিতে বৈদিক আর্যমণ্ডলের বাহিরে [সম্ভবতঃ আদিম আর্য কর্তৃক] পূজিত হইতেন। অর্থববেদে ভব ও শর্ব দেবতা সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, তাহা দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায়ের চরিত্রধর্মের প্রায় অনুরূপ'। 'দক্ষিণরায়কে শার্দূল বাহন দিলেন শিব। কালু রায়কে ইন্দ্র বাহন দিলেন অশ্ব।' "মধু দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণরায়ের শরীর থেকে অসংখ্য ক্ষেত্রপাল জন্ম নিল—বরাহ পুরাণে আছে শিব, গণেশাদি দেবতা ক্ষেত্রপাল—'তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্বাঃ'। দক্ষিণরায়ের পুত্রের নাম ভৈরব-বেতাল" [উপরের

চারিটি উদ্ধৃতিই ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'সাহিত্য প্রকাশিকা' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ভূমিকাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে]। দক্ষিণরায়, হরিদেবের কল্পনায় 'ঝারা-বারা' রূপে আবির্ভূত, সমুদ্রগর্ভে। এই 'ঝারা-বারা' জলে ভাসে। প্রথমত এটা মায়ামূর্তি। পদ্মদহে ঝারা-বারারূপে দক্ষিণরায়ের আবির্ভাব অলৌকিক তাৎপর্যপূর্ণ। 'ঝারা-বারা' প্রসঙ্গে বলা যায়, কুষাণ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত, ঐশ্বর্য, প্রাণ ও আরোগ্যের দেবতার প্রতীক হচ্ছে ঘট। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও যুগল ঘটবারি পূজার প্রসঙ্গ আছে। তান্ত্রিক, পাশুপত সম্প্রদায়ের মুণ্ডমালা ও করোটিপাত্র জানপদ ধর্ম-দর্শনের প্রভাবে ও মিলনে বাংলার মুণ্ডপূজার প্রচলন হয়। কালীঘাটের 'মায়ামুণ্ড' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্র.]।

"'রায়-দেবতা' ও 'রায়'-মঙ্গল প্রসঙ্গে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতেছে। কেবল ব্যাঘ্রবাহন দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থই 'রায়মঙ্গল' নহে, এবং কেবল ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দেবতাই রায় দেবতা নহেন।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রঃ] রায়মঙ্গল কাব্যে ব্যাঘ্র দক্ষিণরায়ের সঙ্গে ত্রিবেণীযুক্তঃ ক. বাহন ও বাঘ-বাহিনী খ. অবিমিশ্র ব্যাঘ্ররূপী দেবকল্পনা গ. মিশ্র বাঘ সম্পৃক্ত। বাঘ কুলকেতু ও কুলপদবী বাংলাদেশে সহজলভ্য। বাংলাদেশে ব্যাঘ্রপূজার কটি লৌকিক রূপ সহজদৃষ্ট। যেমনঃ ১. পূর্ববঙ্গের কৃষকেরা বিশেষতঃ মৈমনসিংহে গো-রক্ষার জন্য সাধারণভাবে পৌষ-সংক্রান্তিতে ধান-চালের উপচার দিয়ে 'ব্যাঘ্রপূজা' করে থাকেন। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্র.] ২. 'সোনাই-বাঘাই'-এর ব্রতকথা ও পূজা এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণরায় ও ধর্মঠাকুর-সাদৃশ্য অনেকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে। দক্ষিণরায় রুদ্ররূপে পঞ্চানন এবং রাউতরূপে ধর্মরায়। ধর্মরায়ও দক্ষিণরায়ের মত মুণ্ড-বলি-প্রিয়। দক্ষিণরায় রুদ্রপুত্র। মহিষ তাঁর প্রিয় বলি। "দক্ষিণরায় 'দক্ষিণদর' বা 'দক্ষিণদ্বার' নামে পরিচিত। 'যমের দক্ষিণদ্বারের' সহিত ধ্বনিসাদৃশ্যে দক্ষিণরায় সহজেই 'দক্ষিণদ্বার' হইতে পারেন লোকবিশ্বাসে।

"রুদ্ররূপে দক্ষিণরায় মন্দিরবাস পছন্দ করেন না।······শিবের সন্তানরূপে হরপ্রিয় নিম্ব-বট-বিল্বাদি বৃক্ষতলে রায়ের আশ্রম। গাছে 'আরোহণ' বা গাছে 'অবস্থান' করিয়া দক্ষিণরায়ের চরম-পূজা করিতে হয়। ঋগ্বেদে আদিম

ব্রাত্যদের 'নৈচাশাখ' বৃক্ষপূজার উল্লেখ আছে। দক্ষিণরায়ের বৃক্ষপ্রীতি বা 'জঙ্গলবিলাস'—এইরূপ কোনো পরম্পরাগত বলিয়াই অনুমান করি। প্রাগৈতিহাসিক কালের এই পূজাবিধি 'বৌদ্ধ ব্যাঘ্রজাতকের' সহিত তুলনায় সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্র.]

আমরা মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য পর্যালোচনা করে বৈদিক-পৌরাণিক দেবভাবনার সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণরায়কে আবিষ্কার করলাম। অথচ অন্যমতে দক্ষিণরায় 'অপৌরাণিক বনদেবতা' বা 'আদিম দেবতা' বলে পরিচিত। সন্দেহ নেই, দক্ষিণরায় পরম পরাক্রান্ত দেবতা। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায় পূজকদের কাছে তিনি অরণ্যাধিপতি ; মানুষের প্রাণরক্ষক। মূলত বাউলে, মৌলে, কাঠরেদের বা সূর্য-উপাসক সৌরা বা সবরদের কুলদেবতা বলেই অনুমিত [দ্র. ঐ]।

ছয় : দক্ষিণরায় প্রসঙ্গে কয়েকটি অনুমান ও সিদ্ধান্ত :

১. দক্ষিণরায় শিবের সন্তান [রায়মঙ্গল/হরিদেব]।

২. 'অম্বিকারূপিণী উর্বশীকে দেখিয়া শিবের স্খলিত চন্দ্রসম বীর্য হইতে ধবলবর্ণ ['শত বিধু জিনি শোভা'] দক্ষিণেশ্বরের জন্ম [দ্র. ঐ]।

৩. 'কপোতাক্ষ নদী তীরবর্তী ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুটরায়ের পরমবন্ধু ও রাজকার্যে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন সেনাপতি দক্ষিণরায়। দক্ষিণরায়ও ব্রাহ্মণ এবং দেবভক্তি পরায়ণ।' মুসলমানী পুথিতে আছে :

'দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোসাঞি,
তার সমতুল বীর ত্রিভুবনে নাই।' [৭৯]

৪. 'অষ্ট্রিক-মঙ্গোল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনূপপ্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন'।[৮০]

৫. হরিদেবের [রায়মঙ্গল] মতে, দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায় ও কালুরায়, শিবের কামজ ও যমজপুত্র এবং শীতলা রুদ্র-শিবের কামজ কন্যা। দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপাল জনয়িতা ক্ষেত্রপাল।[৮১]

৬. 'দক্ষিণদার' দক্ষিণদেশ শাসন করতেন আর 'বদিনদার' উত্তরদেশ শাসন করতেন। কোন এক দেবাধিপতির অধীনে প্রাচীনতম বাংলাদেশে এঁরা এই দুই দেশের শাসক ছিলেন। এই দেবমুণ্ডগুলি সেই হারানো রাজ্যের স্মৃতি মাত্র।[৮২]

দ্বিতীয় পর্ব

এক. অনুমান, পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত

এতক্ষণ 'দক্ষিণরায়' বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছি। এত বিশদ ঐতিহাসিক আণুবীক্ষণিক নিরীক্ষা করলাম শুধু জাতি-বিদ্যার আলোকবিচ্ছুরণের ন্যূনতম অবকাশের জন্য। যে দেবতা ও তাঁর অনুষঙ্গ নিয়ে এতকাল বাংলাদেশের গবেষক মহলে সমীক্ষা-সিদ্ধান্তের অবকাশের অন্ত ছিল না, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তার সামগ্রিক বিচার [সাম্প্রতিক সমীক্ষালব্ধ তথ্যের ও জাতিবিদ্যার আলোকে] করার নম্র প্রয়াস রয়েছে। তবে পূর্ব-আলোচকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পারি, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বক্তব্য বস্তুভিত্তিক নয়, এমনকি সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত নয়। সম্প্রতি জনৈক গবেষক ইতিহাস ও বস্তুগত তথ্যের দাবী অস্বীকার করে কতকগুলি দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন দক্ষিণরায় প্রসঙ্গে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমার পূর্বে-কৃত আলোচনায় নানা মত ও বক্তব্যকে খণ্ডন করেছি যুক্তি ও বস্তুগত প্রমাণের আলোকে।

বর্তমান প্রবন্ধকারের কিছু অনুমান, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত এখানে পেশ করা হলো:

১. যে বিস্তৃত জনপদে ও অরণ্যে 'দক্ষিণরায়' ও 'বারা-ঠাকুরের' পূজা প্রচলিত, সেই অঞ্চলের জনবসতি ও বিন্যাস একটি তাৎপর্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করবে। কারণ দেব-দেবী মানুষের 'মনসা, মণীষা ও হৃদ্‌জাত।' কোন স্বর্গীয় দিব্যানুভূতিতে মর্ত্যে দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি। সাহিত্যে 'স্বপ্নে'র কথা পেয়েছি; বাস্তবে মানুষের ধর্মীয় চেতনা শিল্পবোধে সমন্বিত হয়ে দেবতার মূর্তি কল্পনায় সার্থক রূপ নিয়েছে। তাই দক্ষিণরায়ের পূজকদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্দরবনাঞ্চলকে দক্ষিণরায় উদ্ভবের যদি কেন্দ্রভূমি ধরা হয়, তবে সুন্দরবনের প্রাচীনতম জন বসতির পরিচয় জানাও দরকার বোধ করি। ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণাদিতে জানা গেছে, এই অঞ্চলে [সুন্দরবনে] ভূমি-ভাগের বহুবার অবনমন ঘটেছে এবং অতি প্রাচীনকালে এখানে উচ্চবর্ণের বাঙ্গালীরা বসবাস করতেন না।[৮৩] আবাদ করার পর মুসলমান ও মগেরা প্রাধান্য লাভ করে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের আদম সুমারীতে এদের প্রাধান্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীকে সাধারণভাবে বলা হয়েছে 'মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়।'[৮৪] গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের

আদিমতম জন হলেন পোদ্। এঁদের 'পদ্মরাজ' বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ও বলা হয়।[৮৫] বর্তমান সুন্দরবন, ২৪পরগণা, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান যেমন বসবাস করছেন, তেমনি আছেন কিছু অন্য ধর্মাবলম্বী। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল এবং ওরাওঁরা প্রধান। দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর মাহিষ্য, বাগ্‌দী, বাউড়ী, মালো, জালোদের দ্বারাই পূজিত হন। অনেকে বুনোদের কথাও বলেছেন বটে; কিন্তু ১৯৭০-৭২ সালে হাসনাবাদ ও বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে এবং ১৯৭৩ সালে ২৪পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সমীক্ষা[৮৬] চালিয়ে বুনোদের মধ্যে বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। বুনোদের অনেকেই বলেছেন তাঁরা এই ঠাকুরের নাম জানেন না। বুনোরা মূলতঃ ছোটনাগপুরের ওরাওঁ। তাঁদের জ্ঞাতি-সম্পর্ক রাঁচির [ছোটনাগপুরের] ওরাওঁদের সঙ্গে। 'বন কেটে বসত' করার সময় সুন্দরবনে শ্রমিক হিসেবে প্রায় তিনশ বছর আগে বা ইংরাজ আমলে এঁরা এসেছিলেন। বাংলা ভাষাও তাঁরা জানেন। সুতরাং আমাদের এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না যে দক্ষিণরায় বা বারাঠাকুরের পূজকরা ছিলেন তপশীলীভুক্ত আদিবাসী, বর্ণহিন্দু ও মাহিষ্যরা। এঁদের সংস্কৃতিতে 'সর্বপ্রাণবাদের' রেশ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হিন্দুর দেব-ভাবনা। একদিকে শবর ও নিষাদাচার, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য-পূজা-পদ্ধতি ও মূর্তিকল্পনা। পৃথিবীর যে কোন দেশের মূর্তিবিদ্যা কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে পূর্ণায়ত মূর্তি রচনা করে। যেমন: পাথর, নুড়ি, গাছ-পালা, বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষ, বৃক্ষশাখা, প্রতীক, মুণ্ড, পশু ও মানুষের মিশ্রণ, শুধু পশু-জীব প্রতীক, [বাহন] মানুষী মূর্তি, একাধিক ভুজ বিশিষ্ট শক্তিমান/শক্তিমতী দেবদেবী [বিভিন্ন প্রহরণধারী]।

২. অনেক গবেষক 'বারাঠাকুর' ও 'দক্ষিণরায়কে' এক ও অভিন্ন বলেছেন এবং বারাঠাকুরের মুণ্ডমূর্তি গণেশের মূর্তি বলে অনুমান করেছেন। গণেশের প্রসঙ্গটি স্থানীয় লোকজনেরাও উল্লেখ করেন। তার কারণ, ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে আলোচ্য ঠাকুরের প্রসঙ্গে গণেশ প্রসঙ্গটি প্রাধান্য লাভ করেছে। পুরোহিতেরা এই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েই পূজারীদের কৌতূহল নিবৃত্ত করেছেন এবং সেই সঙ্গে বারাঠাকুরকে কৌলিন্য দান করেছেন—লৌকিক স্তর থেকে শাস্ত্রীয় স্তরে পূর্ণ মর্যাদায় তুলে নিয়ে এসে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এই কাহিনী আছে। কথিত আছে, শনির স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তিনি যার প্রতি দৃষ্টি দেবেন, সেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। একদা পর্বতীর

নবজাতককে দেখতে গিয়ে শনি অধোমুখে বসে ছিলেন। কিন্তু পার্বতীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি যেই নবজাতকের দিকে একবার তাকালেন, এমনি গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হলো। বিষ্ণু এই দুঃসংবাদটি পাওয়ামাত্র সুদর্শন চক্র দিয়ে পথিমধ্যে শায়িত 'ঐরাবত হস্তীর' মুণ্ড কর্তন করে গণেশের স্কন্ধে জুড়ে দিলেন। এবং দেবতারা ঠিক করলেন দেবতাদির পূজার শুরুতেই গণেশের পূজা করতে হবে। গণেশ তাই 'সিদ্ধিদাতা' হয়ে উঠলেন: [শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত (১৩৭০) পৌরাণিক অভিধান। পৃঃ ১৪৪]।

কিন্তু 'আদিতে গণেশ ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নন, কর্ম বিঘ্নের দেবতা।' গণেশ এক নন, বহু। মহাভারতে গণেশ প্রসঙ্গে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। গণেশ বিঘ্নেশ। বিঘ্ন গণেশের একটি নাম। অন্যনাম একদণ্ড। হস্তীর দুটো দাঁত থাকাই স্বাভাবিক। দাঁতটি আবার রক্তবর্ণ। কারণ ঐ দাঁতেই রক্তস্নান করা হয়েছে। গণেশের বহুনামের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নাম হলো: 'দ্বিদেহক'। গণেশের দুটি স্বতন্ত্র দেহ। এক. বিঘ্নরাজ; দুই. সিদ্ধিদাতা। গণেশ আদিতে মরুভূমি, পর্বত ও বনজঙ্গলের গণদের বিশেষ দেবতা ছিলেন। আর্য দেবকুলে প্রবেশের পূর্বেই তিনি পশুপতি [শঙ্কর] ও ভূতপতির [শিব] সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। আর্য দেবলোকে প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পুরাণাদিতে বহুবিচিত্র গণেশের জন্মকাহিনী তৈরী করা হয়েছে। এবং এই কাহিনী বয়নে সময় লেগেছিলো বেশ কয়েক শতাব্দী।[৮৭] আদিতে গণেশ 'গণ'দের অধিপতি।[৮৮] এই সূত্রেই গণেশ লোকবন্ধু, লোকনাথ [দ্র. 'লোকায়ত দর্শন']।

এখানে 'গণ' শব্দটি প্রাক্-বিভক্ত যৌথ সমাজকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ শব্দটি সমষ্টিবাচক। 'গণ' আবার কোমজনকেও বোঝাত। 'গণপতি' তাই কোমপতি: আদিম জনপতি। এই শব্দার্থ-তাৎপর্য পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যায় অনুপস্থিত। শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে না; অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন তাই বর্তমান অনুসন্ধানে অপরিহার্য।

যে কাব্যে 'দক্ষিণরায়'-মহিমা বর্ণিত এবং 'বারা' প্রসঙ্গ উল্লিখিত সেই কাব্যগুলির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। যদিও লোক-ঐতিহ্য সপ্তদশ শতকের পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বারা ঠাকুরের রূপ ও লোকাচারে যে আদিম তাৎপর্য রয়েছে, এই কাব্যগুলিতে সে কথা বর্ণিত নেই। শুধু 'বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার।/মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার॥/কাটামুণ্ড বারা পূজা

সেই হইতে করে ।/কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে ॥' এই 'কাটামুণ্ড বারা' অর্বাচীন কাহিনী সম্পৃক্ত। মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের। এই কাব্যে ['রায়মঙ্গল'/কৃষ্ণরাম] আবার এই উক্তি খণ্ডন করে কবি নিজেই বলেছেন : 'বাঘের উপরে নাঞি দক্ষিণের রায়। / একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায় ॥' এই বারা মূর্তিকে যাঁরা 'কর্তিত নৃমুণ্ড প্রতীক দক্ষিণরায়-বারা আদিম নরবলি বা মুণ্ডশিকার প্রথার স্মৃতি' অথবা 'কৃষি সহায়ক আদিম উর্বরতা জাদুবিশ্বাস সঞ্জাত কাণ্ডবিহীন কর্তিত নৃমুণ্ড পূজা' বলে সিদ্ধান্ত করেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ এই সিদ্ধান্ত অনুমান নির্ভর। বস্তুগত সাক্ষ্য প্রমাণ খুবই দুর্বল। এই সিদ্ধান্তের উপান্তের ধারণায় দক্ষিণরায় ও বারামূর্তি অভিন্ন ধরা হয়েছে। 'রায়মঙ্গল কাব্যের' অর্বাচীন প্রমাণে শুধুমাত্র এর আংশিক সমর্থন বর্তমান। যদি 'বারাপূজা' অর্বাচীন হয়, তবে এর আদিম রূপটা কি ? আর যদি বারাপূজা আদিম হয়, তবে অর্বাচীন দক্ষিণরায়ের ব্রাহ্মণ্য পূজাচারে বারাঠাকুর সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানে যতই হিন্দু প্রভাব পড়ুক না কেন, আদিম রূপ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। 'রায়মঙ্গল' কাব্যের কবিরা আপন কল্পনা মতন, সমাজের শিষ্টজনদের চাহিদা মতন কাহিনী বয়ন করেছেন। লোককাহিনী লিখিত হবার প্রাক্কালে শিষ্ট-কবি আপন সমাজের অনুকূলে কাব্য লেখেন। তাই পৌরাণিক-শাস্ত্রীয় কাহিনী-বুনট এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য বিক্ষিপ্ত লৌকিক উপকরণ একেবারে অনুপস্থিত নয় এই কাব্যগুলিতে। আবার কাব্যগুলিকে লোকসংস্কারের অভিজ্ঞানও বলা যায় না।

নরবলির যে প্রসঙ্গটা এই কাব্যে আছে, তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। গঙ্গাসাগরে একদা সন্তান বিসর্জন দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। আজ আর তা নেই। দেবতা যত আদিম তাৎপর্যমণ্ডিত হবে সংস্কারের আদিমতা ততই উগ্র হওয়া স্বাভাবিক। নরবলি প্রথা এখনও ভারতের বহু আদিবাসী লোকাচারে বর্তমান। ডাকাতে-কালীর কাছে 'নরবলি' দেওয়ার রীতি ইংরাজ আমলেও ছিল, আজও হয়ত আছে। পশুবলি নরবলিরই অর্বাচীন রূপমাত্র।

হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের যৌগিক প্রভাবে 'রায়মঙ্গল কাব্য'গুলিতেও বিরুদ্ধ তথ্য এবং ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। কেননা 'তন্ত্রধর্মই বাঙ্গালীর আদিধর্ম'।[৯২] বারা ঠাকুরের 'জাঁতালে' পঞ্চ মকারের প্রাধান্য প্রসঙ্গত

লক্ষণীয়। 'পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। যে মদ্যমাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়' ['লোকায়ত দর্শন']; এর সঙ্গে কৃষিভিত্তিক জাদুবিশ্বাসও সক্রিয় রয়েছে; যেমন রয়েছে হালাকাটা, বেণাকি ও আটেশ্বরের সঙ্গে। এই কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটি কী?—এক কথায় 'মানবীয় প্রজননের সাহায্যে বা সংস্পর্শে প্রকৃতির উৎপাদনকে আয়ত্তে আনবার পরিকল্পনা' [ঐ]।

আদিম সমাজে উৎপাদন ক্রিয়া ব্যতীত সঙ্গীত বা কাব্য-কবিতা রচিত হত না। তাই 'জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান [ritual] আদিম মানুষের কাছে জীবনসংগ্রামের উৎপাদন ক্রিয়ার অন্যতম সহায় মাত্র' [ঐ]। জাঁতালে বা বারাপূজায় পশুবলি অথবা টুঁটি নিবেদন কৃষিমৌল আচার-অনুষ্ঠান ও জাদু-বিশ্বাস সম্পৃক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির বা কৃষিভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা। 'কালিকা-পুরাণে' নরবলির ব্যবস্থা আছে। সেকালে নরবলি শ্রেষ্ঠ বলি হিসেবে গণ্য হত। দুর্গাপূজায় নরবলি প্রথা একদা ভারতে প্রচলিত ছিল। শুধু দুর্গাপূজায় কেন, কাপালিকেরা নরবলি দ্বারা অভীষ্টলাভ করতেন ['কপালকুণ্ডলা' দ্রষ্টব্য] পূর্ববঙ্গে দুর্গাপূজায় সপ্তমী-নবমী পর্যন্ত ছাগল, মহিষ, আখ, কুমড়া বলি দেওয়া হয়। নবমীর ভোররাত্রে পিটুলীর নরমূর্তিপ্রতিম মানকচুর পাতায় মুড়ে বলি দেওয়া হয়। এর নাম ভূতবলি বা শত্রুবলি। আদিম সমাজে এই জাদুবিশ্বাস কৃষক সমাজের হাতিয়ার বা রক্ষাকবচ। সুন্দরবনাঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গে সামন্তপ্রভু বা জমিদারেরা যে [হাসিলকরা] জমি কৃষকদের বা বর্গাদারদের চাষাবাদের জন্য দিতেন, তার কিছু জমি বারাঠাকুরের 'জাঁতালের' জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এখনও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কিছু গ্রামে এই ধরণের দেবোত্তর জমি আছে। এইগুলি মূলত 'যজমানী' রীতির বিবর্তিত রূপ।[৯৩] 'যজমান' প্রসঙ্গে মনিয়ার উইলিয়মস্ বলেছেন, 'যিনি যজ্ঞের বলির মূল্য দেন তিনিই যজমান।'

নরবলির প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের শূনঃশেপ স্তোত্রে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, পুরাণে, তন্ত্রে, সোমদেবের গল্পে রয়েছে। 'জ্যোতিবারা' নামক দেবতার কাছে 'সন্ন্যাসী জিপ্সীরা' নরবলি দিত; 'কথাসরিৎসাগরে' এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 'বনবিবির জহুরানামায়' এবং 'রায়মঙ্গলে'ও নরবলির প্রসঙ্গ আছে। দক্ষিণরায় ধনাই মউলেকে স্বপ্নে বললেন: 'যদি তুমি নরবলি-পূজা পার দিতে।/সাত-ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে॥' কালক্রমে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ফলে এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নরবলি পশুবলিতে

রূপান্তরিত হয়েছে। বারামূর্তি যদি 'কর্তিত মুণ্ড' হতো তবে ভূমিতে শায়িত থাকত। এবং আয়ত চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হতে পারত না। ত্রিপুরায় 'চতুর্দশ দেবমুণ্ড' পূজার রীতি আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও মুণ্ডপূজার রীতি আছে। সুতরাং বারাঠাকুর একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্ররক্ষক দেবতার মুণ্ডমাত্র। সম্ভবত 'বেণাকির মুণ্ড'। বেণাকিও ক্ষেত্রপাল দেবতা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামের শস্যক্ষেত্রের প্রান্তে পূজিত হন। বেণাকি কাদামাটির তৈরী একটি মনুষ্যমূর্তি। ক্ষেতে উপুড় হয়ে শায়িত, হস্ত-পদ প্রসারিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে জমির মাটিতেই বেণাকি মূর্তি গড়তে হয়। মাথাটি গরুড়ের মত। সামনে থাকে দুটি মাটির তৈরী ঢেলা। মনে হবে, মানুষ ও পশুর সংমিশ্রণে আবির্ভূত একটি দেবতা। জনশ্রুতি, এই মাথাটি গণেশের হারানো মুণ্ড। লোক-সমাজের প্রয়োজনে ক্ষেত্ররক্ষক দেবতা শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন। এমন নজীর বাংলার লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রে দুর্লভ নয়। বারা ঠাকুর যে আদিম লক্ষণাক্রান্ত, তার কিছু কারণ আছে। যেমনঃ ১. 'বারা' শব্দটি 'বাটিকা-র' বিবর্তনে সৃষ্টি। [বাটিকা=বাটি=বাড়ি=বেড়া=বাড়া=বারা] 'বেড়া' মূলতঃ কার্পাস ক্ষেত্রের 'আল্'কে [সীমানা] বোঝাত।

সাঁওতালী, হো, মুণ্ডারি, খাড়িয়া ভাষায় 'বেড়া' শব্দটি প্রচলিত। এর অর্থ সূর্য, সময়। অবশ্য বেগড়া ভাষায় এর অর্থ 'বেলা'।[৯৪] সেই বেলা শব্দটি আমরা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেছি যেমন, বেলা বেড়েছে, বেলা পড়ে এলো, 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' [রবীন্দ্রনাথ]।

২. বাড়া=বারা। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া; পরিষ্কার করা; বেড়ে দেওয়া। ধনে, কুলে, শীলে বাড়ান; রাজস্বের পরিমাণ বাড়ান; বাইরে ['বঙ্গীয় শব্দকোষ']।

৩. একটি চাকমা প্রবাদে আছে, "ধিঙি স্বর্গত গেলেয়ো **'বারা'** বানে।'[৯৫] ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া দেয় অর্থাৎ ধান ভানে। 'বারা' শব্দের এখানে অর্থ—ধান বা শস্য।

পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী ত্রিপুবারা 'বড় ঠাকুর' নামে একটি লৌকিক দেবতার পূজা করত। এই দেবতা মূলত আঞ্চলিক সামন্তপ্রভু। রাজা, যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই ছিল রাজ পরিবারের বংশ পারম্পর্য ধারা।[৯৬]

ত্রিপুরী ভাষায় 'বারা' শব্দের অন্য একটি অর্থ প্রচলিত আছে। সেটা

এই—ছোট ; খাটো লোক।[৯৭] সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মুণ্ড মূর্তিই বারা ঠাকুর। কারণ ইনি আকারে ছোট। ইনি এই অঞ্চলের আদিম দেবতা এবং ইনি ক্ষেত্রপাল, ভূমিরক্ষক দেবতা হিসেবেই প্রথমে আবির্ভূত হন। কালক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রভাবে তাঁর বর্তমান রূপ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে। এবং দক্ষিণ রায় ও অন্যান্য স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে ভাবানুষঙ্গে মিশে গেছেন। যেমন মিশে গেছেন ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলে। শিব ও সূর্য একদা বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মাচারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই বারাঠাকুর সূর্য সম্পৃক্ত দেবতাও বটে। 'আঁটেশ্বর' ও মাকাল [মহাকাল] আবার শিব সম্পৃক্ত দক্ষিণ বঙ্গের অনন্য লৌকিক দেবতা। অন্যত্র এই প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে।

ত্রিপুরার আদিবাসীরা নিম্নবঙ্গে যে একদা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে ত্রিপুরেশ্বরী ও ত্রিপুরাসুন্দরীর [বোড়াল / ২৪ পরগণা] মন্দির ও মূর্তিগুলিতে। একদা এই দেবীর পূজায় বামাচার প্রচলিত ছিল। নরবলিও হত। তান্ত্রিক প্রভাবে বাঙ্গালীর লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাসে ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় তান্ত্রিকতা সম্প্রসারিত হয়েছে। বামাচার এখনও নিম্নবঙ্গের বহু লৌকিক দেব-দেবীর পূজায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন বড়ামচণ্ডী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি।

৪. দক্ষিণরায়—দক্ষিণের ভূপতি; সামন্তপ্রভু; এমনকি 'বসন্তরায়' তাঁর দোর্দন্তপ্রতাপ ও বাহুবলের জন্য কালক্রমে লোকমানসে 'দক্ষিণরায়' হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নিম্নবঙ্গে বহু পীর, গাজী ও লৌকিক দেবতার [বনবিবি, সত্যপীর ইত্যাদি] সৃষ্টি হয়েছিল, সেই লোক-চেতনায় মানুষের দেবায়ন অসম্ভব ঘটনা নয়। বড়খাঁ গাজী, পীর গোরাচাঁদ যেমন দেবায়িত হয়েছেন, তেমনভাবে বসন্ত রায় 'দক্ষিণরায়' [ছদ্মনামে ?] হওয়া সম্ভব। রামগোপাল রায়ের 'সারতত্ত্বতরঙ্গিণী'তে [১৮৩৮] রয়েছে :

'যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরব।'

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের প্রধানমন্ত্রী। তিনিই সমাজের নেতা। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর হাতে থাকত 'গঙ্গাজল' নামক তরবারি [ধপ্‌ধপির মন্দিরের দক্ষিণরায় তরবারি, তীরধনুক, বর্শা, ঢাল এমন কি বন্দুকও

ধারণ করছেন। ('যশোহর-খুলনার ইতিহাস')। দক্ষিণরায় অর্বাচীন দেবতা। লক্ষণীয় এই, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাত্র কয়েকটি গ্রামেই দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা দক্ষিণরায় অনিবার্য সামাজিক কারণেই লোকপ্রিয় 'বারাঠাকুরের' পূজায় প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ভাবানুষঙ্গে উভয়েই একাত্ম হয়ে গেছেন। আজকের নিম্নবঙ্গের লোকেরা 'বারা' নামটি বিস্মৃত হয়েছেন। দক্ষিণরায়, দক্ষিণদ্বার বা দক্ষিণেশ্বর নামটিই অধিক প্রচলিত। অথচ উভয়ের মধ্যে মূর্তি-প্রকরণগত পার্থক্য প্রচুর। বারাঠাকুরের শিরস্ত্রাণ [পুষ্প শোভিত] দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তিতে অনুপস্থিত। বারাঠাকুর মুণ্ডমাত্র ; দক্ষিণরায় দ্বিভুজ, পূর্ণায়ত মূর্তি। জানু পেতে বীর যোদ্ধার বেশে উপবিষ্ট। আয়ত চক্ষু ; দক্ষিণমুখী। "বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে কুমীরের [মাটির] মূর্তি গড়ে খেজুর কাঁটা বা তেঁতুল বিচি বসিয়ে 'দক্ষিণরায়ের' প্রতীক গড়ানো হয়"।

৫. মাঘ মাসের ১লা তারিখ উভয় দেবতার পূজা—এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন বাংলায় ১লা মাঘ থেকে বর্ষ শুরু হোত। বর্ষ শুরুতে ক্ষেত্রপাল পূজা বিধেয়। শস্য সংরক্ষণের জন্য এই দেবমণ্ডলীর পূজা অপরিহার্য। 'মাঘ'[৯৮] শস্য ফলনের ঋতু সঞ্চারক। এই মাসে জন্মে 'কুঁদফুল—[কু (ভূমি), উন্দ (আর্দ্র করা)+অ (জ্ঞা,) বি শ্বেতবর্ণ। রোমশ গন্ধহীন প্রসিদ্ধ পুষ্প।' অন্য অর্থ 'ছেদন' করা। তাই মাঘ মাসের প্রথম দিনেই এই দেবতার পূজা করা হয়। এই দেবতাদ্বয় বিসর্জিত হন না। গ্রাম-দেবতারা সারা বছর পূজা পেয়ে থাকেন গ্রাম-রক্ষক বলেই। সুতরাং বিসর্জন এখানে অন্তত লৌকিক সংস্কার-বিধেয় নয়।

বারা ঠাকুরের প্রাচীনতম [?] প্রস্তর নির্মিত মূর্তি হরিনারায়ণপুরে ও 'পত্রাকার শিরোভূষণযুক্ত একটি আদিম পোড়ামাটির মূর্তি হুগলী নদীর চরে নব্যপলীয় যুগের প্রস্তরায়ুধের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে'।[৯৯] 'রত্নগর্ভ আটঘরা' প্রবন্ধে নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'অসংখ্য মূর্তি পুতুলের মধ্যে অন্ততঃ আরেকটির উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্রাকৃতি এই পোড়ামাটির মূর্তিটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন—সুঙ্গ-কুষাণ যুগের। দীর্ঘ কণ্ঠযুক্ত মুকুটশোভিত পুরুষমূর্তির মুখমণ্ডলটি সম্পূর্ণ অভঙ্গ। কণ্ঠের নিম্নে বৃত্তাকার পাদপীঠ। বর্তমানকালের নিম্নবঙ্গের লৌকিক দেবতা বারাঠাকুরের সঙ্গে নিকটতম সাদৃশ্য যে কোন গবেষককে বিস্মিত করে'। কয়েকটি শীলমোহরে [হরিনারায়ণপুর]

বৃক্ষবন্দনা, সর্প উপাসনার মোটিফ উল্লেখযোগ্য। এমন কি কয়েকটি ভগ্ন পানপাত্রও পাওয়া গেছে। মদ্যপান রীতি যে প্রাচীন বঙ্গে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'সাঁতালে' মদ্য-মাংস পান-ভোজন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

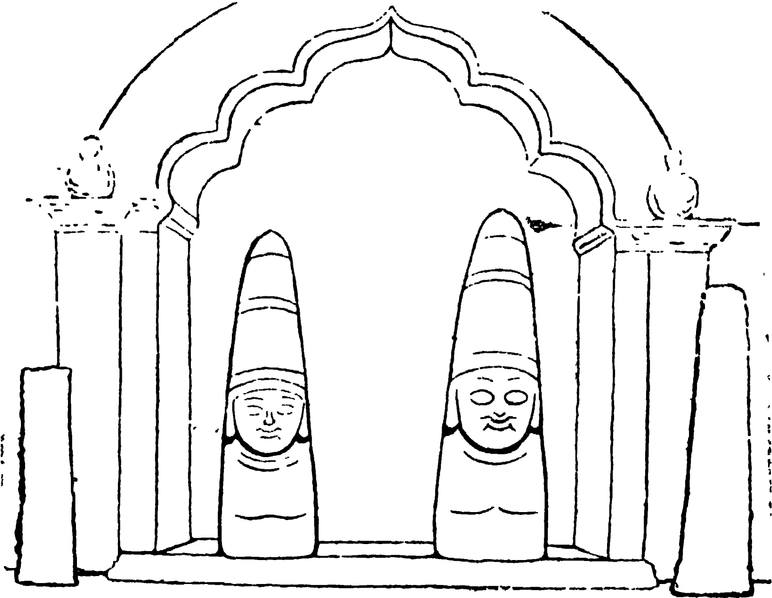
৬. দক্ষিণ রায় বা বারাঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের 'কুট্রনদেবর' বিশলমরী, অথবা 'জেনাস', [ক্রীট], মিশর বা গ্রীসের কোন কোন দেবতার আংশিক মিল থাকতে পারে। [৺কালিদাস দত্ত ও ৺সুধাংশুকুমার রায় এই প্রসঙ্গের প্রধান প্রবক্তা]। এই মিল ভাবানুষঙ্গের দূরান্তিক বহিরঙ্গ মিল মাত্র। আদিম-লৌকিক চেতনায় বিশ্বের বহু সমভাবাপন্ন, প্রায় অনুরূপ প্রকৃতি-মণ্ডলের অধিবাসী, আদিম মানবগোষ্ঠীর দেবভাবনার মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু বিস্তারে ও লোকাচারে, উদ্দেশ্যে অনেক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হবে। বারাঠাকুরের মুণ্ডমূর্তির সাদৃশ্যও রূপগত, বস্তুগত নয়।

৭. অনেকে বলেছেন, 'বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায় অভিন্ন এবং কৃষি, জাদু-বিশ্বাস, প্রজনন ও উর্বতার দ্যোতক'। একটু বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিশ্বগত লোকচেতনার ফলশ্রুতি আহরণ করলে দেখা যাবে বিশ্বের উর্বরতাবাদ ও প্রজননের দেবতা মাত্রই নারী। হোয়াইট হেড্ এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, 'উর্বরতা ও প্রজনন মূলত নারী-মৌল। তাই কৃষির দেবতারা নারী।'[১০০] অবশ্য কালক্রমে সংস্কার সংক্রমণে ও লোকবিশ্বাসের গতিশীল সঞ্চারণে নারী দেবতার গুণ পুরুষদেবতায় সংক্রমিত হতে পারে।

নিম্নবঙ্গের ইতিহাস ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস; উত্থান-পতনের ইতিহাস। বহু সভ্যতার স্রোত এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বহু নগরী, জনপদ জলমগ্ন হয়েছে। বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অনেক হারানো ইতিহাসের প্রত্ন-উপকরণ পাওয়া গেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো পাওয়া যাবে। সেদিন আমরা ইতিহাসের পূর্ণ অবয়ব সংস্থান করতে পারব। অধুনাপ্রাপ্ত উপকরণের আলোকে বলা যেতে পারে 'বারাঠাকুরের' পূজা অতিপ্রাচীন [আটঘরায় প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তি]। দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক সংস্কৃতির মিলনে এই আদিম ক্ষেত্রপাল বনদেবতার সৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত উপকরণ তুলে ধরেছি। দক্ষিণ রায় অর্বাচীন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেই তার প্রকাশ। রায়মঙ্গল কাব্যগুলি বিচার করেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি। রায়মঙ্গল কাব্যে 'বারা' প্রসঙ্গ এসেছে লোক-ঐতিহ্যের স্মৃতি ও শ্রুতির পথ বেয়ে। লোকসমাজ ও লোকস্মৃতি অবলীলাক্রমে সংস্কৃতি-রেণুকে সংশ্লেষণের

মধ্য দিয়ে পূর্ণ পল্লবিত কাহিনীতে নিয়ে যায়। আমাদের লোককথা ও গাথাগুলি তারই পরিচায়ক।

পূর্বোল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে দক্ষিণরায় দক্ষিণবঙ্গের বা নিম্নবঙ্গের ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত একটি লৌকিক দেবতা। পক্ষান্তরে বারামূর্তি অতি প্রাচীন, [এমন কি, বঙ্গদেশে মনসা, চণ্ডী, শিব প্রভৃতির পূজা প্রচলনের পূর্বেকার] এক অন্-আর্য লোকায়ত ক্ষেত্রপাল দেবতা। এই দেবতার উদ্ভবে তন্ত্র, জাদুবিশ্বাস ইত্যাদি বিশেষ সহায়তা করেছে। দক্ষিণরায় মানুষেরই দেবায়িত রূপ; কালের ও সমাজের অনিবার্য প্রয়োজনে এর সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে ধর্ম সমন্বয়ের প্রভাবে বারাঠাকুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।



বিশলমরী [দক্ষিণ ভারত]

'আমার পৃথিবী' গ্রন্থে দানিকেন বলেছেন যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের খোদাই কাজ ও ছবির বিষয়বস্তুতে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। 'শিরস্ত্রাণ পরা' জ্যোতির্বলয়বিশিষ্ট দেবতারা পৃথিবীর সর্বত্র রূপগতভাবে একই রকম। যে রূপানুষঙ্গে 'বারামূর্তির' সঙ্গে মিশর, গ্রীস, ক্রীট, বা দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দেবতার সাদৃশ্য চোখে পড়ে, বৃটিশ মিউজিয়ামে [লণ্ডন] সংরক্ষিত আসীরীয়

রাজা অসুর বানিপালের [যোদ্ধবেশ] সঙ্গে দক্ষিণরায়ের রূপগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কেউ বা মেসোপটেমিয়ার 'বলিদাতার' মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারেন। আমরা বিস্মিত হই, যখন মেক্সিকোর 'মধুপদেব' ও সান্তালুসিয়ার স্তম্ভে অঙ্কিত সূর্যের উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে থাকা 'মধুপ দেবীর' মূর্তির সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণার 'বেণাকি', 'বিরিঞ্চির' রূপগত সাদৃশ্য দেখি। এর কারণ, পৃথিবীর আদিম মানব [অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়ড, নর্ডিক, যারাই হোন না কেন] মানসিকতার দিক থেকে 'তরল পৃথিবীতে' অভিন্ন ছিল। তাই 'ফোক্‌মাইনড'—লোকমানস, বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে একই ভাবানুসারী। সভ্যতার ক্রম-উর্ধ্বায়ণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, যখন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই 'বস্তুগত সংস্কৃতিতে' রূপভেদ দেখা দিল। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের মূলকথা, গ্রহণ-বর্জন ও দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে রূপান্তর। এই সত্য সর্বত্রই প্রযোজ্য।

অনুমান ও সমীক্ষার বহুবিচিত্র পথ বেয়ে আমরা শুধু এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, দক্ষিণরায় মূলতঃ কৃষকের দেবতা; ক্ষেত্রপাল দেবতা। সে ক্ষেত্র বন-বাদা, জঙ্গল বা কৃষিভূমিও হতে পারে; এমন কি গৃহও হতে পারে। শুধু গৃহ বলি কেন তিনি জীবন-রক্ষক; দুঃখহর, রোগহর [ধপ্‌ধপির মন্দির] দেবতায় রূপান্তরিত, এই রূপান্তরণ লোকসমাজের প্রয়োজনে হয়েছে। একদা জমিদার ও জোতদার শাসিত সমাজে বাংলার কৃষক আত্মরক্ষার তাগিদে ও বনভূমির উৎপাদন সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর, বনবিবির সৃষ্টি করেছিল। সেই সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে এই দেবতা পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে কাব্যের নায়ক হয়েছেন [রায়মঙ্গল]।

তৃতীয় পর্ব

পূজাচার সমীক্ষা

বর্তমান প্রবন্ধকার ড. জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরীর সহযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকটি গ্রামে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের বিভিন্ন তারিখে দক্ষিণদ্বার বা দক্ষিণ রায়ের পূজাচার সম্পর্কে সমীক্ষা চালান। তাতে যে বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ব উৎঘাটিত হয় তারই ভিত্তিতে আগের পৃষ্ঠাগুলির আলোচনা প্রণীত হয়েছে। এখানে তারই মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটি গ্রামকে নির্বাচন করে নিয়ে একটি সারণি প্রস্তুত করা হলো। সমস্ত গ্রামগুলিই ডায়ম্‌ণ্ড-হারবার মহকুমার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার থানার অধীন। সারণিটি নিম্নরূপ :

দক্ষিণদ্বার/দক্ষিণরায় পূজাচার সমীক্ষা

গ্রাম	পূজারী	পূজার কাল	পূজার উপচার	পুরোহিতের নাম	পূজার প্রাচীনত্ব	মূর্তি
১. জামবেড়িয়া[১]	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূলাদি / পশুবলি দেওয়া হয়।	শ্রীকানাই চক্রবর্তী	প্রায় ৫০০ বছর	ধূম ও কেতুর [যুগল মূর্তি]
২. কানপুর	শ্রীহৃদয় বৈদ্য [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূলাদি ও ল্যাঠা মাছ পোড়া। বলি হয় না।	শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী	প্রায় ৫০০ বছর	ধূম ও কেতু [যুগল মূর্তি]
৩. দেরিয়া	ডঃ হৃষিকেশ ভাণ্ডারী [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূলাদি/বলি হয়।	শ্রীশৈলেন ত্রিবেদী	প্রায় ৪০০ বছর	দক্ষিণরায় ও নারায়ণী [যুগল মূর্তি]
৪. বারদ্রোণ	শ্রীদুলাল নস্কর [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূল / বলি হয়।	পুরোহিত নেই	প্রায় ৪/৫ শ বছর	দক্ষিণরায় ও নারায়ণী [যুগল মূর্তি]
৫. পূর্ব বড়বেড়িয়া	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূল / বলি হয় না।	শ্রীহাবুল চক্রবর্তী	প্রায় ৪/৫ শ বছর	ধূম ও কেতু [যুগল মূর্তি]
৬. পূর্ব গোবিন্দপুর[২]	শ্রীতুলসী বৈদ্য [মাহিষ্য]	১লা মাঘ	ফলমূল / বলি হয়।	গোবিন্দ চক্রবর্তী	প্রায় ৪/৫ শ বছর	দক্ষিণরায় [একটি মুণ্ডমূর্তি]

১ শুধু 'জামবেড়িয়া' গ্রামে 'ভাণ্ডারীরা' [মাহিষ্য] পূজোপচারের সঙ্গে আতপ চাল, গুঁড়ো করে দুধ, গুড়, ঘৃত সহযোগে 'ঢুঁটি' তৈরী করে নৈবেদ্য দেন। এই পূজা হয় রাত্রে। আটেশ্বের পূজার মিল রয়েছে এর সঙ্গে।

২ পূর্বগোবিন্দপুরে চৈত্রসংক্রান্তিতেও 'দক্ষিণরায়' পূজা করা হয় এবং নীলপূজার দিনই সন্ন্যাসীরা আগুনে ঝাঁপ দেন। সুতরাং এই অনুষ্ঠান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১. ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক : কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত 'রায়-মঙ্গল' [১৩৬৩] : পৃ. ৭ ।

২. ক. 'গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যে যুদ্ধ হয়েছিলো তাতে উভয় পক্ষেই [কৃষ্ণরামের মতে] ঘাঘ-সেনা। রামচন্দ্র লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানর সৈন্য নিয়ে। তাঁকে কি কেউ বানর দেবতা বলবে? অতএব দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্র দেবতা নন।' : দ্র. ১নং পাদটীকা : ভূমিকা : পৃ. ৪ ।

খ. 'উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে লৌকিক ব্রত-পূজায় যে বাঘাই ও সোনাই পাওয়া যায় তার মূলে ব্যাঘ্রদেবতা—অর্থাৎ ব্যাঘ্ররূপী ও ব্যাঘ্রপ্রকৃতি দেবতা'। : ঐ. পৃ ৫ ।

৩ শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত : 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' [৩য় খণ্ড] : পৃ. ৫২৭ ।

৪. ড. প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত ।

৫. 'বাংলার লৌকিক দেবতা' : ১৯৬৬ : পৃ. ১৫২ ।

৬. দ্বিজ ভৃগুরাম : 'দক্ষিণরায়ের পাল্যগান' : সমতট প্রকাশন : সংখ্যা ১৯, ১৯৭৪ : পৃ. ১৬৭ ।

৭. *Journal of the Department of Letters* : Vol. X. p. 167.

৮. S. C. Mitra : *The Cult of Dakshin Roy in Southern Bengal* [1925] ।

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র : 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' : ১ম খণ্ড [১৯৬৬] : পৃ. ৪৩০ ।

১০. Journal of the Asiatic Society : *The Origin of Dakshin Roy is Obscure* : Vol. I, 1915.

১১. *Kirata Jana Kirti* : 'The Tiger God in Bengal'.

১২. 'বাঙালীর ইতিহাস' [আদিপর্ব] ।

১৩. 'বঙ্গে মহেঞ্জোডারো সভ্যতার বিস্তার' ।

১৪. 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' [১৯৫৭] : পৃ. ৬৮৯ ।

১৫. 'সাহিত্য প্রকাশিকা' : ৪র্থ খণ্ড ।

১৬. 'It is suggested that Dakshin-dar [the door of the South] Governed the Southern Province and Bādin-dar [the door of the North] governed the Northern Province of the

dual kingdom in Bengal under the common authority of an Emperor God. These god-heads are the ramnants of that forgotten kingdom.' : *The Ritual Art of the Bratas of Bengal* [1961] : p. 56.

১৭. দ্র. ৩নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৫৩৯।

১৮. 'পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা' [১৯৭৫] : পৃ. ৩৩।

১৯. **'The Sunderbans : Exploitation, Struggle And Banabibi' : *Frontier* [Oct. 19, 1974].**

২০. **'The Sunderbans are the Southern portion of the Ganges delta, extending from the Hugli on the West to the Megna on the east, through the present districts of 24 Parganas, Khulna, and Bakarganj, and their limits on the North are the permanently settled lands of those districts.' : F. E. Pargiter : *A Revenue History of the Sunderbans From 1765 to 1870* [1934]।**

২১. তুলনীয় : 'আঠারো ভাটীর মাঝে হইবে প্রচার' অথবা 'আঠারো ভাটিতে পূজে সবে'। দ্র. ১নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ৩ ও ৭।

২২. 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন-এর স্মারক পত্রিকা [১৩৮১] রামনগর, বারুইপুর, ২৪ পরগণা : পৃ. ৬৭।

২৩. ঐ : পৃ. ৫৩।

২৪, দ্র. ৯নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৯০।

২৫. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : 'সাহিত্য প্রকাশিকা' [৪র্থ খণ্ড]।

২৬. দ্র. ২০ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

২৭. **"It is believed that one time the Sunderbans was far more extensively inhabited and cultivated than at present.… It is said that in 1737 the people then inhabiting the Sunderbans deserted it is consequence of devasted state of the country, and in Rennells Map of lower Bengal [1772] the Backergunj Sunderbans is shown as 'de populated by the Maghs'." : *The Imperial Gazetteer of India* : Vol I. p. XXII.**

২৮. **'Along the Seaward margin are the Sunderbans, a**

belt of mangrove Swamps. inhabited by extremely backward fishing tribes known as Water-gypsies,.: W. B. Cornish: *Modern Geography* [Asia]; Book V. [1962].

২৯. কালিদাস দত্ত: 'রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা': সাহিত্য ও সংস্কৃতি [৪র্থ সংখ্যা ১৩৭৪]: সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত: পৃঃ ৫২১.

৩০. W. W. Hunter: *Statistical Account of Bengal*: Vol. I.

৩১. 'Here and there within the forests may be found the remains of buildings, indicating that large areas were cleared of forest and inhabited at a not very remote period; most probably within the last five or six hundred years. The most extensive ruins within the present forests are found near Sipsotr river and include the famous Shekertek temple. There are mamy ruins existing in the recently cleared areas, the best preserved being the Jatar Deul, near Moni Nodi, in the 24-Parganas district.: *The Forests of Bengal*: Govt. of Bengal Revenue Dept; [Calcutta: 1935] P 33.

৩২. এ. এফ. এম. আবদুল জলীল: 'রহস্যঘন সুন্দরবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব': ইত্তেফাক [২৭ আষাঢ়, ১৩৭৭]।

৩৩. Dr. R. C. Majumder: *History of Bengal* [Vol. I: D. U.: 1943] p 24.

৩৪. ঐ: পৃ. ৩৭। প্রসঙ্গত: 'It should, however, be noted that the law giver brands the Paundres as degraded Kshatriyas, and classes them with Dravidians, Sythians, Chinese and other outlandish peoples.'

৩৫. Census: Population: 1971: W. Bengal: Part I.

৩৬. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'।

৩৭. দ্রষ্টব্য ১২ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৩৮. ঐ: পৃ. ৬৯।

৩৯. ঐ: পৃ. ৭৫।

৪০-৪২. এই সংখ্যাগুলির ক্রম নষ্ট হয়েছে।

৪৩. P. O. Bodding : *A Santali Dictionary*; Vol I. Part I.

৪৪. দ্র. ২৫ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৪৫. ঐ ঐ।

৪৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' [২য় খণ্ড : ১৯৭৭] পৃ. ১৪৮২।

৪৭. Swami Sankarananda : '*Decipherment of Inscriptions Phaistor Disc. of Crete* [1968] ; p 78.

৪৮. Swami Sankarananda : *The Indus People Speak* [1955].

৪৯. ড. শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক : 'সূক্ষ উপভাষা' ['লোকসংস্কৃতি' : ১-২, ১৩৮২] : পৃঃ ১-১১।

৫০. দ্র. ৪৬ পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৫০৯।

৫১. ঐ পৃ. ১৪৯৫ ৯।

৫২. 'গাবুর বসের ভর যুবতী সন্ধ্যায় ভুকায় বাড়া।
পস্তা পাড়া বাঘে তার দেয় ঘাড় মোরা॥' : ড. ফণী পাল সম্পাদিত 'সোনারায়ের পূজা-পাঁচালী ও প্রসঙ্গতঃ' [১৩৮২] : পৃ. ১৪।

৫৩. দ্র. ৪৬ নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৫০০।

৫৪. ঐ।

৫৫. ঐ। বারি—জলপূর্ণ ঘট। মনসা-শীতলা প্রভৃতি দেবীর আসল প্রতীক। পুরুষ গ্রাম-দেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, স্ত্রী গ্রাম-দেবতার প্রতীক ঘট।

৫৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত : 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' [১ম খণ্ড] : বাংলা আকাদেমী, ঢাকা।

৫৭. দ্র. 'প্রবাসী' পত্রিকা : আষাঢ় ১৩৫৮।

৫৮. Rev. William Goldsacth ed. : *A Mussalmani Bengali-English Dictionary* [1970 : Dacca].

৫৯. ঐ।

৬০. M. Williams : *Sanskrit-English Dictionary.*

৬১. এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন 'আকাদেমি অব ফোকলোর'-এর সদস্য-গবেষক শ্রীদাসুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ড. দীনেন্দ্রকুমার সরকার। সংগ্রহকাল : ১৩৭৮, ১লা মাঘ : শনিবার।

৬২. **This is Dakkin-rai, the god of the fields. His appearance is singular in extrene and is intended to convey the idea of growth.**

'The principal duties of the deity are to provide rain, to produce a good and seasonable crop and to keep away pig and other wild animals that devasted these corps.…The principal puja of Dakkin-rai falls on the 15th of January each year and it is significant that rain usually falls on or about that time.' : Augustus Somerville : *Crime and Religious Beliefs in India* [1956].

৬৩. বর্তমান প্রবন্ধকার ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ১লা মাঘ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ও থানার অন্তর্গত জোতঘনশ্যাম গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন। —সম্পাদক।

৬৪. কাহিনীটি কাঁটাপুকুর গ্রাম [দক্ষিণ ২৪ পরগণা: সরিষা ব্লক: ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা] থেকে সংগৃহীত। গ্রামটি পৌণ্ড্র প্রধান। কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন শ্রীধীরেন্দ্র সর্দার [৫৮]। সংগ্রহ করেছেন 'আকাডেমি অব ফোকলোর'-এর প্রাক্তন সম্পাদক ড. জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী। সংগ্রহকাল পৌষ সংক্রান্তি, ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দ।

৬৫. **The incident of animal metamorphosis is also familiar. Thus, in one of Somadeve's tales his mistress turns a man into an ox ; in another his wife transforms him into a baflalo ; in a third the angry hermit turns the king into an elephant.' : Willam Crooke : *The Populer Religion and Folklore of Northern India* : Vol II [2nd ed. 1896] p. 202.**

৬৬. **'Representation of gods in theriomorphic and anthrpomorphic forms is now being traditionally carried out in Bengal in the three recognized media, namely, i. in the form of vessels [*ghata*] ii. in the form of paintings [*pata*], and iii. in the form of images [*murti*].** : দ্র. ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ. পৃ. ২২.।

৬৭. **J. E. Swain : *A History of World Civilization* [1963 New Delhi]** ।

৬৮. সিজবেড়িয়া গ্রাম, ডায়মণ্ডহারবার থানা থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত। থানটি শ্রীমাধবচন্দ্র হালদারের খামার বাড়ীতে অবস্থিত। পাশেই বিশাল খড়ের গাদা। তারিখ: ১লা মাঘ, ১৩৭৭।

৬৯. সিজবেড়িয়া গ্রামের 'দক্ষিণদ্বার' ঠাকুরের মাটির মুণ্ডমূর্তিটি একটি মালসার ওপর বসানো ছিলো। দক্ষিণমুখী, সামনে ঘট, ঘটে সশিষ ডাব। ডাবের নীচে পঞ্চপল্লব। নৈবেদ্য, চাল, সন্দেশ, ছোলামটর, মুড়কি, শশা, কলা, মিষ্টান্ন, বিল্বপত্র [থালায়] ও পুষ্প। সামনেই দিয়েছেন ধূপ, দীপ ও গন্ধ। ঘটে সিঁদুর মাখানো। পূর্বে রীতি ছিলো মাঠের মাঝখানে পূজা করা। ১৩৭৭ সালের ১লা মাঘ তারিখে পুরোহিত ছিলেন শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্তী [৪০]। কাশ্যপ গোত্র: বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

৭০. দ্র. ৬৭ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৭১. 'The potters and *patuas* of 24-parganas [the district covering the mouths of the Ganges in Southern Bengal preparei mages of Dakshin-dar [the Door of the South], a *puja*-god, otherwise known as Dakshin-Ray [the Lord of the South] or Dakshineswar [the King of the South]. He is known as *Bara thakur* also and is annually worshipped on the last day of the month Poush [December- January], just after the main hervesting in Bengal is over. His puja is followed by the *Zatal* ceremony.' দ্র. ১৬নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ২৮।

৭২. "These busts of the ancient divine dignitaries thus represent the anthropomorphic tradition of image-making at its initial stage. With the political and religious progress in the country, anthropomorphs gradually replaced the theriomorphs, thus converting the animals into mere clan-symbols, now known as vehicles or *vahāns*—a changeover which can be interpraeted as the triumph of 'man over animal'. This stage of imagery ultimately ushered in the epoch of full-figure drawings of the human body in our traditional art." প্রাগুক্ত গ্রন্থ: পৃ. ২৬।

৭৩. 'All through folklore we find the idea that man has kinship with animals generally accepted' : ibid.

৭৪. দ্র. ৬৫ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৭৫. Mackay. Moh. Daro Pl. LXXXIX/360 and Pl. LXCVI/522, Pl. XC/23, Pl. XIII/17 ; Chanhu Daro Pl. PI/18 ; Moh. Daro Pl, XC/23.

৭৬. 'A factor of major importance bearing upon the symbolism of the head is mentioned by Herbert Kuihn, in his L' *Ascension de l' humanite* [Paris 1958]. He makes the point that the decapitation of corpses in pre-historic times marked Man's discovery of the independence of the spiritual principle, residing in the heads as opposed to the vital principle represen-ted by the body as a whole.'

৭৭. 'Symbols of fertility are: Water, seeds, phallic shopes.' দ্রষ্টব্য ৭৪ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৭৮. In Indian ritual, grains of rice serve to represent of fertility. ঐ।

৭৯. দ্র. ৯ নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৪৩০।

৮০. ড. সুকুমার সেন: 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' [১৯৭৩]—দ্রষ্টব্য 'আঠারো ভাটির পাঁচালী' প্রবন্ধ : পৃ. ৯৫।

৮১. দ্র. ২৫ নং পাদটীকার গ্রন্থ।

৮২. দ্রষ্টব্য ১৬ নং পাদটীকা : পৃ. ৫৬।

৮৩. 'The copper plate inscription found at Idilpur and described in the Asiatic Society's Journal [1838] seems also to indicate that the Sunderbans were not inhabited by a high caste population at an early period." *District Gazetteer* : Bakerganj : 1901.

৮৪. The Mongolo-Dravidian type of Lower Bengal and Orissa, comprising the Bengal Brāhmans and Kāyasthas, the Muhammadans of Eastern Bengal, and other

groups peculiar to this part of India. *Census Report* : West Bengal : 1951.

৮৫. Pods of Bengal are also included in the list of 'Depressed' and 'Scheduled' castes. They are considered to be remnants of an aboriginal tribe of the Ganges Delta. ibid. p.33.

৮৬. সমীক্ষকদলে ছিলেন : বর্তমান প্রবন্ধকার, শ্রীঅরুণকুমার রায় এবং ড. দীনেন্দ্রকুমার সরকার, ড. জ্যোতির্ময় বসুরায়চৌধুরী, শ্রীদাসুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র, শ্রীদীপক হালদার।

৮৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'লোকায়ত দর্শন' [১৯৫৬]।

৮৮. ক. গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। ধং কবীহামুপত্রবস্তমন।··· ইত্যাদি [ঋগ্বেদ : ২য় মণ্ডল]।

খ. গণনাং ত্বাং গণপতিং হবামহে ॥
প্রিয়ানাং ত্বাং প্রিয়পাতিং হবামহে ॥
নিধীনাং ত্বাং নিধিপতিং হবামহে ॥ [বাজসনেয়ী সংহিতা]

৮৯—৯১. এই সংখ্যাগুলির টীকা নম্বর ভ্রমবশতঃ ব্যবহৃত হয় নি।

৯২. 'Tantraism is neither Buddhist nor Hindu in Origin···; it seems to be a religious under-current, originally independent of any obscure metaphysical speculation, following on from an obscure point of time in the religious history of India'. Dr. S. B. Dasgupta : *Obscure Religious Cults* : p. 26.

৯৩. 'The person paying the cost of a sacrifice, the institution of a sacrifice [Who, to perform it, employs a priest or priests, who are often hereditary functionaries in a family] any patron, host, rich men' ;···*Sanskrit-English Dictionary*.

৯৪. দ্রষ্টব্য ৪৯নং পাদটীকা : পৃ. ১—১১।

৯৫. প্রবন্ধকার কর্তৃক ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' [বাংলাদেশ] থেকে সংগৃহীত।

৯৬. "A reigning Raja has power of nominating any male member of the Royal family, with certain limits, as his successor, under the title of Jubaraj ; and a successor to the Jubaraj

under the title "Bara Thakur'." W. W. Hunter : *A Statistical Account of Bengal.* Vol. VII [1876] ।

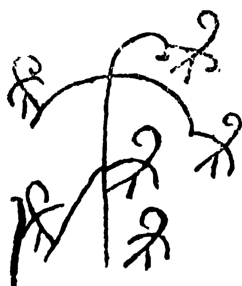
৯৭. *Statistical Account of Hill Tipperah* [1876].

৯৮. ক. মাঘ : বিণ [মঘা+অ (অন্)] মঘা নক্ষত্রযুক্ত। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র। [ইহা লাঙ্গলাকৃতি, পঞ্চতারক]। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

খ. মাঘ : বাঙ্গালা বৎসরের দশম মাস ; কুঁদফুল। : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'।

৯৯. Kalidas Dutta : *Some Primitve Antiquities of the Sunderbons* : Science and Culture : June 1961.

১০০. All over the world the earth spirit is regarded as female and the presiding deities of agriculture are mainly goddesses, because the idea of fertility and reproduction is connected with women. When, therefore, a nomadic pastoral clan settled down to an agricultural life in villages, they would naturally worship the earth spirits of the village lands as Goddesses rather than as God. : Whitehead : *The Village Gods of South India* [1921] ।



প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ

ড. পল্লব সেনগুপ্ত

এক. মহিষাসুর-মর্দিনীর উৎস-সন্ধানে

ঋক্‌বেদে উল্লেখিত দেবকুলকে পশ্চাৎপটে সরিয়ে দিয়ে, প্রাগার্য প্রাচীন ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর দেব-দেবীরা সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব কালেই নবোদ্ভূত হিন্দুধর্মের প্রধান উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই দেব-দেবীদের মধ্যে প্রধানা হলেন মাতৃকা দেবী, যিনি উত্তরকালে শক্তিরূপে কথিতা হয়েছেন; আর পুরুষ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গৃহীত হলেন শিব। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রের শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্ব সতেরশো শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রাকৃতিক অবক্ষয় এবং বহিরাগত আর্যভাষী এক রণদুর্মদ জাতির আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও তাঁদের প্রধান দুই উপাস্য—মহা-মাতৃকারূপিণী কোনো দেবী এবং মহিষশৃঙ্গভূষিত, যোগাসনারূঢ় কোন দেবতা যথাক্রমে শক্তি এবং শিবরূপে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি-চিন্তায় পরমা প্রকৃতি এবং পরম পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এই শক্তি দেবী নানা নামে ও মূর্তিতে হিন্দু সমাজে কল্পিতা হয়েছেন: চণ্ডী, দুর্গা, উমা, হৈমবতী, কালিকা এবং দশমহাবিদ্যা-রূপে—আরো নানান-ভাবে। প্রত্যেকটি রূপ কল্পনাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী, যাদের অন্যতম হল চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের বিবরণ। এই পুরাণকথা গড়ে ওঠার পিছনে যে লোক-পুরাণ বা মীথ্‌ লুকিয়ে রয়েছে, অবশ্যই তার একটা ইতিহাস সম্মত ভিত্তি আছে, পরবর্তী সময়ে যা অলৌকিকতা-মিশ্রিত পুরাণ কথার তলায় চাপা পড়ে গেছে,—এটিই এ নিবন্ধের বক্তব্য।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত গবেষণা 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন শ্রীদুর্গাদাস পাত্রের লেখা একটি চিঠির সূত্রে: 'মহিষমর্দিনী দেবী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের ব্যাইর্গো দেবী—ইনি সমরপ্রিয়া দেবী। এই ভূমধ্য-সাগরাঞ্চলবাসিগণ কর্তৃক মন্‌-খ্যোর জাতির বিজয়ই মহিষমর্দিনী দেবীর মূর্তির মূল কথা। মন্‌-খ্যেরগণ একটি মিশ্র নৃজাতি, খানিকটা ক্যাস্পিয়ান, খানিকটা

অস্ট্রলোইড, কিছুটা এ্যালপাইন্। ইহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যে-রূপ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মন্-খ্মেরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মন্-খ্মের-মর্দনই হইল মহিষ-মর্দন। ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইর্গো বা দুর্গা: তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্-খ্মের বিজয়ই রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তিতে।" [পৃষ্ঠা ৫৪]।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর জীবনকালে শক্তিতত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক দর্শন বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর্গের অন্যতম বলে মান্য হতেন। সুতরাং তাঁর মতো বিদ্বান্ মহিষমর্দনের মীথ্ গড়ে ওঠা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করতে হবে, সে ত বলাই বাহুল্য।

একালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-চর্চার অন্যতম একটি বিশিষ্ট রীতি হল যে, যে-কোন প্রচলিত লোককথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে সম্ভাব্যস্থলে পাওয়া প্রত্ননিদর্শনের সম্পর্ক কি, সেটা যাচাই করা। এর ফলে নানা অলৌকিক কথার আড়ালে ঢাকা লৌকিক তথা বাস্তব এবং ইতিহাস-সম্মত সত্যটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হবে। ড. দাশগুপ্ত যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ অভিমতের অনুকূলে কথা বলেছেন, তার কতখানি প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সমর্থন মেলে, সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে দেখা যাক।

যথার্থরূপে মহিষাসুরমর্দিনী বলে যাঁকে গণ্য করা যেতে পারে, তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা-সব পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রাচীন যে কটি, তারা সবাই হল গুপ্ত যুগের। এলাহাবাদের সন্নিকটে ভিটায় পাওয়া একটি সীলমোহরে খোদিত সিংহারূঢ়া এক দেবী মূর্তিকে স্যার জন মার্শাল দুর্গা বলে গণ্য করেছেন; এইটি. আর উদয়গিরি এবং ইলোরার গুহাগাত্রে খোদাই করা দেবীর মূর্তি, সেগুলিও মোটামুটিভাবে ঐ সময় কালের বলেই স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

অবশ্যই যে ধরণের ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা শ্রদ্ধাস্পদ ড. দাশগুপ্ত বলেছেন, তার বয়স আরো প্রাচীন। ঐ ধরণের ঘটনা যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে, তার সম্ভাব্য সময়কাল আর্যভাষী জাতির আক্রমণের পূর্ববর্তী, কারণ আর্য-আবির্ভাবোত্তর কালে ভূমধ্যসাগরীয় বনাম মন্-খ্মের প্রভৃতি প্রাগার্য প্রত্ন-দ্রাবিড়-প্রত্ন-অষ্ট্রিক প্রভৃতি জাতিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটবার আর কোন অবকাশ থাকা সম্ভবপর নয়।

সুতরাং ঐ জাতি-বৈরিতা বা গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, যার থেকে না-কি মহিষমর্দিনী মীথের সৃষ্টি হয়েছে, তার সময়কাল অন্তত পৌনে চার হাজার বছর আগের হতে হয়। অথচ, প্রকৃত মূর্তিতে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর প্রাচীনতম যে সব প্রত্নানিদর্শ পাচ্ছি আমরা, তাদের কারুরই বয়স দেড় হাজার বছরের ওপারে যায় না। তাহলে মধ্যের এই সওয়া দুই বা আড়াই হাজার বছর ধরে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী ভাগবত' অংশ অবলম্বন করে যে মীথ্ গড়ে উঠেছিল, তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক রূপায়ণ পাওয়া গেল না—এ কেমন করে সম্ভব ?

পক্ষান্তরে কোন এক স্ত্রী-দেবতা কর্তৃক মহিষবধের প্রত্নানিদর্শ খৃস্টপূর্ব কালের সুমেরিয়া থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই দেবী হলেন ধরিত্রী-দেবী নিন্হুর-স্যাগ, তাঁর সামনে মহিষ বধ করা হচ্ছে, এমন একটি সীলমোহর বৃটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে, যার বয়স প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর।

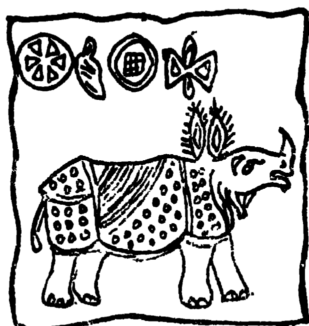
শক্তি দেবীর সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মাতৃকা দেবীর সম্পর্কটা খুব দুরান্বয়ী নয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে প্রাচীন সিন্ধুরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ যোগসূত্র যে একটা ছিলই, সে সত্য প্রশ্নাতীত। মধ্যপ্রাচ্যের পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী সিবিলী দেবীর সঙ্গে উমা-হৈমবতীর ভাবগত মিল-টুকুর কথা বহু ঐতিহাসিকই বলেছেন। 'উমা' শব্দটির উৎসেও ব্যাবিলনীয় 'উম্মু' বা 'উম্ম' শব্দের সঙ্গে আত্মীয়তা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। একালে লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে একদেশের ধর্ম-বিশ্বাস, পুরাণকথা, দেবমূর্তিকল্পনা অন্য দেশেও বিস্তৃত হতে পারে। সুতরাং সিংহবাহিনী সিবিলী দেবী, যিনি ছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষদের 'উম্মু' বা মা, তথা মাতৃকা দেবী, তাঁরই অনুরূপ কোন দেবী প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রে অপ্রত্যাশিতা নন। 'দুর্গা' শব্দটির উৎসেও 'উর' শব্দের অস্তিত্ব প্রত্ন-ভাষাবিদরা খুঁজে বার করেছেন। সিন্ধু-সভ্যতার স্বর্ণযুগেও বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নগরী ক্যালডিয়ার 'উর' এবং 'কিশ'-এর গৌরব অম্লান ছিল। এমন কি বৈদিক সাহিত্যে 'উরকিষটি'র উল্লেখও পাওয়া যায় [ঋক্‌বেদ : ৭.১০০.৪]।

কিন্তু সিংহবাহিনী কোন দেবীর মূর্তির সন্ধান কি মহেঞ্জোদাড়ো, হরাপ্পা বা অন্য কোন সিন্ধু নগরীর প্রত্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে ? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার আগে একটি তথ্য আগেই মনে রাখা দরকার : সিন্ধু-মোহরে

যত ধরনের প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা আছে, তাদের মধ্যে আছে বাঘ,



চিত্র : ১



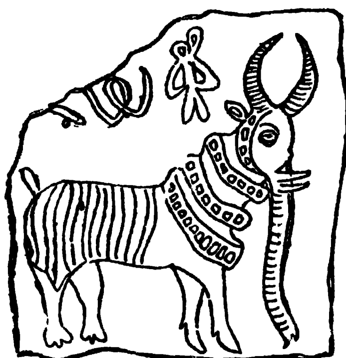
চিত্র : ২

হাতী [চিত্র : ১], গণ্ডার [চিত্র : ২], মহিষ, ষাঁড়, কুমীর [চিত্র : ৩] সাপ, হরিণ, খরগোস, মাছ [চিত্র : ৩], গায় "হাঁসজারু" [চিত্র : ৪ ও ৫]



চিত্র : ৩

বা "বকচ্ছপ" ধরনের একাধিক প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্নিবিষ্ট অদ্ভুতদর্শন



চিত্র : ৪



চিত্র :

মূর্তি অবধি, কিন্তু সিংহ ? নৈব নৈব চ ! বরঞ্চ, মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত

গিলগামেশের সীথের একটি উৎকীর্ণ ছবিতে গিলগামেশের সঙ্গে দুটি সিংহের লড়াইয়ের যে দৃশ্য দেখা যায় হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া দু-একটি সীলে হুবহু সেই একই দেখি, তফাৎ শুধু সেখানের দুটি সিংহের বদলে এখানে রয়েছে দুটি বাঘ [চিত্র : ৬] !



চিত্র : ৬

হয়ত এইটাই স্বাভাবিক ; কেন না সাড়ে চার-পাঁচ হাজার বছর আগের মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চল যে ঘন জলা-জঙ্গলে আকীর্ণ একটি স্থান ছিল, একথা মোটামুটিভাবে এখন বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃত। জলা-জঙ্গলের প্রাণী—হাতী, গণ্ডার, মহিষ, বাঘ, কুমীর, সাপ প্রভৃতিরই তাই সেখানকার শিল্পীদের চিত্রের উপজীব্য হওয়া স্বাভাবিক, মরুবাসী প্রাণী সিংহের নয়। মেসোপটেমিয়ার সিংহ-সম্পৃক্ত কাহিনী তাই স্বভাবতই সিন্ধু রাষ্ট্রের শিল্পীর হাতে বাঘের গল্পে পরিণতি পেয়েছে।



চিত্র : ৭

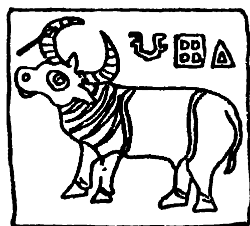
এই পরিবেশে ওখানকার ধর্মবিশ্বাস, দেবমূর্তিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়েও বাঘের একটা ভূমিকা থাকা সম্ভব। একটি শীলমোহর পাওয়া গেছে, [চিত্র : ৭]

যেখানে এক দেবী এবং একটি বাঘের সমন্বিত একটি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। স্পষ্টতই ইনি কোন ব্যাঘ্রদেবী [ব্যাইর্গো ?], যাঁকে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রের কিছু মানুষ উপাসনা করত। যে সমস্ত প্রাণীর মূর্তি বিভিন্ন মোহরে উৎকীর্ণ দেখা যায়, তাদের সবগুলিই কোন না কোন ভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মোহরগুলিতে খোদাই করা পবিত্রতাসূচক বিশিষ্ট চিহ্নই তার প্রমাণ।

পশু-সম্পৃক্ত এইসব ধর্মবিধি ও বিশ্বাস, এগুলি আদিম টোটেম-বিশ্বাসের ধারাকেই বহন করে এনেছিল প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রে। এক-একটি গোষ্ঠী-নিজেদেরকে এক একটি প্রাণীর উত্তরপুরুষ বলে যে কল্পনা আদিমকালে করত, তারই ধারানুসরণ ঘটে গিয়ে উত্তরকালে সেইসব প্রাণীর তাদের কাছে গোষ্ঠী প্রতীকী 'পবিত্র পশু'-[টোটেম]-তে পরিণত হত [চিত্র : ৮ ও ৯]।



চিত্র : ৮



চিত্র : ৯

অর্থাৎ, এক-একটি পশুকে অবলম্বন করে এক-একটি ধর্মীয় ধারা বা কান্ট্ গড়ে উঠত ; যেমন : ব্যাঘ্র-কান্ট্, হস্তী-কান্ট্, মহিষ-কান্ট্, বৃষ-কান্ট্ ইত্যাদি। বাঘকে অবলম্বন করে যে কান্ট্-গড়ে উঠেছিল, তারই অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল প্রাচীন সিন্ধুরাষ্ট্রে, এমন সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দেই করা যেতে পারে।

বাঘকে নিয়ে সৈন্ধবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কান্ট্ যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি আরও একটি কান্ট্-গড়ে উঠেছিল মহিষকে অবলম্বন করে, মহিষ-মূর্তির লাঞ্ছন-সম্বলিত যথেষ্ট পরিমাণ সীলমোহরই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ [চিত্র : ৯]।

এখানে একটি কথা তলিয়ে বুঝবার আছে। বাঘকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা কান্ট্ ছিল যে গোষ্ঠীর, তাঁরা ছিলেন মাতৃকাদেবীর উপাসক, তাই তাঁদের টোটেম-ধারানুসারে বাঘের দেহে অধিষ্ঠাত্রী অলৌকিক সত্তার কল্পনা

করেছিলেন দেবীরূপে। কালক্রমে ইনিই ব্যাঘ্রবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; সে কথায় পরে আসছি। পক্ষান্তরে, মহিষ-কাল্ট্ যাঁদের, তাঁরা ছিলেন পুরুষ দেবতার উপাসক—সিন্ধু মোহরে যতগুলি পুরুষ মূর্তি পাওয়া গেছে, উপরে উল্লেখিত শিবমূর্তিটি সমেত [চিত্র : ১], তাদের মধ্যে অনেকগুলিই মহিষ-শৃঙ্গধারী। স্পষ্টতই ঐ শৃঙ্গধারী পুরুষ-মূর্তিকে মনে করা যায়, মহিষ-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপাস্য অধিদেবতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দু-একটি সীলমোহরে [চিত্র : ১৪ ও ১৫] বাঘের মাথায় একজোড়া করে শিং খোদাই করা থাকলেও, সেগুলি মহিষের নয়, বৃষের। ব্যাঘ্র-কাল্ট্ এবং বৃষ-কাল্ট্ [সিন্ধু রাষ্ট্রে তার অনুসারী একটি গোষ্ঠীও অতি-অবশ্যই ছিল] অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে বা সহযোগিতা করে চলত, এটি তারই প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা চলে।

কিন্তু মহিষ-কাল্ট্ অনুগামীদের সঙ্গে ব্যাঘ্র-কাল্ট্ অনুগামীদের সম্পর্কটা সেই রকম সৌহার্দ্যময় ছিল না। সীলমোহরের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে কিন্তু তার বিপরীত কথাটাই প্রতিভাত হয়। জোড়া বাঘের সঙ্গে সিন্ধুর 'গিলগামেশ'-এর লড়াইয়ের ছবি আঁকা একটি মোহর পাওয়া গেছে, [চিত্র : ৬ দ্রষ্টব্য] সে কথা ওপরে বলেছি। মেসোপটেমিয়ার পুরাবৃত্তে গিলগামেশের সহচররূপে অর্ধপশু-অর্ধমানব যে এঙ্কিডুর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মূর্তিও সিন্ধু রাজ্যের একটি তামার ফলকে খোদাই দেখি। উল্লেখযোগ্য এই যে, মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া ঐ তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ 'ভারতীয়' এঙ্কিডুর মাথায়



চিত্র : ১০

একজোড়া মহিষ-শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে [চিত্র : ১০], মেসোপটেমিয়ার এঙ্কিডুর মতো বৃষ-শৃঙ্গ নয়। অর্থাৎ 'ভারতীয়' গিলগামেশ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত; এবং

তার অনুচর এঙ্কিডু মহিষ-শৃঙ্গধারী। এটাও যে দুই কাল্টের দ্বন্দ্বদ্যোতক, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আর একটি মোহরে দেখছি [চিত্র : ১৫] মহিষ-শৃঙ্গধারী ঐ এঙ্কিডুর মতো একটি পুরুষ-মূর্তি বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে। ভারতবিদ্যাবিদ্ ড. হাইন্‌ৎস মোডে এই মোহরটিকে সিন্ধু রাষ্ট্রে প্রাপ্ত ছ-টি 'ব্যাঘ্রজাতক সীলমোহর'-এর অন্যতম বলে গণ্য করেছেন; তবুও বাঘ বনাম মহিষ-শৃঙ্গধারী পুরুষের লড়াইয়ের এই ছবির অন্যতর তাৎপর্যও আছে: তা হল দুই কাল্টের সংঘাত। মাতৃকা-উপাসক ব্যাঘ্র-কাল্টের মানুষদের সঙ্গে পিতৃদেবতা [শিব ?]-উপাসক মহিষ-কাল্টের মানুষদের যে সংঘর্ষের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা 'গিলগামেশ' ও 'এঙ্কিডু'-র মোহর দুটির মাধ্যমে করা হল, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই মোহরটিতেও।

দেবী-ব্যাঘ্র-সমন্বিতমূর্তিতে দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিন্যাসে আমরা



চিত্র : ১১

দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশবিন্যাস-সমৃদ্ধা কয়েকটি নারীমূর্তির [দেবী ?] সঙ্গে প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ক্রুদ্ধ মহিষকে দেখা যাচ্ছে আর একটি সীলমোহরে [চিত্র : ১১]। মহিষের আক্রমণে এই দেবী—তথা—



চিত্র : ১২

নারীরা বিপর্যস্তা। ঐ দেবীরা ঐ বিশেষ ধাঁচের বসন-ভূষণের কারণে ব্যাঘ্র-কাল্টের সঙ্গেই সম্পৃক্তা ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে নির্দ্বিধায়; অতএব

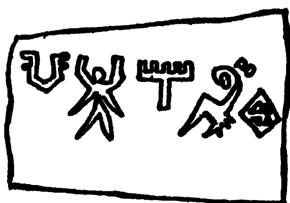
এই মোহরটিকেও দুই কাল্টের সংগ্রামের সূচক বলে মনে করতে পারি অনায়াসেই। এর পরবর্তী ছবিতে [চিত্র : ১২] তীক্ষ্ণাগ্র বল্লমের আঘাতে মহিষকে বধ করা হচ্ছে : স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তীকালের মূর্তি-কল্পনাতেও দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন ভল্ল বা ত্রিশূলের আঘাতে, এই রকমই দেখা যায়।

তাহলে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রের দুই পরস্পর বিরোধী টোটেম-অবলম্বী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বই কালক্রমে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহিষরূপী দেবতার হত্যার মীথে পরিণত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-কথিত মহিষাসুর-মর্দিনী মীথের আদি উৎস ঐখানেই।

কিন্তু আজকের মহিষ-মর্দিনীর প্রচলিত ধারণায় তিনি ব্যাঘ্রবাহিনী নন, সিংহবাহিনী। পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতিতে সিংহ, ব্যাঘ্রকে পশ্চাদ্‌পটে সরিয়ে দিলেও, সিংহবাহিনীর মতো ব্যাঘ্রাসনা দেবীর মূর্তিরও প্রচলন রয়ে গেছে। এমন কি ব্যাঘ্রবাহিনী চণ্ডিকার মূর্তিও আছে। মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরে, গুজরাটের জুনাগড়ে এবং দুই বাংলার অনেক অঞ্চলেই চণ্ডী হলেন ব্যাঘ্রাসীনা। পাঞ্জাবের লৌকিক চণ্ডীকথায় দেবী বাঘের পিঠে চড়ে অসুর নিধন করছেন, এই রকম প্রচলিত আছে। সুতরাং সিংহবাহিনী যে আদিতে ব্যাঘ্র-বাহিনীই ছিলেন এমনটি মনে করা যায়। মেসোপটেমিয়া থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত যে মহামাতৃকা দেবীর আরাধনা করা হতো ইতিহাস-পূর্বকালে, তিনি বহুরূপে কল্পিতা হয়েছিলেন—কখনো সিংহবাহিনী সিবিলী, কখনো ব্যাঘ্রবাহিনী সৈন্ধবী দেবী [কি তাঁর নাম ছিল ? উম্মু ? উমা ?], কখনো বা আর কিছু। বাঘ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বহু ক্ষেত্রেই সিংহ-সওয়ারী হয়েছেন. যখন আর্যভাষী বৈদিকরা নিজেদের দেবকুলকে সিন্ধুজলে বিসর্জন দিয়ে পরাভূত সৈন্ধবীদের দেব-দেবীদেরই শিরোধার্য করে নিয়ে হিন্দুধর্মের ['সিন্ধু' ধর্মের ?] প্রবর্তন করলেন। সিন্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিন্ধুর আদি শিবও তাঁদের প্রধানতম দেবতা হলেন : দেবাদিদেব, মহেশ্বর [মহিষ-ঈশ্বর ?]। মহিষ-শৃঙ্গধারী সৈন্ধবী শিবমূর্তি বিবর্তিত হল মহিষ-শৃঙ্গতুল্য চাঁদের ফালির শিরোভূষণ-সম্পন্ন 'হিন্দু' শিবের রূপে। কালিকাপুরাণ মতে, শিবই যে মহিষাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষ-কাল্টের সঙ্গে শিবের সংযোগ আছে ? চণ্ডীর পদতলে মহিষাসুরের পড়ে থাকার আরেক

রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে থাকা? ভূমধ্যসাগরীয় জাতি [নৃ-তত্ত্বমতে আদি-দ্রাবিড়রা এর অন্তর্গত] মন-খ্মের জাতিকে [আদি-অষ্ট্রিকরা যার অন্যতম] পরাস্ত ও পদানত করেছে, মহিষাসুর-মর্দিনীর কাহিনী সেই ইতিহাসই সূচিত করেছে, এতখানি বলার মতো 'পাথুরে' প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল না ঠিকই; কিন্তু প্রাচীন সিন্ধু রাষ্ট্রের ব্যাঘ্র-কাল্ট্-অনুসারী মাতৃকা-উপাসকরা মহিষ-কাল্ট্ অনুসারী পিতৃদেবতা-পূজকদের পরাস্ত করেছিল সে সিদ্ধান্ত এখন আর মানতে আপত্তি কি? দেবীর পদতলে মহিষাসুর তথা শিব পড়ে আছেন এই ভাব-কল্পনা ঐ জয়-পরাজয়েরই দ্যোতনা বহন করেছে উত্তরকালে। এ জিনিষ প্রাচীন পৃথিবীর অন্যত্রও ঘটেছে। মিশরবিদ্যাবিদ্ মরেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক অন্যান্য টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীকে পরাভূত করার ইতিহাস শিল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে, বাজপাখির পায়ের তলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই-করা মূর্তি প্রাচীন মিশরের প্রত্নিদর্শের মধ্যে বহু সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে। মরেট এবং ডেভি বাজথাখির প্রতীকে হোরাস দেবতার পূজকদের বিজয়-কাহিনীর সাক্ষ্য হিসেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন। হোরাস-উপাসক রাজা মেনেসের বিজয়কথা সেগুলি।

মহিষাসুর-মর্দিনীর মীথের অন্তরালে যে কাল্ট্-দ্বন্দ্ব লুকিয়ে ছিল, পরবর্তী সময়ে তাই শাক্ত বনাম শৈবদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে, এই সূত্রে সে সিদ্ধান্তেও পৌছানো চলে। আরও একটি আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, বহুভুজা দুর্গামূর্তি [আট, দশ, বার এমন কি আঠারটি হাত আছে এমন মূর্তিও দেখা যায়]—যা উত্তর-কালে উপাসিত হচ্ছে, তারও আদি উৎস সিন্ধুর মোহরে: অন্তত চতুর্ভূজা



চিত্র: ১৩

দেবীর মূর্তি সেখানে খোদিত হয়েছে বেশ কটি সীলমোহরের উপর [চিত্র: ১৩ দ্রষ্টব্য]। ১ম চিত্রে যে আদি শিবমূর্তিকে পশুপতিরূপে যোগাসনারূঢ় অবস্থায়

পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরও পাশে বাঘের লাফাতে-উদ্যত মূর্তি খোদাই করা আছে দেখা যাচ্ছে। শিব-দুর্গার সম্পর্ক পরবর্তী সময়ের চিন্তাধারাতেও ছিল অপরিবর্তিত : আদি পিতা ও আদি মাতা। শিব-লাঞ্ছিত ঐ মোহরটি প্রমাণ করে ঐ চিন্তা হরাপ্পা সভ্যতা থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। উত্তরপর্বে শিবকে বহু সময়েই ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট রূপে কল্পনা করা হয়েছে : মহিষ-কাল্ট্ ও ব্যাঘ্র-কাল্টের সম্পর্ক বিচারে এই বিষয়টিও স্মরণযোগ্য।

দুই. ব্যাঘ্রজাতকের কাহিনী এবং সিন্ধু-সংস্কৃতির শীলমোহর

আগের অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক হাইন্‌ৎস মোডে যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিন্ধু-সংস্কৃতির বলয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়া কয়েকটি শীলমোহরকে ফসবৌলের সংকলিত জাতকমালার অন্তর্গত 'ব্যাঘ্রজাতক'-এর কাহিনীর আদি উৎস রূপে যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে কথার উল্লেখ করেছি। এই সিদ্ধান্তটিও হরাপ্পা-সভ্যতায় ব্যাঘ্র-কাল্টের স্বরূপ নির্ণয়ের অন্যতম সূচক। কিন্তু সে কথায় আসার আগে 'ব্যাঘ্রজাতকের' গল্পটি শীলমোহরের ছবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার। ব্যাঘ্রজাতকের গল্পটির প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ পাঠ হল এই :

"পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বনে বৃক্ষদেবতা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমানের অনতিদূরে অন্য এক বৃহৎ বনস্পতিতে আর একজন বৃক্ষদেবতা বাস করিতেন। ঐ বনে এক সিংহ এবং এক ব্যাঘ্রও বাস করিত। তাহাদের ভয়ে কেহ ঐ বনে যাইত না, গাছ কাটিত না, এমন কি সে দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও সাহস করিত না। ঐ সিংহ ও ব্যাঘ্র নানাপ্রকার মৃগ মারিয়া খাইত এবং ভোজনান্তে যাহা থাকিত তাহা সেখানেই ফেলিয়া যাইত। কাজেই অশুচি গলিতমাংসাদির গন্ধে সেই বনে তিষ্ঠান ভার হইত।

বোধিসত্ত্বের প্রতিবেশিনী বৃক্ষদেবতা অল্পমতি ও কারণাকারণানভিজ্ঞা ছিলেন। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'সৌম্য এই সিংহ ও ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে বনভূমি অশুচি ও গলিতমাংসাদির গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে; যাহাতে ইহারা পলাইয়া যায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, 'ভদ্রে, এই দুইটা আছে বলিয়াই এতদিন আমাদের বিমান রক্ষা পাইয়াছে; ইহারা পলায়ন করিলে আমাদের বিমান বিনষ্ট হইবে, কারণ সিংহ

ও ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন না দেখিলে লোকে সমস্ত বন কাটিয়া সমভূমি করিবে এবং চাষবাস করিবে। অতএব তুমি অভিপ্রায় ত্যাগ কর।

'যে মিত্রের কুসংসর্গে হয় শান্তিনাশ
সতর্ক হইয়া কর তার সঙ্গে বাস।
আত্মাকে যতনে রক্ষা হেন মিত্র হতে
নিজ চক্ষুর্দ্বয়বৎ করেন পণ্ডিতে।

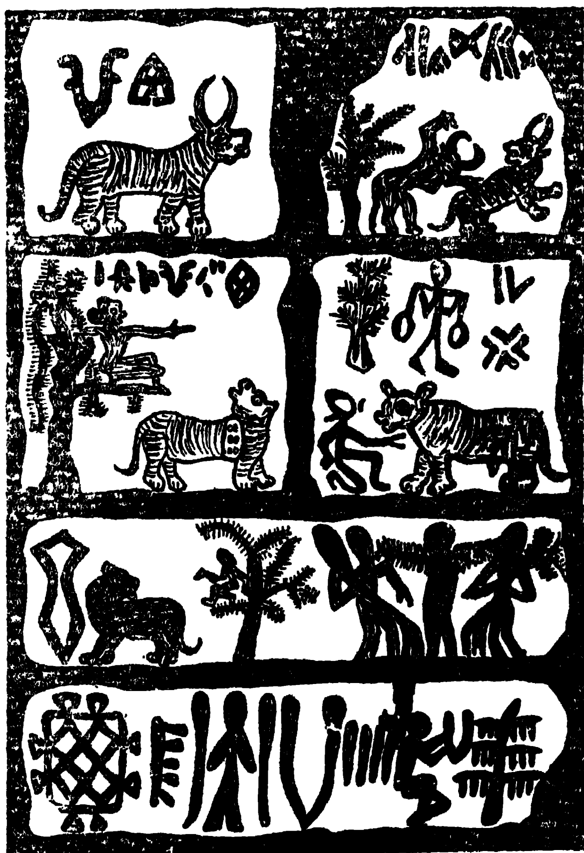
যে মিত্রের সঙ্গে থাকি শান্তির বর্ধন
হয়, তারে আত্মবৎ করহ যতন।
সকল বিষয়ে সব পণ্ডিতের ঠাঁই,
নিজে আর হেন মিত্রে ভেদ কিছু নাই।'

বোধিসত্ত্ব এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সেই অল্পমতি দেবতা ইহাতে মন দিলেন না, তিনি একদিন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাইলেন; কাজেই তাহারা পলাইয়া গেল। লোকে আর তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না—বুঝিল যে তাহারা বনান্তরে গিয়াছে। অমনই তাহারা উক্ত বনের এক অংশ কাটিয়া ফেলিল। তখন অল্পমতি দেবতা আবার বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'সৌম্য, আমি তোমার কথা মতো কাজ করি নাই, ভয় দেখাইয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রটাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে জানিয়া মানুষে বন কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন বল কি কর্তব্য?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'তাহারা এখন অমুক বনে আছে; তুমি গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আইস।' তদনুসারে সেই অল্পমতি দেবতা তখনই তাহাদের নিকট গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন:

'এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না আর
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।'

দেবতাকর্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইয়াও সেই সিংহ ও ব্যাঘ্র বলিল, 'তুমি দূর হও, আমরা সেখানে যাইতেছি না।' কাজেই দেবতা একাকিনী বনে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে লোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল এবং চাষ আবাদ করিতে লাগিল।" [ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ]।

অধ্যাপক মোডে ছ-টি শীলমোহরের ছাবর [চিত্র : ১৪ থেকে ১৯] সাহায্যে এই গল্পটির মূল কাঠামোর পুনর্গঠন করেছেন। এখানে বলা দরকার যে সুদীর্ঘকাল ধরেই পণ্ডিতসমাজে জাতককাহিনীর সঙ্গে লোককথার একটা অন্তর্লীন সম্বন্ধের কথা আলোচিত হয়ে আসছে। ড. মোডের এই তথ্য-



চিত্র : [ক্রমানুসারে] ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তত একটি জাতক-কাহিনীরও ভিত্তিতে লোকজীবন নির্ভর-সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল। ঐ কাঠামোকে শীলমোহরের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

ক. বনবাসী বাঘ [চিত্র : ১৪]।

খ. ঐ দেবতা যুদ্ধ করে বাঘকে বন থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে [চিত্র : ১৫]।

গ. বৃক্ষবাসী দেবতা বাঘকে বন ছেড়ে চলে যেতে বলছে [চিত্র : ১৬]।

ঘ. বনে মানুষের আনাগোনা শুরু হওয়ায় ঐ বৃক্ষবাসী দেবতা বাঘকে ফিরে আসার জন্য নতজানু হয়ে অনুরোধ করছে [চিত্র : ১৭]

ঙ. বাঘ রাজি না হয়ে চলে যাচ্ছে, এদিকে মানুষেরা বন কেটে জমি পরিষ্কার করছে [চিত্র : ১৮]।

চ. বন কেটে জনপদের পত্তন হয়েছে এবং তার আশে পাশে মানুষেরা চাষবাস করছে ; দেবতাও বাধ্য হয়ে ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে [চিত্র : ১৯]।

স্পষ্টতই এই কাঠামোর মধ্যে সিংহ এবং বোধিসত্ত্বের কোনো স্থান নেই। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যখন সিংহ এসে বাঘকে হটিয়ে দিয়েছে শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তখন সেই একই ভাবানুষঙ্গে এই কাঠামো-কেন্দ্রিক জাতক-কাহিনীটির মধ্যেও সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে, বোধিসত্ত্বকেও নিয়ে আসা হয়েছে এই লোক-কাহিনীর ওপর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করার জন্যে। হিন্দু ধর্মের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী-কালীন ঐ লোককথার মধ্যে বাঘের বদলে সিংহ এসেছে পৌরাণিক আমলে, যখন সংস্কৃতির মানদণ্ডে বাঘের মর্যাদা খর্ব হয়েছে, যার প্রমাণ আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীর সিংহবাহিনীতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে। এই কাহিনীতে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে হিন্দু-অধ্যাত্ম-চিন্তা বিস্তারের প্রথম আমলে অর্থাৎ প্রাক্-বুদ্ধ-যুগে ; আর কাহিনীতে বোধিসত্ত্বের আগমন যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাবকালে, সে কথা ত বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। মূল কাহিনীতে বৃক্ষদেবতা, স্ত্রী না পুরুষ, সেটা অবশ্য বোঝার উপায় নেই ছবি দেখে, জাতক কাহিনীতে তার দেবী রূপে আত্মপ্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তবে গিলগামেশ-কাহিনীর এঙ্কিডুর সঙ্গে যে চিত্রের ব্যাঘ-বিতাড়ক বা তার সঙ্গে যুদ্ধনিরত মূর্তির মিলের কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি, সেই অনুসারে, মূলে হয়ত সে পুরুষ দেবতা রূপেই কল্পিত হয়েছিল, কালবিবর্তনে সে নারী হিসেবে অনুভাবিত।

এই শীলমোহরগুলির মাধ্যমে যেমন উত্তরকালের ভারতীয় সংস্কৃতিতে হরাপ্পা সভ্যতার প্রত্যক্ষ অবদানের একটি প্রামাণ্য নজীর খুঁজে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই, এর মধ্যে হরাপ্পা-যুগেরও পূর্বতন এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক

পর্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক সূত্রও খুঁজে পাই। অরণ্য উচ্ছেদ করে কৃষিক্ষেত্র তৈরী করা এবং জনপদের পত্তন হওয়ার ঘটনা ইতিহাসের পটভূমিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল। মহেঞ্জোদড়ো এবং চন্হুদড়োতে পাওয়া এ ছ-টি [আসলে পাঁচটি ; কারণ ১৮ ও ১৯ নং চিত্র, একই শীলমোহরের দু-পিঠে খোদাই করা] বাঘ-মোহর সেই বিস্মৃত আদিম যুগের স্মৃতিধারাকেই বহন করে এনেছে। দু-টি আলাদা শহরে এদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার দ্বারা ঐ কাহিনীর প্রচলন কত বেশি ব্যাপকভাবে ছিল সিন্ধু সংস্কৃতিতে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই মোহর-গুলির একটা পরিবেশতাত্ত্বিক [ecological] তাৎপর্যও আছে। বিশেষভাবে, একদা জল-জঙ্গলে পূর্ণ লারকানা অঞ্চল [মহেঞ্জোদড়ো ও চন্হুদড়ো এই অঞ্চলেই অবস্থিত ; হরাপ্পা-সংস্কৃতির শীলমোহরে খোদাই পশুমূর্তিগুলিই তার প্রমাণ ; সে কথা ওপরে বলেছি আগের অধ্যায়ে] পরে যে এরকম শুষ্ক, ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হল, তার একটা বড় কারণই এই যে বন কেটে ঐভাবে হাসিল করে দেওয়া। অন্তত ফেআর-সার্ভিস-প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদরা ত সেই রকমই মনে করেছেন। অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হবার পিছনে এ-ও একটা বড় কারণ। ঐ পরিবেশ-বদলে যাবার ইতিহাসও এই বিশেষ ব্যাঘ্র-মোহরগুলির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছয়। এদের গুরুত্ব সেদিক থেকেও বড় কম নয়।

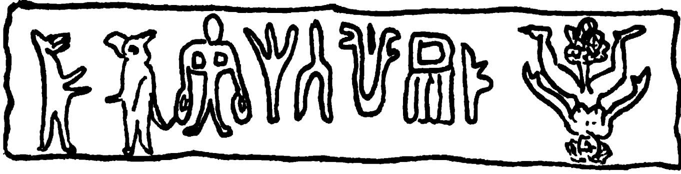
হরাপ্পা-সভ্যতা মূলগতভাবে নগরভিত্তিক ছিল এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু প্রাক্-জনপদ পর্যায়ের অরণ্য-জীবনের বিভিন্ন প্রত্যয় এবং আচারবিধিও তার মধ্যে প্রবহমান ছিল। শস্য-উৎপাদন ও নারীবলি সম্পৃক্ত আদিম-আকারের চিত্র-সংবলিত দু-পিঠে-খোদাই একটি মোহর দেখি [চিত্র : ২০, ২১] সেই



চিত্র : ২০

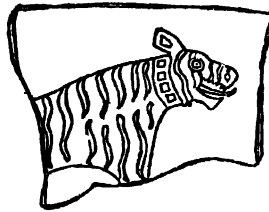
প্রত্যয়ের স্মৃতিহিসেবেই। ব্যাঘ্রকেন্দ্রিক দৈবী বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তৈরী বহু বিচিত্র কাহিনীও উত্তরাধিকার হিসেবেই পেয়েছিলেন

হরাপ্পীয়রা। উল্লেখযোগ্য এই যে, যতগুলি বাঘ-আঁকা-শীলমোহর পাওয়া গেছে সিন্ধু-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্দ্রে, তাদের মধ্যেও বাঘের হিংস্র



চিত্র : ২১

চরিত্রটি ফুটে উঠেনি। মহেঞ্জোদড়ো শহরের শেষ সময়কালের একটি স্তরে পাওয়া একটি মোহরে [চিত্র : ২২] জিহ্বা-দন্ত ব্যাদানকারী একটি ব্যাঘ্রমূর্তি



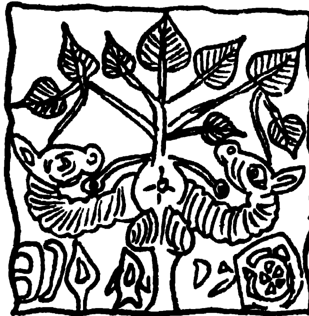
চিত্র : ২২

দেখা যায়, যেটিকে এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করতে পারি। কিন্তু মোহরে খোদাই করা এত ব্যাঘ্রমূর্তি দেখা গেলেও খেলনা হিসেবে একটি বাঘেরও সন্ধান মেলেনি, সিন্ধুর কোনো কেন্দ্রেই।

বাঘ সিন্ধুবাসী কোনো এক বৃহৎ-গোষ্ঠীর টোটেম-রূপে গণ্য হত একথা আগেই প্রমাণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। এই বিশেষ কারণেই সম্ভবত বাঘকে খেলনারূপে দেখা হত না ; ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঘ সিন্ধুরাষ্ট্রবাসীদের কাছে একটি ভক্তি বা মর্যাদার অধিকারী যে ছিল, সে কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঘের মাথায় শৃঙ্গসজ্জা সেই মর্যাদারই দ্যোতক : প্রাচীন পৃথিবীর বহু সভ্যতাতেই ঐ শৃঙ্গ-শিরোভূষণ দৈবী অথবা/এবং রাজকীয় মর্যাদার সূচক ছিল। বাঘের মাথায় বৃষের শিং-ওয়ালা মোহর দুটির প্রসঙ্গেও ঐ সিদ্ধান্তই করতে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আর একটি কথাও মনে করা দরকার : প্রথম অধ্যায়ে ব্যাঘ্র-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর কাছে মহিষ-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর পরাভবের যে পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গা-মহিষমর্দিনীর উদ্ভব ঘটেছে বলে

সিদ্ধান্ত করে হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই বাঘের মাথায় বৃষশৃঙ্গের মুকুট তুলে দেওয়া হয়ে ছিল আরেক বিজয়ের লাঞ্ছন হিসেবে, এরকমও ভাবা চলে। অবশ্য এই ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: প্রাচীন কাল্ট্-দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটবার পর এক সময় না এক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যখন একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, তখন সেই সমন্বয়ের সূচক হিসেবে বিভিন্ন টোটেম সংমিশ্রিত হয়ে গেল। আগের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে সে কথাও বলেছি।

এই সমন্বয়ের পরিচয় [অবশ্যই বাঘ-সহ] একাধিক মোহরে দেখা যায়। একটি সীল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : মানুষের চোখওয়ালা একটি মুখে হাতীর শুঁড় এবং একজোড়া গজদন্ত ও মাথায় মহিষের শিং দেখা যায়; ভেড়ার দেহে ষাঁড়ের দুটি পা এবং পিছন দিকটা বাঘের মতো ডোরাকাটা, পিছনের পা দুটি বাঘের থাবা-সম্পন্ন অথচ তাতে ডোরা নেই, ছাগলের লেজ-ওয়ালা বিচিত্র একটি কল্পিত প্রাণী এটি [চিত্র : ৪]; এই রকম আর একটি মোহর আছে মহিষ ও বাঘের সংমিশ্রিত চেহারা আঁকা। আর একটি মোহরে দেখি তারামাছ এবং বাঘের জোড় লাগা একটি দেহ [চিত্র : ৫]! একটি মোহরে একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে দুদিকে দুটি বাঘের মাথা বের হয়ে



চিত্র : ২৩

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে [চিত্র : ২৩], এই রকম ছবি আঁকা হয়েছে। অশ্বত্থ গাছ আদিমকাল থেকে আমাদের সংস্কৃতিতে একটা বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা অর্জন করে আছে, বাঘের সঙ্গে তার এই একান্ত-হয়ে-থাকা মূর্তির বিশেষ কাল্ট্‌গত তাৎপর্য খুঁজে বার করা আদৌ কঠিন নয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে সিন্ধু-সংস্কৃতির যখন বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ

শেষ হয়ে হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটল, তখন থেকেই দেখছি বাঘ সম্পর্কে একটা মনোভাবের নিম্নমুখী মূল্যায়ন ঘটেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একাধিক জায়গায়, শতপথ ব্রাহ্মণে [১৩. ২. ৪।২] এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় [৩০. ৮] 'নর-ব্যাঘ্র' সম্বন্ধে অত্যন্ত অবমূল্যায়িত মন্তব্য করা হয়েছে। পাপ এবং অনাচারের সঙ্গে বাঘ এবং মানুষরূপী বাঘকে সম্পর্কিত করে সেখানে ডাকাত, সিঁদেল চোর প্রভৃতির সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে। মূল রামায়ণে এই অবমূল্যায়িত ধারণার পটভূমিকাটি কি, তা বেশ বোঝা যায়। 'নর-ব্যাঘ্রী', যিনি কি না সিন্ধু রাষ্ট্রে দেবীরূপে পূজিতা হতেন, তিনি উত্তরকালে সিংহবাহিনীতে পরিণত হলেন আর্যভাষী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে, পক্ষান্তরে রামায়ণে [৪. ৪০. ২৬-২৮] নর-ব্যাঘ্রদের 'কিরাতদ্বীপবাসী' বলে অভিহিত করা হল। লৌকিক দেবী যাঁরা তাঁরা ব্যাঘ্রবাহিনীই রইলেন, যেমন বাঘাইদেবী-বনবিবি-সর্বমঙ্গলা-প্রমুখ, পক্ষান্তরে পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক মুছে দিলেন স্মৃতি-শাসিত ও পুরাণ-পোষিত বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের অধিনায়কেরা। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক-প্রভৃতি প্রাগার্য জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা যেখানে মোটামুটি অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছে, বাঘ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার উত্তরাধিকারটাও সেখানে নিটুট রয়েছে। বাঘদেও, দক্ষিণ রায়, সোনারায়-প্রমুখ দেবতারা এবং উপরে উল্লেখিত দেবীরা তারই পরিচয় বহন করছেন।

এখানে খুব সঙ্গতভাবেই একটি প্রশ্ন ওঠে যে, প্রাগার্য জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাসকে অল্পবিস্তর যখন মেনেই নিয়েছিলেন আর্যভাষীরা, তা'হলে শুধু বাঘের বেলাই বা এই বৈলক্ষণ্য ঘটল কোন্ কারণে? তাঁরা উত্তরকালে যে 'হিন্দু' সংস্কৃতির নিয়ন্তা হয়ে উঠলেন, সেখানে ব্যাঘ্র-কাল্ট্ অপাংক্তেয়-প্রায় হয়ে হয়ে উঠল কিসের জন্যে? এমনকি, তুর্কী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন নতুন করে কিছু কিছু 'অন্ত্যেবাসী' দেবতাকে জাতে তোলা হয়েছিল আত্মরক্ষার তাগিদে, তখনও বাঘ বা বাঘ-সম্পর্কিত দেব-দেবীর পুনর্মূল্যায়ন ঘটল না কেন—স্মৃতি-শাসিত, ব্রাহ্মণ্য-বিধান-বিহিত ঐ মধ্যযুগীয় সমাজে?

এর একটা বড় কারণ হল, বাঘ-কাল্ট্ যাঁদের মধ্যে টিঁকে রইল, তাঁদের বৃহদংশ ঐ সমাজের সাংস্কৃতিক বলয়ের বাইরেই থেকে গেলেন। হিন্দুধর্মকে আবর্তন করে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য-বোধ, জল-অনাচরণীয়তা-আচরণীয়তা-প্রভৃতি বিষয় তাকে এমনভাবেই ঘিরে রেখেছিল যে, সেখানে বাঘ-উপাসক প্রাচীনতর গোষ্ঠীর বংশধরেরা ব্রাত্য

হয়েই পড়ে রইলেন। যাঁরা কোনোমতে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেন, তাঁদেরও স্থান হল বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজসৌধের একেবারে নীচের তলায়।

শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মবিশ্বাসে এতদিন বাঘের যে স্থানটা ছিল, সেটা গ্রহণ করল সিংহ। 'নরব্যাঘ্র' দেব-মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে সমাজ-অরি হিসেবে যেমন একদিকে গণ্য হতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি 'নরসিংহ' ঈশ্বরের অবতার-রূপে কল্পিত হল। ভাগবতপুরাণের বিকাশ ঘটবার আগেই নিশ্চয় দেবকল্পনা ও ধর্মবিশ্বাসে ঐ পালাবদল ঘটে গেছে, তা না-হলে ভাগবতে হিরণ্যকশিপু বধের কাহিনী গড়ে উঠত না সেখানে। শিল্পকলাতেও দেখি অন্তত মৌর্যযুগের আবির্ভাবকালেই সিংহমূর্তি-বিশিষ্ট চিত্র-ভাস্কর্যও প্রচলিত হয়েছে। তারই ধারানুবর্তন সারনাথে, লৌরিয়া নন্দনগড়ে। বাঘকে নিয়ে রচিত প্রাচীনতর লোককথাগুলির মধ্যে যেগুলি ওপরতলার সমাজে চলে গেল সেখানে সিংহ এসে তার ঠাঁই নিল। ব্যাঘ্র-কাল্ট্ ও তার সম্পৃক্ত সংস্কৃতিধারার বাহকরা পড়ে রইলেন শ্রেণী ও বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার নীচের কোঠায় অবহেলার অতলে, নিস্তব্ধ শীতলতার মধ্যে।*

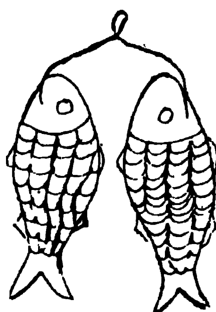
---

*এই নিবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি হরাপ্পা-সংস্কৃতি-সম্পর্কিত যে সব প্রামাণ্য গ্রন্থে মুদ্রিত আলোকচিত্র অনুসরণে লেখক-কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে, সেগুলি হল:

১. ম্যাকে, ই.: 'ফারদার এক্সক্যাভেশ্যনস অ্যাট মহেঞ্জোদাড়ো', ২য় খণ্ড [১৯৪৬]। [চিত্র: ৩, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ২২]।

২. মোডে, এইচ.: 'ডাস ফ্রুহে ইণ্ডিয়েন' [১৯৬৮]। [চিত্র: ১, ২, ৪, ৫, ৭, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩।

৩. রায়, এস. কে.: 'ইণ্ডাস স্ক্রিপ্ট' [১৯৬৮]। [চিত্র: ১৩]।



লোকসমাজ, লোককথা ও বাঘ

শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার

নিম্ন প্যালিওলিথিক যুগের শেষাশেষি পৃথিবীতে যে নতুন করে তৃতীয় বার তুষারযুগের শুরু হয়, তার ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার ব্যাপক এলাকা জুড়ে তুন্দ্রা-আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। অসংখ্য পশুপাখি এই আবহাওয়াকে সহ্য করতে না পেরে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও মানুষ এই নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারল, যদিও অবর্ণনীয় এক বিপর্যয়কে সহ্য করতে হল তার। এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও মানুষ যে রক্ষা পেল তার কারণ, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ ও সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কারটিও সেই সময়েই ঘটে। আগুনের ব্যবহার শিখল মানুষ। এই আগুনকে জিইয়ে রাখতেও সে উপায় বের করল। বন্য পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচা, রান্না করা ও সবার ওপরে শৈত্য-প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষায় আগুন হল তার প্রধানতম সহায়ক। প্রকৃতির ওপরে মানুষের আধিপত্যের প্রথম সূচনা হল আগুনকে ব্যবহার করেই। এই অবস্থায় মানুষই প্রথম তার আদিমতম চরিত্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক প্রাণী হয়ে উঠল। সমাজবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ নতুন বাঁক নেয়। মানুষ তখনও নিজের জন্যে আস্তানা গড়তে শেখেনি, কিন্তু গাছের বাসা ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিতে শিখেছে, বন্য পশু-শিকারের জন্য পাথরের নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এমনি করে উচ্চ প্যালিওলিথিক যুগে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটল ; আর এই সময় থেকেই প্রথম জাতিগত বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই বিভিন্নতা ভেতরের কোনো বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, মানব উদ্ভবের প্রথম স্তর থেকে উচ্চ ও হীন এই স্বাভাবিক স্তরবিন্যাসও ঘটে নি। এই বিভিন্নতা শুধুমাত্র ত্বকের রঙ, চুলের ধরণ প্রভৃতি কেবলমাত্র বাহ্যিক দেহগত বৈশিষ্ট্যের ওপরই নির্ভর করে। আদিম গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটল এই স্তরে, সামাজিক জীবন গড়ে উঠল, সীমিত অর্থে গ্রাম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হল।

মানুষের সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে। প্রথম স্তর হল বন্যদশা, মধ্যম স্তর বর্বর দশা ও সবশেষ স্তর হল সভ্যদশা। বন্য ও বর্বর দশার আবার তিনটি করে উপস্তর রয়েছে। বর্বর

দশার মধ্যম স্তরে পূর্ব গোলার্ধের মানবগোষ্ঠী পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তুলতে শিখল, পশ্চিম গোলার্ধে সেচের মাধ্যমে যব জাতীয় শস্যের কৃষি-কাজ শিখল। বর্বর দশার শেষ পর্যায়ে আকরিক লোহা গলাবার পদ্ধতি ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবিত হল। সমাজবিপ্লব ঘটল সভ্যদশায় এসে। মানব-গোষ্ঠী স্বরবিষয়ক বর্ণমালা আবিষ্কার করল, আদিমতম প্রথায় লেখার ব্যবহার চালু হল।

এই ব্যাপ্ত সময়কালে মানবসমাজ প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে চলতে লাগল। আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষে মানুষে শ্রেণী-বিভেদ ও বিদ্বেষ ছিল না ঠিকই, কিন্তু ছিল চরম দারিদ্র্য ও অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালা। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিভেদ সমাজকে আরও পর্যুদস্ত করে তুলল। তাই সেই সব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে স্বপ্ন-কল্পনার অবকাশ প্রায় ছিলই না বললে চলে, প্রাণ ধারণের সংগ্রামে তাকে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হত। অপ্রয়োজনে কোনো কিছুর সৃষ্টি করা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ভাবনা ছিল। শুধুমাত্র জীবনধারণের তাগিদেই সবকিছুর উদ্ভব। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমে বস্তু, তারপরে চৈতন্যের জন্ম। বস্তুর অবয়ব ছাড়া চিন্তার জন্ম হতে পারে না। পরিবেশে যা নেই, অভিজ্ঞতায় যা সঞ্চিত হয়নি—এমন কোনো কিছুই ভাব এবং চিন্তারাজ্যে স্থান পেতে পারে না।

আজকে বিজ্ঞানকে যে অর্থে আমরা ব্যবহার করি, প্রাচীন লোকসমাজ তার হদিশ পায় নি। কিন্তু তাদের লোকবিশ্বাসে সেটাই ছিল উন্নততম বিজ্ঞানের প্রয়োগ। এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে। আজও এই লোকবিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, উত্তরাধিকারসূত্রে ঐতিহ্য-পরম্পরায় দুর্বল মানুষ একে বয়ে নিয়ে চলেছে।

লোকসমাজে বাঘ কিভাবে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তার পরিচয় জানা প্রয়োজন। কেননা, বন্য হিংস্র বাঘের সঙ্গে লোকসমাজের সম্পর্ক না জানতে পারলে বাঘ সম্পর্কিত লোককথার মূল উৎসও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সাঁওতাল আদিবাসী মনে করেন, বাঘ যেমন যৌবনদীপ্ত ও নীরোগ, সবল ও তেজী,—কোনো রুগ্ন শিশুকে যদি বাঘের মাংস খাওয়ানো যায় তবে উত্তর-জীবনে সে বাঘের মতই গুণের অধিকারী হবে। বাঘের মাংস সবসময় পাওয়া যায় না, তাই টুকরো মাংস শুকিয়ে রাখারও চল হয়েছে। এঁরা বিশ্বাস করেন,

বাঘের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকরী ক্ষমতা রয়েছে। যেমন, ছেলেদের বশীভূত করার জন্য মেয়েরা বাঘের গোঁফ ব্যবহার করেন।

সাইবেরিয়া ও তুর্কিস্তানের জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন, বাঘের রোগ-নিরাময় করবার ও দেহকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং পুরুষত্বহীনতায় ও দেহগত কামনায় আরও বলিষ্ঠতা প্রয়োগে বাঘের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারে অনিবার্য সুফল পাওয়া যায়। আসামের মিরি আদিবাসী মনে করেন, বাঘের মাংস মানুষের দেহে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে। কোরিয়ার অধিবাসী বিশ্বাস করেন, বাঘের হাড় গুঁড়ো করে মদের সঙ্গে পান করলে শক্তিমান ও বীর্যবান হওয়া যায়।

রোগ নিরাময় ও দৈহিক শক্তি ছাড়াও বাঘ সম্পর্কে কয়েকটি বিশ্বাস লোক-সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। সুমাত্রার গ্রামবাসীরা বাঘ সম্পর্কে কখনও অশ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য উক্তি করেন না ; কারণ, এর ফলে গ্রামের ওপর বাঘের আক্রমণ নেমে আসতে পারে। রাত্রে তাঁরা খালি মাথায় চলাফেরা করেন না, পথে চলবার সময় পেছনে তাকান না। এতে বাঘ অসন্তুষ্ট হয়। আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁরা পারতপক্ষে কখনও বাঘ হত্যা করেন না। টোটেম হত্যা যেমন নিষিদ্ধ, সেইভাবে তাঁরা বাঘকে দেখে থাকেন। মানুষখেকো বাঘকে না মারলে চলে না, তাই তাকে ফাঁদে জ্যান্ত ধরা হয় এবং হত্যা করবার আগে বাঘের কাছে তাকে হত্যার কারণ জানিয়ে সমবেতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। বাট্টা জাতিগোষ্ঠী মানুষখেকো বাঘকে হত্যা কোরে তার আত্মার কাছে জবাবদিহি করেন। বাঘের মৃতদেহের চারপাশে তাঁরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত নৃত্য করে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষের আত্মা বাঘে অনুপ্রবিষ্ট হয়। চীনের আদিম অধিবাসীরা বাঘকে ফাঁদে ধরতে বাধ্য হয়েও এই কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, মানবীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে, বিশ্বাসে ও সংস্কারে যে সব পশুপাখি এইভাবে জড়িয়ে থাকে, তাদের নিয়েই তাঁরা সৃষ্টি করেন অপরূপ সব লোককথা। যে পশুপাখি তাঁরা দেখেন নি, যাদের স্বভাব সম্বন্ধে তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাদের নিয়ে সচরাচর তাঁরা লোককথা সৃষ্টি করেন না। তাই শেয়াল, কাক, বানর, টুনটুনি, ইঁদুর, নেকড়ে, ভাল্লুক প্রভৃতি পশুপাখিই লোককথায় ব্যাপক এলাকা জুড়ে রয়েছে। যা তাঁরা দেখেন নি, তাকে নিয়ে কিভাবে লোকসমাজ গল্প তৈরি করবেন ? কেননা, বস্তু ছাড়া চিন্তা আসবে

কি করে? সে কথা আগেই বলেছি। যেখানে যে পশুপাখি নেই, সেখানে সেরকম কিছু গল্প পাওয়া গেলে মাইগ্রেশান-এর মাধ্যমে এসেছে তা ধরে নিতে হবে। কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম।

পৃথিবীর অগণিত জনগোষ্ঠীর লোককথা বিচার করলে দেখা যাবে বাঘ সম্পর্কিত লোককথা একদিকে যেমন সংখ্যায় কম, তেমনি অন্যদিকে বিশেষ কয়েকটি দেশেই তা সীমাবদ্ধ। এর কারণ হল, বাঘ জন্তুটি চিরদিনই দূরের ও ভয়ের বস্তু। হৃদ্যতা ও পরিচয় সহজতর নয়। মানুষ সাপের মত সাংঘাতিক ও হাতির মত বলশালী পশুকেও বশে এনেছে, কিন্তু প্রাচীন জনগোষ্ঠী বাঘকে সহজ করে তুলতে পারে নি।

ইদানীং কালের প্রাণীবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, বাঘের প্রথম জন্মস্থান উত্তর ইউরেশিয়া। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত নানা কারণে তারা দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করে। তারপর তাদের আস্তানা হয় আফ্রিকার বিরাট এলাকা, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান, চীনের নানা অঞ্চল বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া এবং জাভা, সুমাত্রা, মালয়, ভারতের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই অনুমান সত্য বলে মনে হয়। কেননা, যদি ধরে নেওয়া হয় পৃথিবীর নানা অঞ্চলে এখন বাঘের দেখা না পাওয়া গেলেও একসময় ছিল, তাহলে সেখানে বাঘ সম্পর্কে যেমন লোক-বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যেত, তেমনি লোককথাও গড়ে উঠত। কিন্তু আমরা অধিকাংশ লোকবিশ্বাস ও লোককথার সন্ধান ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত এলাকা থেকেই পাচ্ছি। অন্য কোথাও থেকে নয়।

এখানে কয়েকটি দ্বীপের কথা বলতে হচ্ছে যেখান থেকে আমরা অসংখ্য বাঘ-সম্পর্কিত লোককথা পেয়েছি। অথচ কোনো অবস্থাতেই সেখানে বাঘ থাকবার কথা নয়, কিংবা কোনোকালে ছিল তারও কোনো প্রমাণ নেই। মধ্য আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যে জ্যামাইকা এবং পূর্বদিকে লিওয়ার্ড, ত্রিনিদাদ ও উইণ্ডওয়ার্ড প্রভৃতি দ্বীপে বাঘের লোককথা রয়েছে। বন্য স্বাধীন দৃপ্ত বাঘের স্বভাব ও চাতুর্য সম্পর্কে অসংখ্য লোককথার সংগ্রহ আছে। কেমন করে এটা হল? আঠারো-উনিশ শতকে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে আফ্রিকা থেকে শত সহস্র মানুষকে শ্রমদানের জন্য ক্রীতদাস করে এইসব দ্বীপে আনা হয়েছিল। তাঁরা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সেখানকার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন নি এবং লোকসমাজ তা মুছে ফেলতে চানও না। তাঁরা

নিজস্ব ঐতিহ্যের লোককথা তাঁদের সন্তানদেরকে বলেছেন, যারা কোনোদিন পিতৃভূমি দেখে নি। আবার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা আফ্রিকার যে অংশ থেকে এসেছেন তাঁরা সেখানকার লোককথাই তাঁদের পরিবারে রেখে গিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের যে, আফ্রিকাবাসী এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বাঘের লোককথা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এইসব দ্বীপের আদি অধিবাসীদের মধ্যে বাঘের কোনো লোককথার সন্ধান পাওয়া যায়নি। সমস্যাটির সমাধান এইভাবেই করা সম্ভব হতে পারে।

প্রাচীন হিট্টি সাম্রাজ্যের কোনো লোককথার সন্ধান করা আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু বাঘের প্রাচীনতম দুটি মূর্তি আমরা দেখেছি এই সাম্রাজ্যের আমলে গড়া মূর্তিতে। কারচেমিশ-এ একটি হিট্টি দেবতার মূর্তি রয়েছে, তার পায়ের কাছে দুপাশে দুটি বাঘ মুখ হাঁ করে দাঁত বের করে রয়েছে, মধ্যে মানবদেহী পশু-মুখাকৃতি একজন দুহাতে বাঘের গালে হাত দিয়ে রয়েছে। এই মূর্তিটি প্রথম টিগলাথ-পিলেসের আমলের বলে অনুমান করা হয় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আর একটি বাঘের মূর্তি খুব উল্লেখযোগ্য। বাঘের মূর্তিটি সোনার। চীনের হান সাম্রাজ্যের আমলের কিংবা সাইবেরিয়ার মূর্তি বলে এটা অনুমান করা হয়। বাঘের এই দুটি মূর্তি হয়তো রাজা বা সামন্তপ্রভুদের আদেশেই নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু যাঁরা এইসব মূর্তি গড়েছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে লোকশিল্পী। অর্থাৎ, ভাস্কর্যে যখন বাঘের মূর্তি স্থান পেল, লোকশিল্পী যখন সুন্দরভাবে বাঘের আদল মূর্ত করতে সমর্থ হলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, লোককথার মধ্যে বাঘ স্থান পেয়েছে। কেননা, লোকসমাজ তার অপরিচিত কোনো বস্তুকেই সাহিত্যে ও শিল্পে স্থান দিতে রাজী নন। আর লোককথায় যা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, শিল্পে তারই প্রকাশ ঘটে, এবং বেশ সময়ের ব্যবধানে। তাই বাঘের লোককথা নিঃসন্দেহে অতি সুপ্রাচীনকালের।

লোকসমাজ তার টোটেম বেছে নেয় পশুপাখি ও গাছপালা থেকে। সাধারণভাবে এটাই রীতি। আবার টোটেম নামাঙ্কিত পশুপাখি তাদের অতি পরিচিত, যে পশুপাখি তাদের পরিবেশে নেই সে-নাম তারা কখনও ব্যবহার করতে পারে না। এখন দেখা যাক বাঘ টোটেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা।

প্রথমত, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষই প্রাচীন কালে বাঘের সঙ্গে

পরিচিত ছিল না, কেননা তাদের দেশে বাঘ ছিল না। দ্বিতীয়ত, যোগাযোগের মাধ্যমে যখন বাঘের নাম, স্বভাব ও আকৃতির সঙ্গে লোকসমাজ পরিচিত হল সে অনেক পরের ঘটনা। তার অনেক আগেই বিভিন্ন টোটেমের নামে তাঁরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। তাই টোটেম-এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। টোটেম নামের মধ্যে সাধারণত হরিণ, হাঁস, কচ্ছপ, মোষ, ভাল্লুক, সাপ, কাক, নেকড়ে, ঈগল, পায়রা, পেঁচা, মুরগী, কুকুর, কুমীর, শেয়াল, মাছ, বুনো বেড়াল, কাঠবিড়াল, গোরু পাওয়া যায়। নিজস্ব অনুসন্ধিৎসা মত আমি একটিমাত্র আদিবাসীর মধ্যে বাঘের নামাঙ্কিত টোটেম পেয়েছি। অজ্ঞাত কত তথ্যই তো রয়েছে, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যদি বাঘ টোটেম আরও থেকে থাকে তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম।

যাই হোক, এই আদিবাসী গোষ্ঠী হলেন গাল্‌ফ আদিবাসী গোষ্ঠীর মুস্‌কোকি বা ক্রিক। এঁদের বংশধারা মায়ের দিক থেকে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এঁদের বাইশটি টোটেমের মধ্যে একটি হল কাট্‌-চু বা বাঘ।

পৃথিবীর বিশাল লোককথা সংগ্রহের মধ্যে বাঘকে কেন্দ্র করে গল্পের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। আবার, বাঘের সত্যিকার স্বভাব প্রকৃতি চতুরতা, শক্তি, সাহস যে-সব গল্পে রয়েছে তার সংখ্যা আরও কম। বাঘকে ব্যঙ্গ করে কিংবা তার দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যেসব গল্প রয়েছে তার সংখ্যাই বেশি। প্রথম অংশের গল্পে রয়েছে বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা, আর দ্বিতীয় অংশে অভিজ্ঞতার অভাব ও অবাস্তব স্বভাব বর্ণনা।

লোকসমাজের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। যাকে তারা পরাভূত করতে পারে না, যার শক্তির কাছে মাথা নত করতে হয়,—তাকে গল্পের মধ্যে ছোট করে, ব্যঙ্গ করে কিংবা অতি তুচ্ছ প্রাণীর হাতে তাকে বধ করিয়ে আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, কিংবা বলা যেতে পারে মনের ইচ্ছাকে গল্পে রূপ দেওয়া। দ্বিতীয় অংশের লোককথাকে এভাবে বিচার করা অবশ্য চলে। কিছু বাঘের গল্পের ক্ষেত্রে তা যদি সত্যি হত তবে এত সংখ্যাল্পতা কেন? মনে হয় কারণটি অন্য। কোন সমাজে বাঘের লোককথার জন্ম হয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করলে সমস্যাটির কিছুটা সমাধান হবে।

বাঘের লোককথাগুলির অধিকাংশই খাদ্য-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি। মানুষ যখন কৃষির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নি, কিংবা কৃষিকাজ জানলেও পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি, তখন বাধ্য হয়ে তারা গভীর বনভূমিতে যেত।

আবার যেখানকার কৃষিজমি অনুর্বর সেখানকার মানুষকে তো ফল-মূল-কাঠ-মধু প্রভৃতির জন্য বনে যেতেই হত। উন্নত অস্ত্রের অভাবে বনভূমির পশুর সঙ্গে তাদের নিয়মিত অসম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হত। তার মধ্যে সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি প্রভৃতি কয়েকটি জন্তু তো ছিল বিভীষিকা। তাদের সঙ্গে যাতে মুখোমুখি দেখা না হয় তার জন্য তারা অদেখা শক্তির কাছে প্রার্থনা জানাত, দুরন্ত পশুকে মন্ত্রে মুগ্ধ করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিত, হোয়াইট ম্যাজিকের আশ্রয়ে বাঁচবার পথ খুঁজত। সুন্দরবনের মধু ও কাঠ আহরণকারীদের মধ্যে আজও এসব রীতির বহুল প্রচলন রয়েছে। অসহায় অবস্থার বাস্তব প্রকাশ এইসব ম্যাজিক। কিন্তু 'অতিলৌকিক' যত ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করুক না কেন, বাঘের সম্মুখে তাদের পড়তেই হত, মানুষ যত বুদ্ধি খাটাক, আরও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান বাঘ তার সব কৌশলকেই ব্যর্থ করে দিত। এটা তার জীবনে বীভৎস রকম সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই একদিকে বাঘকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নানা নিষেধের জন্ম হয়েছে, নানা ট্যাবু কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বাঘের বিক্রম ও বুদ্ধির নানা লোককথা গড়ে তুলেছে। এই হিসেবে দেখতে গেলেও আমরা বুঝতে পারি বাঘের লোককথাগুলি যেমন কয়েকটি দেশের লোকসমাজেই সীমাবদ্ধ, তেমনি গল্পগুলির প্রাচীনত্বও অনস্বীকার্য। বনভূমি থেকে দূরে যারা বিস্তৃত কৃষিজমিতে চাষ করে জীবনযাপন করে, তাদের সঙ্গে বাঘের পরিচয় নেই বলেই লোককথায় সে স্থান পায় নি। আর খাদ্য-সংগ্রাহক গোষ্ঠীর প্রতিদিনের ভীতির বস্তুটি অতি চেনা, জীবনহানিকর হলেও অতি অতি কাছের।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলতে হয়। অধিকাংশ লোককথার স্রষ্টা লোকসমাজের নারীরা। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে, অবসরের সময় উত্তরপুরুষের কাছে গল্পের ভাণ্ডার উন্মোচিত করেন নারীরাই। লোকসমাজে সামগ্রিকভাবে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়ে প্রজন্ম-পরম্পরায় স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকে। কিন্তু বাঘের লোককথাগুলি পুরুষের সৃষ্টি, কোনোভাবেই তা নারীর সৃষ্টি হতে পারে না। বাঘ সম্পর্কে অনবদ্য এইসব লোককথা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। যেসব গল্পে বাঘ বোকা, রাজার মেয়ে বিয়ে করতে আগ্রহী, সবার কাছে শুধুই ঠকে,—সে-সব কল্পিত লোককথা নারীর সৃষ্টি। আর যেসব গল্পে বাঘের বাস্তব প্রকৃতি রূপ পেয়েছে সেগুলি পুরুষের বনভূমির অভিজ্ঞতার আলোকে রূপলাভ করেছে।

উদাহরণ ১ : অনেককাল আগে পশু ও পাখিদের মধ্যে অনেকদিন ধরে লড়াই হয়। শেষকালে পাখিরা যুদ্ধে জেতে আর তারা পশুদের চল্লিশ বছর ধরে তাদের অধীনে রাখে। পশুরা মাথা নিচু করে থাকে। কিন্তু একদিন সিংহ আর বাঘ গর্জে উঠল। তারা আর এভাবে বাঁচতে চায় না। তারা পশুদের উত্তেজিত করে তুলল, একটা শেষ মীমাংসা তারা করতে চায় [সংক্ষিপ্ত]।

এই পশুকথাটি আফ্রিকার ইবো আদিবাসী গোষ্ঠীর। বাঘ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই পশুকথার জন্ম হয়েছে। বাঘের প্রকৃত স্বভাব,—তার স্বাধীনচেতা মনোভাব, নির্ভীকতা ও অনিশ্চয়তায় ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রবণতা এবং সর্বোপরি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা,—ফুটে উঠেছে এই পশুকথাটির মধ্যে দিয়ে।

উদাহরণ ২ : সোনালী খরগোশ একদিন বাঘের কাছে গিয়ে বলল, 'চল বন্ধু, কাল সকালে আমরা মাঠে যাই। ধান কাটা হয়েছে, জমি থেকে ধানশুদ্ধ খড় জোগাড় করতে হবে।' বাঘ বড় ভালমানুষ। সে খুব খুশি। তখন খরগোশ তার বন্ধু হল। কাল থেকে খুব ভাব জমে উঠবে।

জমিতে সব কাজ বাঘ একাই করল। ধান নিল খরগোশ, খড় নিল বাঘ। সেই খড়ে আগুন দিল খরগোশ, পিঠ পুড়লো বাঘের, ফোস্কা পড়ল। খরগোশের পরামর্শে বোকা বাঘ গাছের বাকলে পিঠ ঘষল, ফোস্কা গেল ফেটে। তারই কথামত নদীর বালির চরে বাঘ পিঠ ঘষল, রক্ত ঝরল। খরগোশ তাকে নিয়ে গেল ইচ্ছাপূরণ কুয়োর কাছে, প্রার্থনা করলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। কুয়োর পাশে বসে বাঘ মন দিয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা মারল খরগোশ, অন্যমনস্ক ছিল বাঘ। আহা বেচারী ভালমানুষ বাঘ। প্রচণ্ড শব্দ হল, ছিট্‌কে পড়ল কিছু জল, বাঘ ডুবে মরল [সংক্ষিপ্ত]।

পশুকথাটি বার্মার অরণ্যে-ঘেরা এক আদিম গোষ্ঠীর। এখানে বাঘের চরিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম, যা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় না। বাঘের সারল্য ও বোকামি এবং পদে পদে ঠকে যাবার চিত্রগুলি সত্যিকার বাঘের প্রকৃতির সঙ্গে আদৌ মেলে না। এ গল্প দ্বিতীয় অংশের মানসিকতার ফসল।

উদাহরণ ৩ : অনেককাল আগে আমাদের দেশে দু-ধরণের মানুষ সুখে দিন কাটাত। একদল মানুষ থাকত গাঁয়ে আর তারা জমি চাষ করত। অন্য একদল মানুষ পাহাড়ের কোলে ভীষণ সব পশুদের মধ্যে জীবন কাটাত।

একদিন গাঁয়ের এক মানুষ পাহাড়ে গেল, মনের খুশিতে সে এগিয়ে গেল।

সেখানে সে দেখল খুব সুন্দরী একটা মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাল লাগল তাকে, গাঁয়ে এনে তাকে বিয়ে করল। সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল। তারপরে তাদের কোলে এল একটা ফুট্‌ফুটে মেয়ে। কিন্তু মেয়েটা বাঁচল না, আর তাই মানুষটা বৌকে আর তেমন আদর-যত্ন করত না।

মন খুব খারাপ। একদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখে কুঁড়েতে কেউ নেই। কিন্তু তার বাড়ির সামনে কাঁচা মাটিতে বাঘিনীর থাবার ছাপ। সে বুঝল কি ঘটে গিয়েছে। আসলে তার বৌ একটা বাঘিনী হয়ে গভীর বনে ফিরে গিয়েছে।

মানুষটা রওনা দিল বনের পথে পাহাড়ের দিকে, সঙ্গে নিল মেয়ের জামাকাপড়। বাঘিনীর পায়ের থাবার ছাপ দেখে সে এগোল। শেষকালে সে এল একটা গুহার সামনে। ভেতরে দেখল দুটো চোখ জ্বলছে অন্ধকারে। মানুষটা ভয় পেল না। তার বৌ নেই, মেয়ে নেই, জীবনে তাই সুখ নেই।

সে মেয়ের জামাকাপড় গুহার সামনে রাখল। বাঘিনী গর্‌গর্‌ করে লেজা ঝাপটে ভীষণ আক্রোশে মানুষটার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। হিংস্রতায় বাঘিনী এমন জোরে লাফ দিল, শিকার ধরার ক্রূরতায় সে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে গুহার ছাদের উচ্চতা লক্ষ্য করে নি। তাতে লেগে সে পড়ে গেল গুহার ঠিক সামনে। পড়েই আবার লাফাতে যাবে, এমন সময় মরে যাওয়া মেয়ের জামাকাপড় দেখে তার মন গলে গেল। কোথায় গেল তার ভীষণ চেহারা, মানুষটাকে হত্যা করতে ভুলে গেল। তার আদরের মেয়ের জামা থাবায় ধরে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পাহাড়ের দিকে, ধীরে ধীরে বাঘিনীর রূপ বদলে গেল, সে আবার হয়ে উঠল আগের মত সুন্দরী বৌ। মানুষটির গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকোল, তারপরে হাত ধরে আস্তে আস্তে ফিরে চলল গাঁয়ের শূন্য কুঁড়ের দিকে [সংক্ষিপ্ত]।

বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় খুব জনপ্রিয় এই গল্পটি। এই লোককথাটি মিশ্র অনুভূতির। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মানসিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাঘের হিংস্রতা, বীভৎসতা ও সাহস একদিকে, আর অন্যদিকে মানুষ-মায়ের সন্তানপ্রীতি, শোকাতুরা মায়ের উৎকণ্ঠা এবং প্রেয়সীর মধুর আচরণ—এই দুই ভিন্নধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই বাঘে আরোপ করা হয়েছে। এ ধরণের মিশ্র অনুভূতির গল্পও রয়েছে বাঘকে ঘিরে।

লোকসমাজ তাদের লোককথায় বাঘকে এইভাবেই চিত্রিত করে থাকেন। যে অনুভূতিই তাঁরা প্রকাশ করুন না কেন, অনবদ্য সে ভঙ্গি।

বাঘকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জীবন্ত প্রকাশ দেখা যাবে মালয়ের জঙ্গল এলাকার সেমাঙ্ আদিবাসীদের লোককথায়। প্রাচীনতম এক ঐতিহ্যকে এই সেমাঙ্ আদিবাসীরা বহন করে চলেছেন। তাঁদের লোককথার বিশেষত্ব হল, লোককথা বলতে বলতে লোককথার একটি চরিত্রকে নিয়ে তাঁরা সুন্দর গান বাঁধেন এবং গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে তা সুর করে গেয়ে থাকেন। যেমন অনন্য এঁদের লোককথা, তেমনি অপরূপ এই মধ্যবর্তী গানগুলো।

এঁদের সমাজে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। পুরোহিত বাঘের অনুকরণ করেন, তিনি তখন মনেপ্রাণে বাঘ হয়ে যান। এবং অদেখা ঈশ্বরের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর 'বাঘের চোখে' তখন তিনি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পান। তারপরে পুরোহিত একটা কুঁড়ে ঘরে ঢোকেন, বাইরে থাকেন গ্রামবাসীরা। পুরোহিত ভেতর থেকে লোককথা ও গান বলেন, তার মধ্যে তাদের সমাজের ভবিষ্যৎ কর্তব্যের কথা, রোগের ওষুধ, সামাজিক পাপের কারণ সবই ইঙ্গিতে জানাতে থাকেন। সামাজিক কর্তব্যকর্মের কথা বাদ দিলেও এর মধ্যে সুন্দর লোককথা ও গানের সন্ধান আমরা পাই।

সেমাঙ্ আদিবাসী বাঘকে চেনেন, কেননা বাঘকে নিয়েই তাঁদের বসতি। বাঘের নির্ভুল, নিষ্ঠুর পদক্ষেপ, বীভৎস আক্রমণ এবং নির্দয়তা সবই ফুটে ওঠে গানের মধ্যে। বাঘকে কেন্দ্র করে এমন একটা লোককথার অংশ-রূপ একটি গানের নমুনা :

'With great strides the bidog marches into the hut,
With lightning in his eyes he marches into the hut,
With glitettering stripes he marches into the hut,
On the shore of the Sengon he marches into the hut ,
Turning round in circles he marches into the hut.'

বাঘের এমন তুলনাহীন বর্ণনা বিশ্ব-লোকসমাজে দুর্লভ। আর এর রচয়িতা ঐতিহ্যপ্রিয় এক আদিবাসী গোষ্ঠী।

লোকসমাজের সঙ্গে বাঘের যে সম্পর্ক তারই প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন লোককথায়। বাঘকে ব্যঙ্গ করবার মধ্যেও তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা রূপ পেয়েছে। বাঘের বুদ্ধিমত্তাকে তারিফ

করতেও লোকসমাজ কুণ্ঠিত হয় নি, চাতুর্যে সে যে মানুষকে পরাজিত করতে সক্ষম তাও দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে মানুষই তার রচিত গল্পে। উদার লোকসমাজের হৃদয়ের ব্যাপ্তিও এর মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতাল আদিবাসীদের একটি লোককথায় সে ভাবনা বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পটি এই রকম ঃ

একটা লোক আর একটা বাঘ একটা কুঁড়েঘরে ঢুকল। ঘরের দেওয়ালে ছিল একটা ছবি, যাতে আঁকা রয়েছে, একটা লোক একটা বাঘের গোঁফ ধরে টানছে, ফলে বাঘের মুখটা যন্ত্রণায় হাঁ হয়ে আছে আর অন্য এক হাতে লোকটা মুগুর দিয়ে বাঘকে ভীষণ মারছে।

লোকটা বুক ফুলিয়ে বলল ঃ 'দেখ, মানুষের কি সাহস, বাঘকে কাবু করে ফেলেছে,······আঃ কি সাহস !'

বাঘটা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল ঃ 'ছবিটা এঁকেছে একটা মানুষ, বাঘ আঁকলে ছবিটা অন্যরকম হত।'



বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

পশুরাজ্যের রাজসিংহাসনটি যতই কেন পশুরাজ সিংহের অধিকারভুক্ত হোক, বাংলা লোকসাহিত্যের রাজ্যে কিন্তু সেই সিংহাসনে সিংহের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বাঘ। বস্তুতপক্ষে বাংলা লোকসাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বাঘের যে রাজকীয় আধিপত্য, দোর্দণ্ড প্রতাপ, সেক্ষেত্রে পশুরাজ সিংহের ভূমিকাটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। তাহলে সিংহকে বাদ দিয়ে বাঘের প্রতি কি আমাদের গ্রাম বাংলার সংহত সমাজ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে যুক্তিসংগত কারণেই বাংলা লোকসাহিত্যের খাসমহল বাঘের অধিকারে। আমরা জানি যে লোকসমাজের অভিজ্ঞতায় যা নেই তা কখনও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় না; যেহেতু বাঙালীর অভিজ্ঞতায় সিংহ অপেক্ষা বাঘ আরও প্রত্যক্ষ তাই বাংলা লোকসাহিত্য বাঘকেই মুখ্যতর আসন দিয়েছে।

বাঘের প্রসঙ্গ উঠলেই স্বভাবতঃই এসে পড়ে সুন্দরবনের কথা। সুন্দরবনের 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারে'র খ্যাতি সমগ্র জগৎ জুড়ে। তাই বলে বাঘ যে কেবল এই অঞ্চলটুকুতেই আছে তা কিন্তু নয়। জনবসতির ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি আমাদের অরণ্যাঞ্চলকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করেছে সত্য, আর সেই সঙ্গে বাঘের আবাসস্থলও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুকাল আগেও চিত্রটি ছিল অন্যরূপ। অখণ্ড বাংলাদেশের একদিকে যেমন অরণ্যাঞ্চলের অভাব ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না বাঘের। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ছিল বাঘের অবাধ বিচরণ। আর তারই ফলে অরণ্যাঞ্চল থেকে মধু, মোম, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে মানুষ যেমন বাঘের শিকার হয়েছে বা আজও হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অসংখ্য গবাদি পশুও বাঘের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে।

এইভাবেই বাঘের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। অবশ্যই সে পরিচয় খুব মধুর নয়, বরং বলা চলে দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়েই বাঘের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তাই বাঘ বাঙ্গালীর জীবনে মূর্তিমান বিভীষিকারই

অপর নাম, ভীতি, ক্ষোভ আর আক্রোশ যুক্ত হয়ে আছে এই প্রাণীটির প্রসঙ্গে। অতএব আমাদের সংহত সমাজের মানুষের চেতনায় বাঘ যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং সেই সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যে নানা ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে—এটাকে একটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা বলেই স্বীকার করে নিতে হয়। এখন কথা হলো লোকসাহিত্যের সবকটি ক্ষেত্রেই কি বাঘ সমান ভাবে আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে? এর উত্তরে বলতে হয় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ, ছড়া, গান আর গল্পেই এই প্রাণীটি কম-বেশি সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ধাঁধায় সে তুলনায় বাঘের ভূমিকা খুবই অকিঞ্চিৎকর। যদিও প্রবাদ, ছড়া, গান এবং লোককথায় বাঘ নানা প্রসঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, বাঘ সম্পর্কে সমান মানসিকতার প্রতিফলন কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে ঘটেনি। বরং ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা তথা দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে।

ধরা যাক প্রবাদের কথা। আমরা জানি প্রবাদ হলো দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম বাঙ্ময় প্রকাশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদে আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে মানব চরিত্র এবং মানুষের আচরণ। মূলতঃ মানুষকে নানা বিষয়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে প্রবাদগুলি। তাই প্রবাদ-রাজ্যে বহু বিষয়ের অবতারণা ঘটলেও সেইসব বিষয় গৌণ হয়ে গেছে, ভিন্নতর অর্থ প্রকাশে তাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে এইমাত্র। এইভাবে বাংলা প্রবাদে বাঘের প্রসঙ্গ এসেছে। তাই বাংলা প্রবাদে বাঘের প্রকৃত পরিচয়টুকু উদ্ঘাটিত হতে পারেনি। বাঘ এখানে হয় উপমান নতুবা বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাঘের যেটুকু পরিচয় প্রবাদগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তা পরোক্ষভাবেই। আর এই পরিচয়ে বাঘের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, তার সুযোগসন্ধানী চরিত্র, নখের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির ওপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবাদে বাঘের ভয়ঙ্করতা অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে।

কিন্তু ছড়ায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। বাঘ সম্পর্কে আমাদের যে সংস্কার তারই যথার্থ প্রতিফলন লক্ষিত হয় ছড়ায়। তাই ছড়ায় যে বাঘের পরিচয় উপস্থাপিত, তাতে তাকে হিংস্র, নরখাদক এবং গো-হত্যাকারী রূপে দেখা যায়। ছড়ায় বাঘের রক্তলোলুপতা এবং হিংস্রতা যথার্থ ভাবে প্রকাশিত।

এহেন হিংস্র প্রাণীটিকে মোকাবিলা করা হয়েছে ছড়ায় দ্বিবিধ উপায়ে— প্রথমত বাঘকে হত্যা করার কথা অনেকগুলি ছড়াতেই বলা হয়েছে। আবার কিছু কিছু ছড়ায় বাঘের স্তুতিও প্রকাশিত হয়েছে যাতে এই হিংস্র প্রাণীদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনকি ব্যাঘ্রের আক্রমণে আক্রান্ত মানুষের ক্ষত নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ব্যাঘ্র-সংক্রান্ত ঐন্দ্রজালিক ছড়ার ব্যবহার লক্ষিত হয়। মানুষ যখন অসহায়, প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন, তখন নিজের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্মে স্বতঃই তাকে অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ ভয় থেকে এক্ষেত্রেই উৎপত্তি হয়েছে ভক্তির।

পক্ষান্তরে বাংলা উপকথায় যে বাঘের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের, সে বাঘ ছড়ার বাঘের বিপরীত। উপকথার বাঘ যেমন নিরেট বোকা তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে উপকথার বাঘকে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচান হয়েছে। এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম যে মনস্তত্ত্বটি কাজ করেছে তা হল, বাস্তবে মানুষ যে হিংস্র বাঘের সার্থকরূপে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে বরং তার আক্রমণে, সেই পরাজয়-জনিত শোচনীয় গ্লানি ও ক্ষোভ মিটিয়ে নিয়েছে উপকথার বাঘের ওপর দিয়ে। উপকথার বাঘ তাই শোচনীয় ভাবে সর্বক্ষেত্রেই পরাস্ত এবং তার নির্বুদ্ধিতার জন্য হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। উপকথাগুলির রচয়িতা হয় মহিলা নতুবা পরিণত বয়স্ক মানুষ। ব্যাঘ্রের কবলে মানুষ মারা গেলে আপনজনের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর বা কাতরা বয়স্ক মানুষ পরবর্তীকালে প্রিয়জনহন্তা বাঘের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছে তাকে সর্বক্ষেত্রে পরাস্ত ও উপযুক্ত শাস্তিদানের মাধ্যমে ; অবশ্যই তা বাস্তবে সম্পন্ন করে নয়, কল্পনার জগতে। সত্যকে প্রমাণ করতে হয় না, যা স্বতঃসিদ্ধ তা সূর্যালোকের মতই স্পষ্ট। তাই সত্যের প্রকাশে প্রয়োজন হয় না বেশি যুক্তি-তর্কের ; কিন্তু যা মিথ্যা, যা অবাস্তব তাকে প্রতিষ্ঠা করতে আশ্রয় নিতে হয় কল্পনার, আশ্রয় নিতে হয় অলীক ঘটনাপঞ্জীর এবং উপযুক্ত পরিবেশ রচনার। ছড়ায় বাঘের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশিত, তাই ছড়ায় একদিকে যেমন কল্পনার প্রকাশ সীমিত, তেমনি ছড়ার আয়তনও ক্ষুদ্র। কিন্তু লোককথায় কল্পনার অবাধ প্রকাশ। কারণ সেখানে সত্যকে গোপন করে যা মিথ্যা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান হয়েছে। লোককথার আয়তনও তাই বৃহত্তর।

বাংলা লোকসঙ্গীতেও বাঘকে নিয়ে কখনও তামাশা করা হয়েছে, আবার

অনেক ক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার ইচ্ছায় বাঘের সহায়তা প্রার্থনা করা হয়েছে। কখনও বা মনের মানুষ বা প্রিয়জনের সান্নিধ্যসুখ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় বাঘের ভয় দেখিয়ে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটের ওপর লোকসঙ্গীতেও বাঘের হিংস্র রূপ অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

এইবার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমেই বাংলা প্রবাদে বাঘকে কিভাবে উপস্থিত করা হয়েছে দেখা যাক। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে: 'বাঘের মাসী বেড়াল, আসি বলে ফেরার।' বেড়ালকে বাঘের মাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বাঘ এবং বেড়াল জীববিজ্ঞানীদের মতে একই 'ফেলিন' [Feline] বা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। তাছাড়া উভয়ের শ্রেণী [Order—Carnivora] এবং বর্গও [Family—Felidae] এক। বেড়ালের সঙ্গে বাঘের নানা বিষয়েই গভীর সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য রয়েছে মুখে, চোখে এবং গোঁফে। এমন কি দুটি প্রাণীই ইচ্ছামত নিজেদের কান সর্বত্র ঘোরাতে পারে। বেড়াল এবং বাঘের সাদৃশ্যের কথা অপর একটি প্রবাদেও দেখা যায়: 'বেড়াল বনে গেলে বাঘ হয়'। এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য অবশ্য অন্য: সামান্য ব্যক্তি পরিবেশের গুণে অসামান্যের মর্যাদায় ভূষিত হয়। যথার্থ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ, সেই ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির প্রয়াস নিযুক্ত হলে পরিহাস করে যে প্রবাদটি উল্লিখিত হয় সেটিতেও বিড়াল এবং বাঘ উভয়কেই স্থান দেওয়া হয়েছে: 'চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি। / বাঘ পালাল বেরাল এল ধরতে এথার হাতী॥'

একটি প্রবাদে বিভিন্ন প্রাণীর আত্মরক্ষার উপাদান তথা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'বাঘের নখ, কুমীরের দাঁত, / মাছের আঁশ গণ্ডারের চামড়া'। বাঘের চারটি পাই নখরযুক্ত। তার সামনের দুটি থাবার পাঁচটি নখ বাঁকা আর খুব তীক্ষ্ণ। এগুলি দিয়ে বাঘ মাংস ছিঁড়ে খায় এবং আলস্য ভাঙতে গাছ বা অন্য কোনও কঠিন জিনিষে আঁচড় কাটে। পেছনের দুটি থাবার নখ অবশ্য সামনের থাবার মত অত বাঁকা বা ধারাল নয়। বাঘের নখের অন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে এগুলিকে এরা সম্পূর্ণভাবে থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে।

আর একটি প্রবাদে বাঘের চোখকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার পরামর্শ

দেওয়া হয়েছে—খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে। বাস্তবিক পক্ষে, বাঘের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। বাঘ নিশাচর প্রাণী, সূর্যালোক সে পছন্দ করে না। রাত্রিবেলা তার বড় বড় গোল চোখের রঙ্গুলি ভালভাবে খুলে যায়। তখন তার চোখ দুটিকে জ্বলন্ত অঙ্গার বলে মনে হয়। অন্ধকারে চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে সে খুব ভালমত দেখতে পায়। অতএব প্রবাদে এ হেন বাঘের চোখকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করার যুক্তিসঙ্গত কারণটুকু বেশ বোঝা যায়।

স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হলে বলা হয়: বাঘের যোগ্য বাঘিনী। এরূপ বলার পেছনেও যুক্তি আছে। বাঘ যতই হিংস্র এবং সাহসী ও চতুর প্রাণী হোক, বাঘিনী কিন্তু সচরাচর অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। মানুষের উপস্থিতিতেই বাঘিনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এমন কি মানুষ দেখলে বাচ্চাদের ছেড়ে বাঘিনী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে। তাই বাঘিনী প্রকৃতির দিক থেকে বাঘের ঠিক উপযুক্ত নয়। এইজন্যেই স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রীর দেখা মিললে তার সঙ্গে বাঘিনীর তুলনা করে বিরল মিলকে বোঝান হয়ে থাকে।

সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবী বিখ্যাত। এখানকার বাঘ যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি তারা চতুর এবং হিংস্র। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কতখানি দজ্জাল হয় বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—দোজবরের মাগ, সোঁদরবনের বাঘ।

পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের অসংখ্য প্রাণীই পোষ মানে, কিন্তু কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাঘের পোষ মানা একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে: 'পোষ মানে না ঘড়েল, বাঘ-বাগদী সড়েল'।

বর্তমান অর্থকৌলীন্যের যুগে অর্থের বিনিময়ে দুর্লভ বস্তুও সহজে সংগৃহীত হতে পারে। একটি প্রবাদের মধ্যে দিয়ে এই সত্যটি প্রকাশ করে বলা হয়েছে: 'কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।' আবার, 'হিসেবে কড়ি বাঘে না খায়'। অসম্ভব যে পরিকল্পনা, তা বোঝাতে বলা হয়: 'মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ'।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সাহস করে বাঘের চোখের ওপর নিজের দৃষ্টিশক্তিকে স্থাপন করতে পারে, তাহলে বাঘের পক্ষে, ঐ দৃষ্টি স্থাপনকারী ব্যক্তিকে আর আক্রমণ করা নাকি সম্ভবপর হয় না: 'চার চোখে বাঘে খায় না।'

আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা বাকসর্বস্ব। অর্থাৎ কথায় তারা নিজেদের সর্বশক্তিমান বলে অনায়াসেই

প্রতিপন্ন করে, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় দেখা যায় তার সিকিমাত্রেরও অধিকারী নয় তারা। এদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে দু-একটি প্রবাদে 'লড়িতে জেঠী, বলিতে বাঘ'; 'মেজাজে বাঘ / মুরোদে কাগ'। অনুরূপ ইংরেজি প্রবাদটি হল : **'A lizard in fight, but a tiger in talk.'** উভয়-সঙ্কট অবস্থাকেও একটি প্রবাদে সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে : 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।'

যে ব্যক্তি যা নয়, তাকে যতই কেন সেই ভিন্নতর পরিচয়ে পরিচিত করা হোক না, যথাসময়ে তার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পাবেই। এই সম্পর্কিত প্রবাদে বলা হয়েছে : 'গাধাকে পরালে বাঘের ছাল, বাঘ থাকেনা চিরকাল।' সীমিত শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যে নাকি অপরিসীম শক্তিশালী হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তার অবস্থাটা বর্ণিত হয়েছে একটি প্রবাদে : 'কি কথাটা বললে হায়, শুনে হাসি পায়।/লেজকাটা কুকুর হয়ে বাঘ হতে চায়॥'

কানা ছেলের নাম অনেকেই পদ্মলোচন রাখে। কারণ মানুষের আশা অপরিসীম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আশা চরিতার্থ হবার সুযোগ পায় না। তবু মানুষ সহজে হার মানে না। প্রাপ্ত সামান্য বস্তু বা ব্যক্তির ওপর অসামান্য গুণের আরোপ করে বাস্তবে যা লাভ করা সম্ভব হয়নি সেই অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার কিছুটা উপশম ঘটায় কল্পনার মাধ্যমে। এইজন্যেই তো ঘেয়ো কিংবা নিতান্ত দুর্বল কুকুরের নামও বাঘা রাখতে দেখা যায়। প্রবাদের ভাষায় : 'ছাল নেই বাল নেই কুকুরের নাম বাঘা।'

বাঘের আবির্ভাব টের পাওয়া যায় শেয়াল বা ফেউয়ের মাধ্যমে। বাঘ বেরোলেই তার পেছনে শেয়াল লাগে আর ক্রমান্বয়ে চীৎকার করে বাঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। ফলে 'বেচারী' বাঘের পক্ষে শিকার ধরা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ সব প্রাণীই বাঘ সম্পর্কে খুব সতর্ক হয়ে যায় এবং আত্ম-গোপন করে। তাই ফেউ বা শেয়ালকে বাঘের শত্রু বলা হয়। বিশেষতঃ শক্তি ও সামর্থ্যের বিচারে অসম ফেউ যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে শত্রুতা করতে থাকে, তখন সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি : 'বাঘের পেছনে ফেউ।' কিংবা, 'কুকুর হল শেয়ালের শত্রু, বাঘের শত্রু ফেউ।' সচরাচর অন্যান্য প্রাণী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, দৈহিক শক্তি হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগও অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু বাঘের বৃদ্ধ বয়সেও রাগ ত কমেই না বরং বৃদ্ধি পায় : 'বাঘ বুড়া হলেও রাগ ছাড়ে না।'

দুর্বল মানুষের ওপরে সকলেই জোর খাটাতে চায়, কিন্তু সবল এবং সাহসীকে সহজে কেউ ঘাঁটাতে চেষ্টা করেনা। এই প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবাদ হলো : 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হ'ল : 'নরমের বাঘ, গরমের কুকুর।'

মাঘ মাসের শীতের তীব্রতা বোঝাতে একাধিক প্রবাদেই বাঘের প্রসঙ্গ এসেছে। বলা হয়েছে বাঘ হেন প্রাণীটিও কাবু হয়ে পড়ে মাঘ মাসের শীতের প্রকোপে : 'পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়'। অনুরূপ আর একটি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায়।' অনুরূপ আরও একটি : 'মাঘের শীতে বাঘ পালায়।

শক্তিশালী তথা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিদের অধিকাংশ সময়েই নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনায় এরা না পারে শক্তিশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতা করতে, না পারে নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে। এদেরই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে একটি প্রবাদে : 'বাঘ ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি'। শক্তিশালী ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও সেই নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি সামান্য কোন কাজ করেই নিজেকে মস্ত মনে করে বসে এবং আত্মপ্রচারে মগ্ন হয়। এদেরই সমালোচনা করে বলা হয়েছে : 'রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না রা।/ তাঁতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা' ॥

দুই প্রবল শক্তিশালী পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হলে পরিণামে অনেক খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকে। এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে—'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'-- প্রবাদটির। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হল : 'বাঘে মোষে যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'।

'কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা'। অর্থাৎ বাঘের কবলে একবার পড়লেই প্রাণান্তকর অবস্থা। অবশ্য এক্ষেত্রে যে শক্ত পাল্লায় পড়লে অনেক খেসারত দিতে হয়, অনেক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় তাই বোঝান হয়েছে। এই প্রবাদটির পিছনে বাঘের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতাও রয়েছে : বাঘের সামনের থাবাদুটিতে পাঁচটি করে নখ, পিছনের দুটিতে চারটি করে ; তাই 'বাঘে ছুঁলে সত্যিই আঠার ঘা'।

একটি প্রবাদে বাঘের সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ ঘটাকেই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে : 'বাঘের দেখা সাপের লেখা।'

অন্য একটি প্রবাদেও প্রায় একই বক্তব্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে : 'কপালে যার মৃত্যু লেখা, তার ঘরে বাঘের দেখা'।

অতএব এ হেন বাঘ যখন একবার বেকায়দায় ধরা পড়ে, তখন তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। হিংস্র, নরখাদক, রক্তলোলুপ বাঘের মৃত্যু ঘটলেও মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না বা পারে না যে তার মৃত্যু ঘটেছে। তাই মৃত বাঘকেও ক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মারতে থাকে : 'মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা'।

দজ্জাল বউকে বাঘিনী বলে অভিহিত করা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার; একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'বউ নারে বউ না, গরল ডাকিনী।/ দিন হলে মানষের ছা, রাত হলে বাঘিনী'॥ অর্থাৎ দিনের বেলায় পাঁচজনের সামনে ভালমানুষ সেজে থাকলেও উপযুক্ত অবকাশে যে নারী নিজমূর্তি ধারণ করে তার কথাই বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় কিংবা বিভিন্ন হিংস্র বন্যপ্রাণীকে কিভাবে ভয় দেখাতে হয়, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'হাতীরে আগুন, শূয়রে জাঠা।/বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাঁটা॥'

পুরুষের রাগের কথা বলতে গিয়ে একটি সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে একটি প্রবাদে। বাঘ পুকুরেতে পড়ে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়, সেই একই অবস্থা পুরুষের রাগের : 'পুরুষের রাগ, পুকুরেতে বাঘ'। সুযোগ সন্ধানী হিসাবে সাপ এবং বাঘকে সমগোত্রীয় করা রয়েছে : 'সুযোগ পেলে ছাড়ে না নাগে আর বাঘে'।

বাঘ কখনও ছোটখাট ঝোপ-জঙ্গলে থাকে না, তার আত্মগোপনের জন্যে প্রয়োজন বেশ বড় সড় রকমের গাছপালায় আচ্ছন্ন ঝোপ-ঝাড়। কিন্তু মানুষের ভাগ্য মন্দ হলে যেখানে বাঘের অবস্থান সম্ভবপর নয় কোনমতেই, সেখানেও তার দেখা মেলে। অর্থাৎ ভাগ্য মন্দ হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—এমনটি বোঝাতে বলা হয় : 'যখন যার কপাল বাঁকে, দুব্বোবনে বাঘ ঝাঁকে'। প্রসঙ্গত, যার যেখানে দুর্বলতা, সেই দুর্বলস্থানেই তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা বোঝাতে যে প্রবাদটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, সেটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবাদটি হলো : 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।'

'Cowards die many times before their death' : ভীরু ব্যক্তিকে বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়—এটির অনুরূপ বাংলা প্রবাদটি হলো : 'নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন দিন্ তার ভালয় যায়'।

যে কোন কাজ শুরু করতে গেলে মানুষকে অনেক সময়ই বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কোন কাজ একজন শুরু করলে তাকে অনুসরণ করে, তারই দৃষ্টান্ত ধরে পরবর্তীকালে অন্যদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়। প্রথম পথিকৃৎ হবার সম্মানও আছে যেমন, তেমনি আছে তার বিপদের সম্মুখীন হবারও শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা। এইজন্যেই সচরাচর মানুষ প্রথম কোন কাজ শুরু করতে অনেক ভয় পায়, অনেক ইতস্তত করে। একটি প্রবাদে এই মনস্তত্ত্বটুকুতেই একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে : 'আগে গেলে বাঘে খায়। পাছে গেলে টাকা পায়'॥

যে ব্যক্তি নিয়তই যে কাজ করে থাকে, সে কাজে সে অভ্যস্ত, তাই সেই কাজ সম্পাদন করাটাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্বাভাবিক যে ক্রিয়া বা আচরণ, তার প্রতি কেউ কোন গুরুত্ব দান করে না। বাঘ প্রায়শই গোহত্যা করে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তাই বাঘের পক্ষে গোবধ করা ব্যাপারটা তেমন কোন ঘটনাই নয়। একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশে তাই বলা হয়েছে : 'বাঘের আবার গোবধ।'

যে সমাজে উপযুক্ত গুণবান ব্যক্তির অপ্রতুলতা, সেখানে সামান্য গুণবান ব্যক্তিই আশাতীত সম্মান সুখ লাভ করে। এই বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে একটি প্রবাদে : 'আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ, কুকুর ব্রহ্মচারী।/ কত পোয়াতীর কানা ছেলে নাম বংশীধারী'॥ ভেকধারী ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই ব্যবহার হয় যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি সেটি আমাদের বহুল পরিচিত : 'তুলসীবনের বাঘ'। বাঘ মাংসাশী, কিন্তু সেই বাঘই যখন তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় মাংস পায় না তখন বাধ্য হয়ে ভক্ষণ করে ঘাস : 'ঠেকলে বাঘে ঘাস খায়'। আসলে বিপদে পড়লে মানুষকে অনেক সময় যে কাজে সে অভ্যস্ত নয়, সে কাজও করতে হয় কিংবা বলা চলে কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়। উক্ত প্রবাদে এই বক্তব্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

'প্রাকৃতিক আহ্বান' যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন মানুষ তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না, এর ফলে তখন কোন কিছুর ভয় ডর আর তাকে ধরে রাখতে পারে না : 'আগায় ধরলে বাঘের ডর নাই, মুতে ধরলে ভূতের ডর নাই।'

মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন অনেকেই মৃত্যু ভয়কেও হয়ত বা জয় করতে পারে, কিন্তু তাই বলে দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কোন ব্যক্তিরই কাম্য নয়। দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা দ্রুত মৃত্যুবরণ অধিকতর কাম্য

সঙ্গত কারণেই। এইজন্যেই বলা হয়েছে: 'বাঘ খায় খেদ নেই। কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে'।

বাঘ সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবাদের মধ্যে আরও কয়েকটি: ১. 'আউলে বাঘ জালে পড়ে'; ২. 'এক গুলিতে দুই বাঘ'; ৩. 'এক বনে দুই বাঘ'; ৪. 'কচু বনে খটাশ বাঘ'; ৫. 'ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না'; ৬. 'শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না', ৭. 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'; ৮. 'ষাঁড়ের শত্তুর বাঘে খায়'।

বাংলা প্রবাদে বাঘকে বিশেষণ রূপেও ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'বাঘ' রূপান্তরিত হয়েছে 'বাঘায়'। জাঁদরেল বা খুবই উপযুক্ত, দক্ষ এই অর্থে 'বাঘা' শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন: 'বাঘা উকিল' বা 'বাঘা ডাক্তার'; আবার 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর', অর্থাৎ যেমন রোগ তার তেমনি উপযুক্ত ঔষধ বোঝাতে বলা হয়: 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল'।

এ পর্যন্ত গেল বাংলা প্রবাদে বাঘ কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেই সম্পর্কিত আলোচনা। এইবার বাংলা ছড়ায় বাঘকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে দেখা যেতে পারে। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে ছড়াতেই বাঘ সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। বাঘ হল মূর্তিমান বিভীষিকা, বাঘ মানেই মৃত্যু। একটি ছড়ায় 'মাইনকা' নামীয় এক ব্যক্তির রাম ঠাকুরের নৌকায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বেচারীর আর রাম ঠাকুরের নৌকায় যাওয়া হয়ে উঠল না। কারণ বাঘ তাকে ধরে নিয়ে যায়:

> 'মানইকা যাবি নাকি তুই রাম ঠাকুরের নায়,
> ইলের কচু, বিলের শাক রাইন্দ্যা থুইছে ঘরে,
> এমন সময় খবর আইলো মাইনকারে নিছে বাঘে।
> ও মাইনকা আয়,
> আয় যাবিনি রাম ঠাকুরের নায়॥'

বাঘ গরু শিকার করতে পটু। বস্তুত কত গবাদি পশুই যে বাঘের আক্রমণে নিহত হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। একটি ছড়ায় বাঘের গোহত্যা এবং গো-ভক্ষণের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে:

> 'কয়ডা গাই কয়ডা বলদ?
> বারডা গাই তেরডা বলদ।
> একটা গাই নড়ে চড়ে
> বাঘা আইস্যা ঘারেতে পড়ে,

যায় বাঘা বনে
খায় আপন মনে।
খায় আর কড়মড়ায়
দুই চোখে কড়মড়ায়।'

অন্য একটি ছড়াতেও সুন্দরবনের বাঘের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সেইসঙ্গে তার নরখাদক রূপটিকেও চিত্রিত করা হয়েছে :

'ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব॥
সুন্দের বনে রে।
সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হুম্বুর করে রাও।
য়্যাক বাঘরে।
য়্যাক বাঘ চৈতা।
বাওন মার্যা নিলো পৈতা॥
য়্যাক বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি॥
য়্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর।
পুড়্যা খায় বাত্যা ইন্দুর॥
আর এক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার্যা খাইল দৈ॥
আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে'॥

এখানে একটি ছড়ার মধ্যেই বাঘ কর্তৃক একাধিক মানুষ হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। একদিকে যেমন সে ব্রাহ্মণ হত্যা করেছে, তেমনি হত্যা করেছে গোয়ালাকে এবং ধোপাকেও। তবে প্রথমোক্ত দুজনকে হত্যার যে কারণ বর্ণিত হয়েছে সে তুলনায় শেষোক্ত ধোপাকে আক্রমণ করাটা অনেক বেশি বাস্তব হয়েছে স্বীকার করতে হয়। কিংবা বলা চলে ধোপাকে আক্রমণ করার সময়েই বাঘের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নতুবা ব্রাহ্মণ হত্যা করে শুধুমাত্র তার পৈতেগাছটি আত্মসাৎ করা কিংবা গোয়ালাকে হত্যা করে দধি ভক্ষণের যে বিবরণ ছড়াটিতে প্রদত্ত হয়েছে, তাতে আসল বাঘের পরিচয়টুকু

চাপা পড়ে গেছে। সে তুলনায় ধোপাকে আক্রমণ করার পদ্ধতি এবং তার আক্রমণের কারণটুকু, যা আমরা অনুমান করে নিতে পারি, তাতে আমরা আমাদের পরিচিত বাঘের চরিত্রটিই যেন নতুন করে দেখতে পাই।

অপর একটি ছড়ায় গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গৃহকর্ত্রীকে বাঘে খাবার কথা বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য গৃহকর্তা এই সংবাদ অবগত হয়ে পত্নীহত্যাকারীকে হত্যা করতে যাত্রা করেছে। বেচারী স্বামী খুব গর্ব করে বলেছে যে সে ইতিপূর্বে একাধিক বাঘ হত্যা করেছে—একটিকে চিতোলিয়ায়, আর একটিকে কতোলিয়ায়। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতেই তার মৃত্যু বরণের কথা বলা হয়েছে :

'কুড়া বলে কুড়ুনী গো ইবার বড় বান,
উঁচা কইর‍্যা বাইন্দো টঙ্গি খুইট্যা খাইতাম ধান।
কুড়া গেছে অরণে—কুড়িরে খাইলো বাঘে,
ফাল দ্যা ফাল দ্যা যায় কুড়া ফুল দাড়কিনার আগে।
ফুলদাড়কিনায় জিজ্ঞাস করে, কই যাওরে ভাই,
রাজার ঢাল মাথায় দিয়া বাগ মারিতাম যাই।
এক বাঘ মাইরা আইছি চিতোলিয়ার পারো,
আর বাঘ মাইর‍্যা আইছি কতোলিয়ার পারো,
আর বাঘ মারতে গেলে বাঘে মাইলো কুটি।
অক্কই দফাটে গেলাম সমুঙ্গেব মাটি'।

বাঘের ভয়ে কোন মানুষই ভীত নয়, এমন কি গরুও বাঘের ভয়ে দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে বলে একটি ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে :

'দুধারে দুধা, কিরে ভাই দুধা।
দুধ কেয়া ন দেয়র ? বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে ? মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম ? চোঙরা।'

আমরা ইতিপূর্বেই এমন একটি ছড়ার উল্লেখ করেছি যেখানে বাঘ কর্তৃক ব্রাহ্মণ, গোয়ালা এবং ধোপাকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। অপর একটি ছড়ায়ও বাঘ কর্তৃক অনুরূপ হত্যার কাহিনী স্থান পেয়েছে। আপাতভাবে ছড়াটি নিছক রঙ্গমূলক মনে হতে পারে। কারণ বাঘের হত্যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক হাস্যকর কারণ দেখানো হয়েছে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষই বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অকাল মৃত্যু বরণ করে। বাঘের কাছে ব্রাহ্মণ বৈরাগী কিংবা গোয়ালা বা ছুতোরের কোন ভেদ নেই। ক্ষুধার্ত বাঘের কাছে শিকারই বড় কথা, তা সে বৃত্তিতে বা জাতিতে যাই হোক না কেন! ছড়াটিতে সেই সত্যটিই স্থান পেয়েছে :

'এক বাঘের নাম এঁতা।
বুড়ীর নিল গেঁতা॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম উগারের খুঁটি,
চাউল চাবায় মুঠি মুঠি॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম অই দহ॥
গোয়াল মারিয়া খাইল দই॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম আমলা,
বন্ধ মারে বানলা।
এক বাঘের নাম লাডুর লুডুর,
ছুতার মারিয়া আন্‌লো আঁতুর।
এক বাঘের কপালে ফোঁটা,
বৈরাগী মারিয়া আন্‌ল লোটা।
এক বাঘের নাম এঁকী,
ঘরত আন্‌ল ঢেঁকী'।

বাংলাদেশের মানুষ বাঘের উপদ্রবে বে কতখানি বিপর্যস্ত হত একসময়ে একটি ছড়ায় তারও ইঙ্গিত রয়ে গেছে। ছড়াটিতে বলা হয়েছে ঘরের ভেতর খাটের তলায় ব্যাঘ্রশাবক অবস্থান রত। শুধু অবস্থানরতই নয়, শাবকটি তার উপস্থিতি সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণাও করছে :

'ও হলদ্যা গুয়া খা,
ছিরিপুর বেড়াই যা॥
ছিরিপুরের কন্‌ খাঁটা।
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কৈঁটা॥

মাদার কেঁটা হেট করি।
আস্তন্ লক্ষ্মী বল করি॥
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক কই।
খাট বিছাই দে বস্তক গই॥
খাটর তলে বাঘর ছা।
হাড়ুম হুড়ুম করে রা'।

গ্রামবাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি জনপ্রিয় খেলা হলো 'গাছ্ছুয়া গাছ্ছুয়া খেলা'। এই খেলায় একটি গাছে কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে উঠে বসে থাকে। তলায় থাকে একজন। সে যেন বাঘ। সে জিজ্ঞাসা করে—ছেলেরা গাছের ওপর কেন। গাছের ওপর থেকে ছেলেরা জবাব দেয়—বাঘের ভয়ে। তখন গাছের তলায় অবস্থানকারী ছেলেটি একটি ছেলেকে চায়। ওপর থেকে জবাব আসে—ছুঁতে পারলে পাবে। এরপর তলার ছেলেটি গাছে উঠে যাকে ছোঁয়, সেই হয় বাঘ। তাকে তখন গাছের তলায় গিয়ে অবস্থান করতে হয়। যদিও এটি একটি খেলা, তবু খেলাটির মধ্য দিয়ে বাঘের মানুষের প্রতি লোভের কথা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে ব্যাঘ্রভীতি আমাদের চেতনাকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায়, নতুবা ব্যাঘ্রভীতিকে অবলম্বন করে এমন খেলার সৃষ্টি হতে পারত না। এইবার 'গাছ্ছুয়া গাছ্ছুয়া খেলা'র ছড়াটি কি রকম দেখা যাক : 'গাছ্ছুয়া রে গাছ্ছুয়া,/গাছ ক্যারে ?/বাঘের ডরে।/বাঘ কই ?/মাটির তলে।/মাটি কই ?/এই ত।/তোর কয় ভাই ?/সাত ভাই।/এক ভাই দিবে ? / ছুঁইতে পারলে নিবে।'

বাংলা ছড়ায় কেবল বাঘের বীভৎসতাই স্থান পায়নি, সেই সঙ্গে বাঘকে হত্যা করার কথাও বলা হয়েছে একাধিক ছড়াতেই। হয়ত সেই হত্যা করার কথা তেমন গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয় নি, কিছুটা লঘুতাই রয়ে গেছে বক্তব্যের মধ্যে। তবুও বাঘের প্রতি বিরূপ মানসিকতার সন্ধান পেতে কষ্ট হয় না এই ছড়াগুলি থেকে। যেমন একটি ছড়ায় শিশুকে লাল লাঠি কিনে দিয়ে বাঘ মারতে পাঠাবার কথা বলা হয়েছে এবং শিশুর ভয়ে সন্ত্রস্ত বাঘের পালিয়ে আত্মরক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে :

'অলই-অলই-অলই,
কোল মাতারীর ছাও।

লাল লাঠি কিন্‌ন্যা দেবো
বাঘ মারিতে যাও ॥
বাঘ গেল পলাইয়া।
খোকন আইল খেলাইয়া' ॥

আর একটি ছড়াতেও শিশুর বাঘ মারতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ব্যাঘ্র হত্যায় গমনোদ্যত সন্তানের প্রতি জননীর ও মাসীর সহাস্য আচরণটুকু লক্ষণীয় :

'আমার যাদু বীরের বেটা বন-ভালুকের ছাও।
ঢাল-তলওয়ার লইয়া বাছা বাঘ মারিতে যাও ॥
কিসের ডর, কিসের ভয়, কিসের আতাপাতা।
বাঘ মারিয়া আইলে মাথায় ধরবাম সোনা ছাতা ॥
ছাওয়াল যায় রে বাঘ মারিতে ঢাল তলওয়ার লইয়া।
মা মাসি চাইয়া হাসে মুখে কাপড় দিয়া' ॥

উপরোক্ত ছড়া দুটিতে বাঘ মারতে যাবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাঘকে যে হত্যা করা হয়েছে এমন কথা বলা হয়নি। এইবার যে ছড়াটি উদ্ধার করা হলো সেটিতে বাঘকে হত্যা করার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে বাঘটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে কে মেরেছে সেই নিয়ে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে। তাছাড়া বাঘটিকে মারতে দীর্ঘ দুটি মাস সময় লাগার কথাও বলা হয়েছে। যে সে প্রাণী নয়, বাঘ বলে কথা, অতএব এহেন প্রাণীটিকে মারার জন্যে কিছু বেশি সময়ের প্রয়োজন বৈ কি!

'ঢুপী গো ঢুপী,
ধান লাড়ছ্‌স্‌ কই।
চাইলতা গাছের তলে।
সাপে লেজুর লাড়ে।
বাঘে ডুক্কার মারে।
সেই বাঘ মারে,
রাধানাথের পুতে।
রাধানাথের পুত নারে রাধানাথের নাতি।
সেই বাঘ মারতে লাগে আশ্বিন আর কাতি' ॥

একটি তান্ত্রিক ছড়াতে শুধু বাঘ হত্যার কথাই বলা হয় নি, সেই সঙ্গে বাঘ

হত্যা করে তাকে খাওয়ার কথাও বলা হয়েছে; এমন কি বাঘের তেল দিয়ে আলো জ্বালাবার কথাও ঘোষিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এইরূপ বক্তব্য থেকে বাঘের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিহিংসা পরায়ণতার সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়:

'হাগ্‌তে বাঘ মারর‍্যা খাই,
বাঘের তেল দিয়া পরঙ্গি জ্বালাই।
দুশ্‌মন পায়ের তলে ফালাই'।

ঐন্দ্রজালিক ছড়াতেও বাঘের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে। ব্যাঘ্রের আক্রমণে আহত ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য এই ছড়া বলা হয়ে থাকে। কিছু উদ্ভট বক্তব্য ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় অভিব্যক্ত হলেও, মূলতঃ বাঘের প্রতি বিরূপ মানসিকতার প্রতিফলন এই ছড়ায় সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়:

'এই, আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন বন্ধন বাঘের পা—
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই, আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন বন্ধন বাঘের চোখ
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগরে বাঘার দাঁত কপাটি।
ছাড়ি কুমড়ো বেড়াল পোড়া,
ভাঙরে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদিরে বাঘ নড়িস্ চড়িস,
খ্যাকশেয়ালীর দিব্যি তোকে'।

বাংলা ছড়ায় একদিকে যেমন বাঘের হিংস্রতা, রক্তলোলুপতা স্থান পেয়েছে, তেমনি এ হেন হিংস্র মাংসাশী প্রাণীটিকে হত্যা করার অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু ছড়ায়। হত্যা ব্যতিরেকে স্তুতির মাধ্যমেও এই প্রাণীটিকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে অল্পবয়সী ছেলের দল বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা চায় এবং ভিক্ষালব্ধ উপকরণে বাঘের পূজার্চনা এবং শিরনীর আয়োজন করে। ভিক্ষা চাইবার সময় তারা একধরণের ছড়া বলে। এই ছড়া 'বাঘাই শিরনীর ছড়া' নামে পরিচিত। 'বাঘাই শিরনীর ছড়া' আকৃতিতে অন্যান্য ছড়ার তুলনায় বেশ দীর্ঘ। একটি 'বাঘাই শিরনীর ছড়া'র অংশ-বিশেষ মাত্র উদ্ধার করা গেল:

'আমরা ত মাগিয়া খাই।
বাঘাইর নামে শিন্নি চাই ॥
অই, দই, দই।
গোয়াল মারৃইয়া খাইলাম দই ॥
আইজ উতি বাঘুনীর রাও গেল্ ॥
তেলী মারৃইয়া খাইলাম তেল ॥
বাঘুনীর হাতে বাঁচ্‌ল ছাগল।
ছাগল দেখ্‌খ্যা লক্ষ্মীন্দর পাগল ॥
লক্ষ্মীন্দর কি কাজ করিলে।
মাঘ মাইস্যা শীতের মধ্যে বাঘাই মাসাইলে ॥
মাঘ মাইস্যা শীত নারে হাঁড়ি ভরা ঘি।
শিন্নিখানি দেউ হাইন গো মা গিরস্থো ঝি' ॥

উদ্ধৃত অংশটুকু থেকেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, বাঘের মত শক্তিশালী প্রাণীটির সঙ্গে শারীরিক শক্তির বিচারে অনেকাংশে অক্ষম ও দুর্বল মানুষ মোকাবিলা করার জন্যে, তথা তার আক্রমণ থেকে নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্যে শেষঃ পর্যন্ত বাঘেরই শরণাপন্ন হয়ে বাঘের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

বাংলা লোকসঙ্গীতে বাঘকে নিমিত্ত হিসাবেই মূলত উপস্থাপিত করতে দেখা গেছে। সেখানে নারী হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব-ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই ভাব-ভাবনার অনুষঙ্গে বাঘ এসেছে। জলপাইগুড়ির একটি 'গম্ভীরা গানে বিবাহিতা স্ত্রী তার তুলনায় অল্পবয়সী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করেছে। মৃত্যুকামনা করেছে সে তার মা, বাবা এমন কি পাড়ার লোকেরও; অর্থলোভে মা-বাবা না হয় তাকে নাবালক ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে, কিন্তু পাড়ার লোক, তারা তো এই বিবাহে বাধাদান করতে পারত। কিন্তু তারাও তো কোন বাধা দেয় নি। তাই মৃত্যুকামনা থেকে পাড়ার লোকেরাও রেহাই পাইনি :

'ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়া পাথারে ॥
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক
না-বালক ভাতারে ॥
বাপ মরুক মাও মরুক রে
মরুক পাড়ার লোক,

কাড়োয়া মরাক বাঘে খাউক,
নিধুয়া পাথারে ॥'

একটি 'মেঠোগানে' এক বধূ তার স্বামীকে বাঘে যেন খায়, সেজন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে। কারণ বধূটি তার ছোট দেওরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু স্বামী জীবিত থাকায় তার পক্ষে ছোট দেওরের সঙ্গে বাঞ্ছিত মিলন সম্ভব হয় না, তাই :

'ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা
প্রাণে সহে না [রে ছোট দেওরা]
ভাতার গেল ধান ছাইতে
বাঘে ধইরা খাউক
[মোর] সোনার দেওরা বাঁইচা থাউক ॥
দেওরা মোরে করল পাগল
প্রাণে সহে না [রে]
ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা প্রাণে সহে না ॥'

কিন্তু এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায়—একটি 'গাড়িয়াল গীতি'তে। সেখানে প্রেমিকা তার প্রেমিক গাড়িয়াল ভাইয়ের সান্নিধ্যসুখ লাভ করার জন্যে তাকে বাঘের ভয় দেখিয়েছে যাতে সে উজানে না যায় :

'ওরে গাড়িয়াল ভাই—
উজান উজান করে গাড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয়।
গাড়ি ধরিয়া গাড়িয়াল
বাড়ি ফির্যা যায়'।

অবৈধ প্রেমে আসক্ত হয়ে 'মেঠোগান'টিতে যেখানে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে তার স্বামী যেন বাঘের দ্বারা মৃত্যু-কবলিত হয়; সেখানে অপর একটি গানে এক স্ত্রী তার পতির প্রাণ রক্ষার জন্যে বাঘের কাছে সকাতর প্রার্থনা জানিয়েছে। এমনকি বাঘ যদি তার পতিকে পরিহার করতে সম্মত না হয়, তাহলে প্রথমে তাকে ভক্ষণ করে তারপর স্বামীকে ভক্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে :

'খেও না খেও না বাঘ রে
অ বাঘ খেও না মোর পতিরে
বনের বাঘ—বাঘ রে।

হাতে ধরি পায়ে ধরি রে
অ বাঘ ছেড়ে দাও মোর পতিরে
বনের বাঘ, বাঘ রে ॥
আমার পতি খাইলে বাঘ রে
অ বাঘরে ঠেক্‌বে খোদার কাছে
বনের বাঘ, বাঘ রে ॥
আগে খেও মোরে বাঘরে
অ বাঘরে পিছে খাও মোর পতিরে
বনের বাঘ, বাঘ রে ॥'

গানটি 'রূপগণকন্যা' শীর্ষক লোকনাটিকার অন্তর্ভুক্ত। গানটির মধ্য দিয়ে পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর আন্তরিক পরিচয়টুকু প্রকাশিত হয়েছে।

বাঘের করুণার জন্যে যেখানে মানুষকে প্রার্থনা জানাতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বাঘের মত শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রাণীটির বন্দীদশার কথা প্রায় ভাবাই যায় না। কারণ বন্দীদশায় বাঘই মানুষের করুণার পাত্র হতে বাধ্য হয়। তখন তার বড় অসহায় অবস্থা! কলকাতার চিড়িয়াখানায় উপস্থিত হতে পারলে সেই বিরল দৃশ্য অবলোকনের সুযোগ পাওয়া যায়। একটি 'টুসুগানে' কলকাতার চিড়িয়াখানায় বন্দী বাঘের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে :

'ওপর পাটা, নামো পাটা, তার ভিতরে দারগা
ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুসু যাবে কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলে তুসু কি কি দেখে এলে গো ?
তুসু বলে দেখে এলাম—সোনার খাঁচায় বাঘ বসে !'

অপর একটি টুসুগানেও বাঘের উল্লেখ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাঘের হিংস্রতার কোন পরিচয় লক্ষ্য করা যায় না, বাঘকে নিতান্তই রোমান্টিক চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে :

'বাঁকুড়াতে দেখে এলম সোনার পিড়ায় বাঘ বসে
সে বাঘে কি মানুষ খায় না, বাঘ বসে রঙ দেখে।'

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় লোকসঙ্গীত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : **'Symbolic method is found everywhere in Indian folk-poetry'**। মন্তব্যটি বাংলা লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য তারই প্রমাণ স্বরূপ আমরা মুর্শিদাবাদের পাঁচালী গানের উল্লেখ করতে পারি।

একটি পাঁচালী গানে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত অথচ অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই ভাবে :

'যত সব বাঘ হোড়ল তার সব হোল ভম্বল
যত সব হাতী ঘোড়া তারা খেলে কচু পোড়া
দেখছি আবার কুঁচে কেঁকড়া চেয়ার পেলে অবহেলে'।

আর একটি পাঁচালী গানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চরম বিপর্যয়কর রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে ছাগলের পালে বাঘ পড়ার উপমা দেওয়া হয়েছে :

'আজ ভারতে চলছে লটাপটি দলে দলে চলছে কাটাকাটি
এখন হয়েছে বেশ আটাআটি, যেন ছাগলের পালে বাঘ পড়েছে ভাই'।

সত্যপীরের পাঁচালীতেও বাঘ উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে জনৈক একদিলের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাঘ্রের সমভিব্যবহারে যাত্রার কথা :

'নামা দিয়া গোর বাহারে যায় নানান রঙ্গিয়া।
একদিল চলিয়া যায় সোলেমান গুদুরী গায়,
লোকে বলে বাওলা ফকির ॥
একদিল চলিয়া যায়, তাল গাছও দেখিতে পায়,
আলা বনে হাতে তোলে লয় ॥
একদিল চলিল পথে, ছকুড়ি ছয় বাঘ সাথে,
বাঘের ভয়ে ভাঙ্গিল নগর' ॥

একাধিক সঙের গানেও বাঘের কথা বলা হয়েছে। তবে বাঘের প্রসঙ্গ বর্ণিত হলেও আমাদের পরিচিত বাঘ সেখানে অনুপস্থিত। অর্থাৎ সে বাঘ যেন মানুষের অত্যন্ত বাধ্য, হিংস্রতামুক্ত অনেকটা গৃহপালিত পশুর অনুরূপ।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, রক্তলোলুপ নরখাদক, চতুর এবং হিংস্র বাঘ বাংলা উপকথায় নিতান্ত নির্বোধ এবং হাস্যাস্পদ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দৈহিক শক্তিতে যে বাঘের মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম হয়েছে, সেই বাঘকে উপকথায় দুর্বল এবং পরাজিত এক পশুতে পরিণত করে মানুষ তার অক্ষমতাকে পূরণ করে নিয়েছে। 'বেঁড়ে বাঘ' গল্পে দেখান হয়েছে একটি লেজকাটা শিয়ালের চালাকির কাছে কি ভাবে একটি বেঁড়ে বাঘ বোকা বনেছে। 'নিরেট বোকা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে একটি শৃগাল ছাগল-ছানা খেতে গিয়ে রাখালদের হাতে ধরা পড়লে রাখালেরা তাকে বেঁধে রেখে যায়।

ইতিমধ্যে সেখানে একটি বাঘ এসে হাজির হলে শিয়ালটি জানায় সে বিয়ে করার জন্যে অপেক্ষারত। কিন্তু বিয়ে করতে সে মোটেই ইচ্ছুক নয়। বাঘ চাইল নিজে বিয়ে করতে। অতএব সে শেয়ালের বাঁধন খুলে নিজে সেই বন্ধনকে স্বীকার করে নিলে। পরে রাখালদের কাছে বেদম প্রহার জুটল তার। বাঁধন ছিঁড়ে কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল সে। 'মামা-ভাগ্নে' গল্পেও বর্ণিত হয়েছে বেকুব বাঘ কিভাবে শেয়ালের ছলনায় অকালমৃত্যু বরণ করেছে। একবার এক শৃগাল বাঘকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে কিছুই খেতে দিলে না। বাঘও শৃগালটিকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে মোটা হাড় খেতে দিয়ে তার প্রতিশোধ নিলে। শৃগাল ঠিক করলে এর প্রতিশোধ নেবে সে। ঐ শৃগালটি এক আখের ক্ষেতে গিয়ে চুরি করে আখ খেত বলে চাষীরা তাকে ধরার জন্যে একটা খোঁয়াড় তৈরী করে। শৃগাল বাঘকে বললে সে রাজার ছেলের বিবাহে গান গান গাইতে যাবে। বাঘকে বাজাতে যাবার জন্যে সে আহ্বান জানালে। সে আরও বললে যে রাজা তাদের যাবার জন্যে পাল্কী পাঠিয়েছেন। শৃগালের কথায় বিশ্বাস করে বাঘ পাল্কী মনে করে চাষীদের রাখা খোঁয়াড়ে ঢুকতেই বন্দী হয়ে গেল। তারপর চাষীদের হাতে বেদম প্রহার খেয়ে তার মৃত্যু হল। 'বাঘের মামা' গল্পটিতেও দেখা যায় সামান্য ছাগল-ছানার চালাকির কাছে বাঘ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। বাঘের বোকামি-বিষয়ক আরও অনেক গল্পের মধ্যে 'ক্ষুধার ভান', 'খাঁচার বাঘ', 'ইঁড়ি-মিড়ি-কিড়ি', 'বাঘের সাধ', ইত্যাদি অন্যতম। বাংলা উপকথায় যে দুটি পশু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাদের একটি হলো শৃগাল, আর অপরটি বাঘ। বাংলার উপকথায় চিত্রিত বাঘের নির্বোধ চরিত্র সৃষ্টির মূলে মালয়-ব্রহ্ম দেশের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন।



বাংলার লোকশিল্প ও বাঘ

শ্রীআশীষকুমার চক্রবর্তী

শিল্পকলা মানব-মনের অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-মাধ্যম। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী শিল্পী হচ্ছেন পুরোহিত এবং শিল্প তাঁর ধর্ম। লোকশিল্প সমাজ জীবনের মূর্ত প্রতীক, যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কিছুরই প্রতিফলন ঘটে। গ্রামীণ জীবনের সমষ্টিগত ভাবধারার বিচ্ছুরণ সম্ভব হয় লোকশিল্পকলার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে। সাধারণ ভাবে লোকশিল্প বলতে সেই শ্রেণীর শিল্পকেই বোঝায় যে, যে শিল্পকলা সমাজের গ্রামীণ জনগণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয়-মাঙ্গলিক-লোকাচারীয়-অনুষ্ঠান-উৎসব-মেলাকে কেন্দ্র করে একে অপরের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরন্তু, লোক-শিল্প বলতে সেই শিল্পকেই বোঝায় যা সৃষ্টি করতে গেলে প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রকারদের রচিত শিল্প-ব্যাকরণের অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না, শিল্পীর মনের স্বতঃস্ফূর্ততায় সহজলভ্য উপকরণের দ্বারা সরল ও সাবলীল ছন্দেই যার প্রকাশ ঘটে থাকে।

লোকশিল্প নিদর্শনে কখনই শাস্ত্রীয় শিল্পের ন্যায় নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় না। লোকশিল্পে শিল্পী স্বীয় ধ্যান-মনন কল্পনায়-অনুকরণে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিল্প নিদর্শন সৃষ্টি করে থাকেন। লোকশিল্পীর কাছে বিষয়বস্তুর প্রকাশ-মূল্যই বেশী ; নিখুঁত প্রয়োগ অর্থাৎ সুকুমার শিল্পের ন্যায় কোনরূপ শিল্পসৃষ্টির কল্পনা অনুপস্থিত থেকে যায়। লোকশিল্পকলা তাই স্বীয় মহিমায় মাধুর্যপূর্ণ এবং ধ্রুপদী শিল্পের ন্যায় নন্দনতত্ত্বের বিচারে জনমনে সমাদৃত হয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ লোকশিল্পের পশ্চাৎভাগে থেকে লোকশিল্পীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত-প্রভাবিত করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের সংগে লোকশিল্পের সম্পর্ক যেমন গাছের সঙ্গে মাটির, যেমন প্রাণের সাথে আলোর তেমনি লোকশিল্পের প্রধানতম উৎসব হল গ্রামীণ উৎসব ও তাকে কেন্দ্র করে মেলামেশা-আদান-প্রদান। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু ধর্মীয় আচার আছে এবং এই আচার পালনে লোকশিল্পের স্থান অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্র ধর্মাচার পালন ও উৎসবাদি লোকশিল্পকে যুগে যুগে পুষ্টি-বৃদ্ধি ও মণ্ডন করেছে। লোকশিল্পের উপাদান সম্পূর্ণ দেশীয় ও আঞ্চলিক।

লোকশিল্প প্রকৃতপক্ষে লোক-নির্ভর। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একটা বিশিষ্ট ধারার লোকনির্ভর শিল্প অনেকটা একই চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। লোক-কাহিনী-কেন্দ্রিক যে শিল্প সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে রূপ গ্রহণ করেছিল তাতে ঘরের এবং পারিপার্শ্বিকের নানা পরিচিত সাধারণ জিনিষ বহুবিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই দেখা যায় এই শিল্পে মানুষ পশু-পক্ষীর প্রতিরূপের যেমন প্রাচুর্য, বৃক্ষ-লতার তেমনই অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা। অলংকরণের জন্যে রেখাবহুল জ্যামিতিক নক্সার ব্যাপক ব্যবহার ;—জীবনের অভিপ্রকাশের নানান বৈশিষ্ট্যের প্রতি শিল্পীর গভীর সহানুভূতি, কৌতূহল ও আগ্রহ। এই কৌতূহল ও সহানুভূতি শিল্পীকে মানুষ ও পশুর জীবনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ-জীবন ও বিচরণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছিল।

যুগের পর যুগ ধরে লোকশিল্পীরা পরিচিত পশু-পাখী নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ যে লোকশিল্প সম্ভার সৃষ্টি করে গেছেন ; তা আজও কালজয়ী স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। এদের মধ্যে বাঘের একটি প্রধান ভূমিকা আছে, বিশেষ করে বাংলার অরণ্য-অঞ্চলে। বাঘ জন্তুজগতে এক ভয়ংকর শক্তিধর প্রাণীবিশেষ। লোকশিল্পীরা আবহমান কাল ধরে স্বীয় শিল্পকলার প্রকাশ মাধ্যমে সুন্দর ও শক্তির বর্ণনা করে এসেছেন। তাই লোকশিল্পীর কাছে বাঘের মূর্তি তৈরী বা চিত্রাংকন সুন্দর ও শক্তি এই উভয় বিষয়েরই প্রতীক মাত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাঘ শক্তির প্রতীক হলেও, উচ্চসমাজের দেব-দেবীর সংগে বিশেষ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাহন হিসেবে স্থান পায় নি। অথচ দেখা গেছে যে, সভ্যতার উষাকাল থেকে মানুষ শক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবীর সংগে সিংহকেই প্রবলতর শক্তির প্রতীক হিসেবে বাহনের মর্যাদা দিয়ে এসেছে। সিংহবিরল ও বাঘবহুল দেশে এটা আশ্চর্যকর ব্যাপার নয় কি? দু-চারটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অন্ধ্রে ও মহারাষ্ট্রে নওরাত উপলক্ষে অম্বাদেবীর যে মূর্তিপূজা হয়, তিনি ব্যাঘ্রবাহিনী। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে 'জ্যেষ্ঠা দেবীর বাহন সিংহের রথ চালনের পশ্চাতে বাঘের সহাবস্থান এবং পশ্চাদ্ধাবন' মূর্তি শিল্পীর হাতে তৈরী হয়েছে। কলকাতায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গভীর অরণ্য অধ্যুষিত দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার পাশ্ববর্তী অঞ্চল বর্তমানের চিৎপুরে লৌকিক কিংবদন্তীর 'চিতু ডাকাত' ওরফে চিত্রেশ্বর রায়ের আরাধ্যাদেবী দুর্গার বাহন সিংহের পশ্চাৎভাগে বাঘের মূর্তি পূজিত হতো। এছাড়া, সমাজের উচ্চশ্রেণীর

উপাস্থ দেব-দেবীর সংগে বাঘের মূর্তি আর বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। বরং বাঘের মূর্তিপূজা এবং লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনে বাঘের চিত্রাংকন গ্রামীণ জনসমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষজনের মধ্যেই অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

গ্রাম বাংলার পুরনারীরা স্বীয় আত্মীয়-পরিজনের তথা গ্রামের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ব্রত পালন করে থাকেন। ব্রতকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় পিটুলীগোলায় চিত্রিত ব্রতকেন্দ্রিক আলপনা যা বাংলার নারীমানসের অন্তর্লোকের চিত্রিত বহিঃপ্রকাশ। বারোমাসের ব্রতের মধ্যে ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত ভাদুলী ব্রতের যে আলপনা চিত্রিত হয় কেবলমাত্র তাতেই বাঘের চিত্র থাকে। কারণ, বন্যজন্তু বা শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যপথে অথবা নদীতে বাণিজ্যের কারণে ভ্রমণরত স্বীয় আত্মীয়জনের যাতে ক্ষতি না হয় তাই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বাঘের নিকটেও ব্রতিনী প্রার্থনা জানান :

'বনের বাঘ বনের মোষ !
তোমরা নিওনা আমার বাপ ভাইয়ের দোষ।'

তারপর আলপনার বাঘের চিত্রে জল ও ফুল উৎসর্গ করেন।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্ত অরণ্য-অধ্যুষিত হওয়ায় বাঘের চারণভূমি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। অথচ বঙ্গদেশের এই অঞ্চলেই সৃষ্ট হয়েছে বাংলার-নারী-মানসের অসাধারণ শৈল্পিক নিদর্শন 'নকৃশি কাঁথা'। 'তৃণ হইতে বস্তু হয় রাখিলে যতনে'—এই মানসিকতায় গড়ে ওঠা বাংলার গ্রামীণ লৌকিক নারী মানস অবহেলিত, ব্যবহৃত পুরানো ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতো ও কাপড়-খণ্ড দিয়ে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত 'নকৃশি কাঁথার' সৃষ্টি করে গেছেন সুদূর অতীত কাল থেকে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার প্রবণতায় অসীম ধৈর্যে ও মমতায় সৃষ্টি হয় এই নক্‌শি কাঁথা। সুচের ফোঁড়ে দীর্ঘ সময়ের অবকাশে কাপড় খণ্ডের শুভ্র জমিতে নারীর চেতন-অবচেতন মনের প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব-বৈচিত্র্যপূর্ণ সব নক্‌শার, যার মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য গৃহপালিত জীব-জন্তুদের সঙ্গে বাঘও একসময় স্থান পেয়ে গেছে। বাঘের হাতে বনে জঙ্গলে কাঠুরিয়া, মধু সংগ্রহকারী বা সাধারণ মানুষদের মৃত্যুর করুণ দৃশ্যকে চিত্রায়িত করেছেন কাঁথায় তাঁরা, আবার কখনো শিকারীর হাতে বাঘের নিধন-পর্ব ছুঁচ-সুতার সুষ্ঠু পরিকল্পনায় নকৃশা-খচিত হয়েছে নকৃশি কাঁথায়। তাছাড়া কাঁথার পাড়ের

নকশায় হাতী, মোষ, উটের সারি সারি মিছিলের সংগে সংগে বাঘের সারিও রচনা করা হয়েছে এবং এই শ্রেণীর নকশাতেই বাঘের গতিশীলতা মাধুর্য লাভ করেছে। এছাড়া, নকশি কাঁথায় দেব-দেবীর চিত্রাংকনের বাহুল্যের সংগে বাঘকেও একসূত্রে গ্রথিত করে ফেলেছেন তাঁরা। মনে হয় বাঘ বাংলার নারী সমাজে তার ভয়ংকরতাকে পাশ কাটিয়ে শক্তির প্রতীক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিল বলেই নারীর প্রিয় হতে পেরেছিল, কারণ নারী বীরের প্রতিই তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন।

দারুতক্ষণ শিল্প বা কাঠের কাজ বাংলার লোকশিল্পকলার এক অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন। দারুতক্ষণ শিল্পেও কিন্তু বাঘ উপেক্ষিত নয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাবেই লোকশিল্পী তাঁর দারুতক্ষণ শিল্পে অন্যান্য নিদর্শনের ন্যায় বাঘকে স্থান দিয়েছেন। এই শিল্পে কখনও দেখা যায় গৃহের খিলান-সংযুক্ত দারুখণ্ডে হাতীর শুঁড়ের উপর বাঘ ও মানুষের মাথা; খিলানের অংশে দেখা যায় খোদিত হয়েছে একটি চিত্রার্ধঃ হাতে সুদৃশ্য ঢাল-তরবারি-সহ এক যোদ্ধা বাঘ হত্যায় উদ্যত; কড়ি-বরগা-সংযুক্ত অংশে ফুল-লতাপাতা, বাঘ ও মকর মাছ [গঙ্গার বাহন] প্রভৃতির অপূর্ব সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে শিল্পীর নিজস্ব মানসিকতায় এবং যা চমৎকার শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে আসছে। আবার অনেক সময় কার্নিশের অংশে শিল্পীর হাতে বাঘ ও সিংহের আকৃতির সমন্বয়ে খোদিত হয়েছে 'শার্দুল-সিংহ' মূর্তি। এছাড়া, শিল্পীরা সামাজিক চাহিদায় শিশুমনের খোরাক জুগিয়েছেন ছোট ছোট বাঘ তৈরী করে,—খেলনা বা পুতুলের প্রয়োজনে।

শিশুদের মনভোলানোর প্রয়োজনে লোকশিল্পীরা আবহমান কাল ধরে খেলনা পুতুল তৈরী করে আসছেন বিভিন্ন শিল্প উপকরণের মাধ্যমে। দারু মাধ্যমও তার ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে না। দারু-মাধ্যমে শিল্পীর হাতে তৈরী হয়েছে অপূর্ব রেখাবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল-রং-এর বাঘ। শুধুমাত্র দারু নয়, মাটি, পোড়া মাটি, শোলা, বাঁশের গোড়া দিয়ে লোকশিল্পীরা তৈরী করেছেন বাঘ। উজ্জ্বল রং এবং গাঢ় রেখাবল্লরী ও সুঠাম ছন্দে তৈরী খেলনার বস্তু হিসেবে তৈরী বাঘের অবয়ব-আকৃতি শিশুমন সহ প্রবীণদেরও সত্যিকারের বনের বাঘের সংগে তুলনা করতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। এখানেই লোক-নির্ভর লোকশিল্পীর সার্থকতা। শিশুমনের খেলনা ও প্রবীণদের গৃহসজ্জায় মাটি এবং পোড়ামাটির তৈরী বাঘের মুখোশের সর্বাংগীণ চাহিদার ব্যাপকতা আজও

সর্বজন-স্বীকৃত। দারুশিল্প ছাড়া বাঘের মুণ্ডের নিদর্শন পাওয়া যায় বাঁশের গোড়া দিয়ে তৈরী আঁকাবাঁকা আকৃতির যাদুলাঠিতে। গুণিন বা যাদুকর ডাকিনী, ভূত-পেত্নী-ইত্যাদি তাড়ানোর জন্য আধিভৌতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ঝাড়-ফুঁকে এই লাঠি ব্যবহার করে থাকেন। বাঘের মুণ্ড এখানে যাদুশক্তির প্রতীক, যাকে নিশ্চয়ই ডাকিনীরা ভয় করবে!

কালীঘাটের পট উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন সংযোজন। কালীঘাট পটশৈলী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, বাংলার এক বিশেষ শ্রেণীর লোকশিল্পকলা। কালীঘাট মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোক-শিল্পী পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায় চীনে কাগজ কিংবা পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজের কলে প্রস্তুত ছোট-মাঝারি আকৃতির চৌকো বা আয়তক্ষেত্রের অনুরূপ কাগজের উপর যে বিশেষ রীতিতে চিত্রাংকন করতেন, তা-ই 'কালীঘাট পট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানেও শিল্পীর তুলিতে বাঘের অবয়ব ধরা পড়েছে। কলকাতার সন্নিকটেই সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের বিখ্যাত 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর আকৃতি শিল্পীকে উৎসাহিত করেছে তাকে তাঁর শিল্পে চিত্রায়িত করতে। পরবর্তী সময়ে শিল্পীর চোখে দেখা চিড়িয়াখানার বাঘ এবং সার্কাসের বাঘও তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে,—বাঘের নিখুঁত ও প্রকৃত অবয়ব বা সার্কাসের ক্রীড়াভঙ্গীর চিত্রকল্প রচনায়। তবে, বাঘ-শিকার শৌর্যের প্রতীক বলেই শিল্পীও শিকারীর হাতে বাঘের করুণতম মৃত্যুদৃশ্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

জড়ানো বা দীঘল পট বাংলার অন্যতম বিশেষ এক লোকশিল্প-নিদর্শন। দীর্ঘ আকারের এই লোকচিত্রে একটি কাহিনীকে ফুল-লতাপাতার রেখায় বিভাজিত খোপে খোপে সমায়তনে উপস্থাপিত করে ধরে রাখা হয়। পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের তৈরী এই শ্রেণীর লোকচিত্রকে পটচিত্র বলে। আকারে দীর্ঘ ও জড়িয়ে জড়িয়ে গুটিয়ে রাখা হয় বলে এর প্রচলিত নাম জড়ানো-পট। বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে তৈরী জড়ানো পটের মধ্যে সাঁওতাল পটে বাঘ শিকারের দৃশ্য অংকিত হয়েছে। এছাড়া, বাঁকুড়ার বৈষ্ণব পটে শোভাযাত্রাকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাঘের পিঠে আরোহণকারী গাজীসাহেবকেও চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে শিল্পী তাঁর চিত্রের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এবং ইসলাম ধর্মের অবনতি ঘটছে। মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলার জড়ানো পটচিত্রের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই

বাঘ সাঁওতাল-পটের ন্যায় শিকার-আখ্যানেই চিত্রায়িত। শুধুমাত্র বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের কুমিল্লা-খুলনা-যশোহর ইত্যাদি জেলায় এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলাতেই জড়ানো পটে বাঘকে ধর্মীয় মর্যাদায় মণ্ডিত করে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এই সব স্থানে বাঘকে ইসলামধর্ম প্রচারক গাজীর বাহন ও সুন্দর বনাঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবী বনবিবির একান্ত অনুগত বাহন রূপেই পটচিত্রে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। গাজীসাহেব ও বনবিবির মহিমা প্রচারের সংগে সংগে বাঘেরও মহিমা প্রচারিত হয়। জনমনে বিশ্বাস আছে যে, গাজীর কাছে ও বনবিবির নামে মানসিক ও সিন্নি মানত করলে বনাঞ্চলে ব্যবসা ও বসবাসকালে বাঘের হাতে মৃত্যু ঘটবে না। অতএব, পটুয়া শিল্পী এই কাহিনী-কেন্দ্রিক পটচিত্র তৈরী করে জনমানসে তা পটের গান সহযোগে প্রচার করে উক্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করে থাকেন। বীরভূম জেলায় একশ্রেণীর চৌকো পটচিত্র তৈরী হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় তৈরী ক্যানভাসের দ্বারা এই চৌকো পট তৈরী হয়। তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, নলহাটেশ্বরী প্রভৃতি মন্দিরে এই চৌকো পট চিত্রগুলি পটুয়ারা বিক্রী করে থাকেন। এই সমস্ত চৌকো পটেও বাঘ, বাঘের খেলা, বাঘ শিকার ইত্যাদি দৃশ্যরচনা করা হয়ে থাকে।

বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত আছে। লৌকিক কিংবদন্তী অনুসারে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড পূজা হয়, কারণ লৌকিক বিশ্বাস দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা এবং দক্ষিণরায়ের পূজা না করলে বনাঞ্চলে কাষ্ঠ-আহরণ, মধুসংগ্রহ, মৎস্য শিকার ইত্যাদি জীবিকায় সাফল্য লাভ হবে না। অতএব, কুম্ভকার শিল্পীর হাতে প্রতি বৎসর তৈরী হয়ে থাকেন বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। এছাড়া, উক্ত এলাকায় দক্ষিণরায়ের চিরস্থায়ী পূজার থানও সযত্নে রক্ষিত আছে।

সব শেষে : বাঘ লোকশিল্পে উপেক্ষিত নয়, তার কারণ এই শিল্প লোক-জীবন-নির্ভর। ফলে, উচ্চশ্রেণীর জনগণের দৃষ্টিতে ঘৃণিত বাঘ নিম্নশ্রেণীর জনমনের ইচ্ছায় লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে যুগ যুগ ধরে চিত্রিত-খোদিত হয়ে আপন শক্তি প্রচার করে চলেছে।



আভিধানিক বাঘ

ক.

বাঘেরা সংবেদনশীল ও সহজেই এরা নিজেদের অপমানিত বোধ করে। মালয়, সুমাত্রা, আসাম, বাংলা এবং দক্ষিণ চীনে বাঘ হচ্ছে আদিম অধিবাসী। এ সমস্ত স্থানে বাঘ সাহসী, নরখাদক এবং আকৃতি পরিবর্তনকারী বলে বিখ্যাত। মধ্য চীনে 'রেড রাইডিং হুড' গল্পের অনুসরণে বাঘ পশ্চিম ইউরোপের নেকড়ের স্থান নিয়েছে এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে ভক্ষণ করে। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে বাঘ মানুষ খাওয়ার পর তার [মানুষের] শরীরী আত্মাকে জঙ্গলের পথে নিয়ে যায় এবং অন্য শিকারকে প্রলুব্ধ করে তোলে। পরবর্তী শিকার ধ্বংস করার পর প্রথম মানুষটির প্রেতাত্মা মুক্তিলাভ করে।

বাঘকে তুষ্ট করার উৎসবগুলি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং বাঘের সংবেদনশীলতার জন্য ঐ ধরণের অনুষ্ঠান করা হয়। সুমাত্রার কিছু গ্রামে বাঘ সম্পর্কে কোনরকম অশ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ করা হয় না। যে পথ দিয়ে বাঘ পূর্বে যাতায়াত করত সেই পথ বাঘ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও সেই পথ গ্রামবাসীরা আর ব্যবহার করেন না, কাবণ তাঁরা আশঙ্কা করেন যে এটা তাঁদের পক্ষে অনধিকার প্রবেশ। মাথা আচ্ছাদিত না করে রাস্তায় চলাফেরা করলে বাঘকে অবমাননা করা হয়; রাত্রিতে কোথাও যাত্রা করার সময় তাঁরা পিছন ফিরে তাকান না কেননা, এতে তাঁরা বাঘের ভয়ে ভীত একথা বাঘ মনে করতে পারে এবং তাঁদের ঐরকম আচরণ বাঘকে ক্রুদ্ধ করে তুলবে। রাত্রিতে তাঁরা মশাল জ্বালেন না কারণ মশালের স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে বাঘের চোখ। আত্মরক্ষার জন্য অথবা নিকট-আত্মীয়ের হত্যার কারণে তাঁরা বাঘ হত্যা করেন। আগন্তুক শিকারী বাঘ ধরার ফাঁদ পাতলে গ্রামবাসী বাঘকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা এই কাজ করছেন না। এঁরা সাধারণত হত্যাকারী বাঘকে জীবিত ধরতে চেষ্টা করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে জানতে চাওয়া হয় এমত অবস্থায় তাঁরা কি করবেন। বাট্টারা শুধুমাত্র হত্যাকারী বাঘকে মারেন এবং মৃতদেহটি গ্রামে নিয়ে এসে তার আত্মার কাছে ধূপধূনা জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে জানানো হয় কেন তাকে হত্যা করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এরপর ক্লান্ত না-হয়ে-পড়া

পর্যন্ত তাঁরা তাঁরা মৃতদেহটি ঘিরে নৃত্য করতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষের আত্মা বাঘের দেহে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। একজন পুরোহিত খাবার এবং জল দান করে আত্মাকে ক্রুদ্ধ না হতে অনুরোধ করেন। বাংলার পার্বত্য অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন, যদি দৈব আদেশ ব্যতীত কেউ বাঘ হত্যা করেন তবে তিনি অথবা তাঁর নিকট আত্মীয় শীঘ্রই বাঘের কবলে প্রাণ হারাবেন। শিকারী বাঘকে হত্যা করে তাঁর অস্ত্র বাঘের মৃতদেহের কাছে রাখেন এবং ভগবানের কাছে জানান যে, বাঘের অপরাধের জন্যই শুধুমাত্র এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন পুনরায় এ-ধরণের প্রয়োজন দেখা না দিলে বাঘ হত্যা করবেন না। কাচিন চৈনিকরা বাঘ ধরার পর বিলাপ করেন। মালয় উপদ্বীপের কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, বাঘেরা স্বনির্মিত শহরের বাড়ীতে বাস করে, এবং বর্ণনা করা হয় যে, কল্পিত ব্যাঘ্র-গ্রামটির বাড়ীর ছাদ মানুষের চুলের দ্বারা নির্মিত। শিক্ষকের কাছে কশাঘাত দ্বারা প্রহৃত হয়ে একটি বালক ছুটে জঙ্গলে পলায়ন করে এবং সেই-ই প্রথম বাঘ-এ পরিণত হয়। বাঘের আঘাত নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে এমন ঐন্দ্রজালিক গাছের পাতার গোপন সন্ধান সে পায়। সমগ্র উপদ্বীপবাসীরা বাঘের নখ এবং লোম দিয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী যাদু-ঔষধ তৈরী করেন। একটি বাঘের লোমের সঙ্গে একজন মানুষের মুখের লোম যুক্ত করতে পারলে তা শত্রুর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। চিকিৎসক এবং যাদুকরের কাছে বাঘ খুব পরিচিত জন্তু। বাঘের সাহায্যে অমরত্ব লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস আছে।

আসামের মিকিররা বিশ্বাস করেন যে বাঘের মাংস খেলে শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়। তবে তা স্ত্রীলোকের খাওয়া নিষিদ্ধ, কারণ বাঘের মাংস খেলে তাঁরা বলিষ্ঠমনা হয়ে উঠবেন। কোরিয়ানদের বিশ্বাস, বাঘের অস্থি মাটির মধ্যে থেকে যখন ধূলার মত হয়ে উঠবে তখন তা মদে মিশিয়ে খেলে শক্তি ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই বস্তুটি শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত চিতা বাঘের অস্থির চেয়েও বেশী কার্যকর। আরও শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার বাসনায় সিউলের একজন চীনা একটি আস্ত বাঘ ভক্ষণ করেছিল। শক্তিবৃদ্ধিতে বাঘের পিত্তকোষ বিশেষ ক্ষমতা রাখে বলে মনে করা হয়।

দক্ষিণ এবং মধ্য চীনে বাঘ আকৃতি-পরিবর্তনকারী বলে বিখ্যাত। উত্তর চীনে খেঁকশিয়ালের অনুরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। সব গল্পই প্রায় একধরণের তবে নায়ক বিভিন্ন।[১]

খ.

বাঘ সম্পর্কে ছুটি বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, যেগুলি সহজেই একত্রিত করা যায়; 'এটি [বাঘ] গ্রীক পুরাণের ডায়োনিসসের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক। চীনে, এটি অন্ধকার ও অমাবস্যার প্রতীক।' অন্ধকারের সঙ্গে আত্মার রহস্যময়তা অভিন্ন এবং হিন্দু রীতি অনুযায়ী তমঃ যা সাধারণের প্রতীক—এটি প্রবৃত্তির নীচ বা হীনশক্তির অসংযত প্রকাশকে সূচিত করে। বর্তমানে, চীনে বা আফ্রিকায় এবং পশ্চিমী সংস্কৃতিতে বাঘ সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উভয় পশুই ড্রাগনের মত—ছুটি বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ —একদিকে বন্য বা হিংস্র জন্তু এবং অপরদিকে গৃহপালিত শান্ত জন্তু। সৎকার্যে শক্তি ও সাহসের প্রকাশে বাঘকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করার পিছনে এই চিন্তাই কার্যকরী। লৌকিক পুরাণে উল্লেখিত পাঁচটি বাঘ একত্রে খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের চারমূর্তির সঙ্গে তুলনীয় একটি প্রতীককে সূচিত করে।

লাল বাঘ দক্ষিণে গ্রীষ্মকালে রাজত্ব করে এবং তার উপাদান হচ্ছে অগ্নি, কালো বাঘ উত্তরে শীতকালে রাজত্ব করে এবং এর উপাদান হচ্ছে জল, নীল বাঘের রাজত্ব পূর্বে, বসন্তকাল হচ্ছে এর সময় ও উদ্ভিদের মধ্যে রাজত্ব। সাদা বাঘ শরৎকালে পশ্চিমে প্রভুত্ব করে ধাতুর মধ্যে। সবশেষে, হলুদ বাঘ [সূর্যের মত রঙ] পৃথিবীতে বাস করে—সমস্ত বাঘের ওপর এর আধিপত্য। এই হলুদ বাঘ পৃথিবীতে চীনের কেন্দ্রে বাস করে, কেননা চীন হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। ইউং [Jung] চারটি এবং কেন্দ্রে অবস্থিত পঞ্চমটির অবস্থানের প্রতীকের মূল তাৎপর্য দেখিয়েছেন। বাঘ যখন অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়, সে শাসকশ্রেণীর প্রতীক বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাঘ শ্রেষ্ঠ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরীসৃপের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু বিপরীত ঘটনাও দেখা যায় যখন সিংহ অথবা ডানাযুক্ত জীবের [শক্তিশালী জীব ?] সঙ্গে বাঘের লড়াই হয়।[২]

গ.

বিড়াল-জাতীয় শিকারী জন্তুদের মধ্যে শক্তিতে এবং হিংস্রতায় বাঘের প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র সিংহ। এই ছুই প্রাণীর পার্থক্য প্রধানত চামড়া এবং ছালের ওপর নির্ভর করে। একটি বাঘের মাথার খুলি সবসময়েই একটি সিংহের থেকে পৃথক করে চেনা যায়, কারণ বাঘের নাকের হাড় চোয়াল থেকে

কিংবা তার কাছাকাছি কোন স্থান থেকে না উঠে, সরাসরি কপাল থেকে নেমে আসে।

অবশ্য আয়তনের দিক দিয়ে দুই পশুর মধ্যে বেশ তফাৎ দেখানো যায়। বাংলার জঙ্গলের সবচেয়ে বড় বাঘ যে কোন সিংহের আকৃতিকে ছাড়িয়ে যায়। নাকের আগা থেকে লেজের ডগ পর্যন্ত ফুট দশেক হওয়াটা একটি প্রমাণ আকৃতির বাঘের পক্ষে মোটেই কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। স্ত্রী বাঘ কিয়ৎ পরিমাণে ছোট এবং এরা হাল্কা ও ছোট মস্তিষ্কের অধিকারিণী হয়ে থাকে। বাঘের কেশর থাকে না, কিন্তু পুরুষ বাঘের দাড়ি কিছুটা লম্বা এবং বিস্তৃত, মস্তিষ্কের বহিরাংশ, সারা শরীর এবং লেজের রঙ উজ্জ্বল লালচে হলুদ এবং উল্লেখিত অংশগুলি ঘন কাল্‌চে রঙের টেরচা টেরচা ডোরা দিয়ে সুন্দরভাবে চিহ্নিত। এই দাগগুলি সব বাঘের গায়ে অবশ্য সমান ভাবে থাকে না, এমনকি কোনো কোনোটির দু-দিকেই ডোরা দেখা যায়। দেহের নীচের অংশ, হাত-পায়ের ভিতর দিক, চিবুক এবং দুচোখের ওপর বড় বড় প্রায় সাদারঙের দুটি দাগ আছে। বাঘেদের মধ্যে যারা গরমদেশের জঙ্গল অঞ্চলে [যেমন বাংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ] বাস করে তাদের ছোট ও মোলায়েম লোম থাকে এবং গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল এবং ডোরাগুলি চীন ও সাইবেরিয়ার বাঘের ডোরার থেকে অনেক স্পষ্ট। চীন ও সাইবেরিয়ার বাঘের লোম লম্বা, নরম ও হাল্কা রঙের। কালো-সাদা বাঘের কথা কথা শোনা যায়, তবে এরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। [মধ্যভারতের রেওয়া অঞ্চলে কিছু কিছু এ-ধরণের বাঘ দেখা যায়; সম্প্রতি কলকাতার পশুশালায় সাদা বাঘ কয়েকটি জন্মেছে।—সংকলক] বাঘ এশিয়ার বৃহদংশ জুড়ে বাস করে, ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণে বাস-উপযোগী প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই এদের দেখা যায়। কাস্পিয়ান নদীর দক্ষিণ তীর, আরল সমুদ্রের বৈকাল হ্রদ থেকে অখটস্কেও এদের দেখা যায়। আমুরের উত্তরাঞ্চলে, সুমাত্রার দক্ষিণের দ্বীপে, জাভা এবং বলিদ্বীপে এদেব বেশী করে দেখা যায়। পশ্চিমে তুরস্ক, জর্জিয়া এবং পূর্বদিকে শাখালীন পর্যন্ত এদের এলাকা। মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল শ্রীলঙ্কা, বোর্ণিও অথবা মালয় এলাকার ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলিতে এদের দেখা যায় না।

ভারতে বাঘের প্রধান খাদ্য হচ্ছে গরু, মহিষ, হরিণ, বন্য শূকর ও ময়ূর এবং মাঝে মাঝে মানুষ। পুরোপুরি নরখাদক সাধারণত বুড়ো বাঘেরাই হয়ে থাকে

—যার শক্তি অন্তর্হিত এবং যার দাঁত কমজোরী ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ-ধরণের বাঘেরা গ্রামের কাছাকাছি আস্তানা নেয়, বন্য পশু শিকারের থেকে মানুষ শিকার তার পক্ষে এ-সময় সুবিধাজনক। যদিও এরা প্রধানত তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে অথবা জলা জায়গায় থাকতে ভালবাসে তথাপি বাঘেদের গভীর জঙ্গলেও দেখা যায় এবং এরা পুরানো ধ্বংসাবশেষের ওপর ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। নিয়মানুযায়ী, বাঘেরা গাছে উঠতে পারে না, তবে খুব ভয় পেলে, যেমন কোন জলপ্লাবনের ফলে আতঙ্কিত হয়ে তারা গাছে উঠে থাকে। বাঘ ইচ্ছামত নদী থেকে বা অন্য কোন জলাশয় থেকে জল খেতে পারে। এরা ভাল সাঁতারু।

বাঘিনীরা সাধারণ সংখ্যানুযায়ী একবারে দুই থেকে ছয়টি শাবকের জন্ম দিয়ে থাকে। এরা জননী হিসেবে স্নেহশীলা এবং সাধারণত সন্তানদের আগলে রাখে ও উদ্বেগের সঙ্গে নজর রেখে শিক্ষা দেয়। পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বা দ্বিতীয় বছরে যতদিন না তারা নিজেদের জন্য শিকার ধরতে পারে, ততদিন পর্যন্ত শাবকগুলিকে নিজের কাছে শক্তি ও সাহসের সঙ্গে রক্ষা করে। তবে চাপে পড়ে তাদের ত্যাগও করে না তা নয়; এছাড়া অনাহারে পড়ে নিজের সন্তানকেও খেয়ে থাকে অনেক সময়। মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে বাচ্চারা অন্য খাদ্য খেতে শিখলে ব্যাঘ্রী তাদের ছোট ছোট পশু শিকার করতে শেখায়।

যদিও বাঘ সিংহের থেকে ভিন্ন, কিন্তু উভয় পশু শরীর এবং আকৃতির দিক দিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন চিড়িয়াখানার বন্দীদশায়, এদের মাঝে মাঝে মিলিত করা হয়। এই ধরণের মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মায় তাদের 'ব্যাংহ' বা 'টাইগন' বলা হয়—এদের পিতা বাঘ। আর যখন সিংহ এদের পিতা তখন এদের বলা হয় 'সিংঘ্র'।[৩]

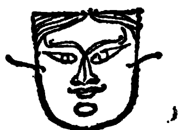
সংকলক ও অনুবাদক : শ্রীমতী গোপা সরকার

---

১. Maria Leach-[Editor]: Dictionary of Folklore Mythology and Legend.

২. J. E. Cirlot : A Dictionary of Symbols.

৩. Encyclopaedia Britanica, Vol. XXII



একটি লোকায়ত বৈষ্ণবীয় দেবতা ও বাঘ

ড. প্রদ্যোত ঘোষ

সারা পৌষমাসে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ মালদহ জেলা থেকে উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা পর্যন্ত সোনা রায়ের গান ও পাঁচালী গীত হয়ে থাকে। বর্তমান উত্তর বাংলা ছাড়া পূর্ব বাংলার রংপুর, রাজশাহী, পাবনা ও মৈমনসিংহ জেলায়ও এ পূজার প্রচলন আছে : এমন কি বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী রাজ্য বিহারের পূর্ণিয়াতেও সোনা রায়কে দেখা যায়।

: উদ্ভব ও পূজা-পদ্ধতি :

সোনা রায়ের পূজা-গান ও পাঁচালীর উদ্ভবের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কিন্তু এর উৎপত্তির উৎস খুঁজে পেতে দেরী হয় না। কারণ, প্রতিটি পাঁচালীর উদ্ভবের মধ্যে গৃহস্থের মঙ্গল-কামনা জড়িয়ে থাকে, আপদ থেকে উদ্ধার ও ঐহিক ঋদ্ধিই যার একমাত্র লক্ষ্য। সোনা রায়ের পাঁচালীতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আদিম যুগে ভয়-ভক্তির জন্য পূজার্চনার উদ্ভবের যে ইতিহাস আছে, তাও এই পূজা-প্রচলনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এ-বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মঙ্গলকাব্যের যুগ-সীমায় অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই এর জন্ম।

সোনা রায়ের পূজক—ছোট ছোট রাখাল বালকেরা। সারা পৌষ মাসের রাত্রি বেলা তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাগন পদ্ধতিতে চাল ডাল পয়সা সংগ্রহ করে। মাগনের সময় তারা সোনা রায়ের ছড়া সুর করে আবৃত্তি করে। একজন মূল গায়ক, অন্যরা সব দোহারকে। রাজশাহী অঞ্চলে গায়কেরা দুটি সারি করে মুখোমুখি দাঁড়ায়। গান গাওয়ার সময় মূল গায়েন হাতে তালি দিয়ে প্রথম পদ গাওয়ার পর সামনের সারির দিকে যেখানে দোহারকেরা আছে, সেদিকে চলে যায়। দোহারকেরা মূল গায়েনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। কোন কোন সময় পাট ও শোলার দণ্ড নেয়। ঘটিতে জলও নেওয়া হয়। গৃহস্থকে আশীর্বাদ করার জন্যই এগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে। হাতে তালি দিয়ে মালদহ জেলার নিয়ামতপুর, ডারসাল্লা, ফুলবাড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে গান হয়ে

থাকে। একমাসের সংগৃহীত চাল-ডাল-পয়সায় অবশেষে পৌষ সংক্রান্তিতে সোনা রায়ের পূজার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

: মূর্তি :

দক্ষিণ বাংলার চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে বিখ্যাত ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের অন্য সংস্করণ উত্তর বাংলার সোনা রায়। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায়ের লৌকিক দেবকুলে যে আধিপত্য উত্তরবঙ্গের সোনা রায়ের তা নেই বটে, তবে সময়ে এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে সোনা রায়ের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। বিশেষ করে আধুনিক কালে বসতিস্থাপন ও আরণ্য-সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারে এই অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতি দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা অনেক কমে গিয়েছে। ফলে, সোনা রায়ের মাহাত্ম্য ও প্রচার দক্ষিণ রায়ের মতো বিদগ্ধজনের কাছে তেমন করে পৌছায় নি। সোনা রায়ের মূর্তি, কোন কোন স্থানে যা পূজিত হয়, তা হলো—হয় চতুর্ভুজ নতুবা দ্বিভুজ। মালদহ জেলার ভূতণী, দিয়া রায়, পুলিন টোলা, সুখদেব টোলায় চতুর্ভুজ সোনা রায়ের মূর্তি পূজিত হয়। এই চারটি হাতের মধ্যে নীচের দু-হাতে থাকে বাঁশী কোথাও বা পাঁচন বাড়ী বা লাঠি, আর ওপরের একহাতে বরাভয় এবং অন্যটিতে বনফুল। সোনা রায় কোথাও বাঘের উপর উপবিষ্ট, কোথাও বা বাঘের পাশে দণ্ডায়মান। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, গলায় বনমালা—ঠিক যেন কৃষ্ণের মূর্তি। কোথাও কোথাও দ্বিভুজ এই মূর্তির হাতে লাঠি বা রাখাল বালকদের মতো পাঁচন বাড়ীও দেখা যায় [দ্র. দুই পৃষ্ঠার আলোকচিত্র]। কোথাও কোথাও রাখালের গামছাটিও তাঁর সঙ্গে রয়েছে দেখা যায়। মূর্তির পায়ে জুতো, পরিধানে ধুতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রভাব এই লৌকিক দেবতার মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। জনৈক গবেষক মালদহ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ভগ্ন সোনা রায়ের মূর্তি দেখেছেন বলে যে দাবী করেছেন[১], তা ঠিক নয় বলে মনে হয় [দ্র ড. ফণী পাল : 'সোনা রায়ের পূজা-পাঁচালী ও প্রসঙ্গতঃ'—আলোচনাংশের পৃ. ৫]। কারণ, গৌড় অঞ্চলে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন দেব-দেবীর যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে, তাতে ঐ ধরণের লোকায়ত-দেবতাদের স্থান থাকা সম্ভব নয়। উপরাংশ ভগ্ন, ব্যাঘ্র নয়, অন্য কোন একটি শ্বাপদের উপরে উপবিষ্ট বুট [?] জুতা পরিহিত যদি কোন মূর্তি পাওয়াও যায় তা হলেও সেটি যে সোনা রায়ের মূর্তি—এটি কি ভাবে প্রমাণিত

হবে ? বর্তমান লেখকের সংগ্রহে একটি পাথরের হারিতি [বৌদ্ধ দেবী] মূর্তি আছে। সেখানেও নিম্ন ভাগে সিংহের উপর অধিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্তি আছে। এবং সর্বশেষে বলা যায় যে বৈষ্ণবী প্রভাব যখন গৌড় বঙ্গে ব্যাপক হয়েছে তখন পাথরকাটা শিল্পীরাও অন্তর্হিত হয়েছেন ; অতএব এটি যে সত্য নয় তা স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

: মূর্তির ব্যাখ্যা :

প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত ও গবেষক সুধাংশুকুমার রায় সোনা রায়কে তরাই-এর দেবতা বলেছেন। কিন্তু এই ধারণাও আংশিক সত্য। কারণ, কৃষ্ণ ভাবনায় লৌকিক দেবতা গৌড় অঞ্চল থেকেই তরাই প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মুখোস , তন্ত্র-সাধনার ধারা, বৈষ্ণবী সাধনা সবই বর্তমান মালদহ অঞ্চল থেকে যে ক্রমশঃ উত্তর দিকে উত্তরবঙ্গ. তিব্বত, আসাম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ও প্রসারিত হয়েছে এবং তা যে ঐতিহাসিক ঘটনা সে তথ্য ড. নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট গবেষকদের লেখাতেও ধরা পড়েছে [দ্র. 'বাঙালীর ইতিহাস' : আদি পর্ব], পেরিপ্লাসেও এমনিই একটা পথের নির্দেশ আছে।

হান্টার সাহেবের দুটি গ্রন্থে [*Annals of Rural Bengal* এবং *Statistical Account of Bengal Vol. XI*] উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অরণ্যে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে, আছে বোভার্লিন রিপোর্টেও। সুতরাং মানুষ খেকো বাঘের অপেক্ষা গো-মহিষাদির শত্রু চিতা বাঘের দৌরাত্ম্য থেকে ঐ গৃহপালিতদের রক্ষার জন্যই যে এই পূজা-প্রচলন তা বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের লৌকিক শিবের সম্পর্কও এর মধ্যে জড়িয়ে আছে ;—যার ব্যাপক রূপ মালদহের সূর্যদেবতা ও লৌকিক শিবে রূপান্তরিত গম্ভীরার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রত্যেকটি সোনা রায়ের গানে 'বল ভাই শিবঃ' এই মুখপদ [মুখপাত] বর্তমান। সুতরাং দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বড় খাঁ গাজী, বনবিবি প্রভৃতির মতই লোকায়ত দেবতা সোনা রায়, তবে তাকে স্থানীয় ভাবধারায় স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

: পূজা ও উপচার :

পৌষ-সংক্রান্তিতে একটি গাছতলায় এই পূজা হয়। কোথাও চারদিকে কলা গাছ পুঁতে দেওয়া হয়। সোনা রায়ের পাঁচালী গেয়ে রাখালেরা সাতবার

প্রদক্ষিণ করে। মুখ্য রাখাল গান ধরে, অন্য চার-পাঁচ জন রাখাল তার ধুয়া [Refrain] ধরে ঐ গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে। কোন কোন সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নিয়োগ করা হয়। এই পূজায় আতপ চাল, গঙ্গা জল, বেলপাতা, ফুল, ঘট, কড়াই, কলা, পায়রার বাচ্ছা ইত্যাদি উপচার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে মন্ত্র এই পূজায় উচ্চারণ করা হয় তা অন্য উচ্চশ্রেণীর দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন: 'প্রথমং সুস্নাতঃ শুচিরাচান্তঃ স্বস্তিবাচনপূর্বকং সূর্যং সোমইত্যাদি পঠেৎ। তত সুদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুস্মৃতা তিলফুলজলন্যোদায় সংকল্পং কুর্বাৎ'······ইত্যাদিতে সোনা রায়ের জন্য আলাদা কোন সংকল্পের খবর নেই। ধ্যানমন্ত্রেও তাই: 'ওঁ ভূজাচ্চন্দ্র জটাধরাং ত্রিনয়নাং নীলাঞ্জনা ইত্যাদি মন্ত্রে পুং দেবতার উদ্দেশে দেবীর মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, সোনা রায় বর্ণেতর কোন লোকায়ত দেবতা; পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে উচ্চতর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা বৈদিক মন্ত্রে পূজিত হয়ে কৌলিন্য-প্রাপ্ত হয়েছেন।

আবার কোথাও রাখাল বালকেরা নিজেরাই পূজা করে, ফুল-বেলপাতা দিয়ে। শাস্ত্রীয় কোন পূজা-পদ্ধতিই সেখানে অনুসরণ করা হয় না। এখানে দেবতার অন্যতর উপচার হিসেবে একটি পায়রার বাচ্চার মাথাকে মুচড়িয়ে উৎসর্গ করা হয় এবং পূজা স্থানে পুঁতে দেওয়া হয়। কখনও বা এই ভাবে বলি না দিয়ে পায়রাটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পাঁঠা বলি হলে নাপিত পাঁঠার মুণ্ডটি পায়। কখনও বা পাঁঠাকে বলি না দিয়ে তার কানের একটা অংশ কেটে দেওয়া হয়! তাকে বলে 'সূর্য পাঁঠা'। এখানে এই পদ্ধতিটি সূর্যব্রতের বা সূর্যপূজার অনুরূপ। এই সূর্য পাঁঠা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার অধিকারী, কেউ তাকে ধরে না বা খায় না, ঠিক ধর্মের ষাঁড়ের মতো। সন্ধ্যার সময়ে কোন গৃহস্থ যদি তাকে দেখেন তবে রাত্রির মত তাকে আশ্রয় দেন। ১লা মাঘ সোনা রায়ের মূর্তি বিসর্জিত হয়।

আগেই বলেছি যে বাঘ গো-পালকদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ শত্রু সেজন্য লোকায়ত কোন দেবতার কল্পনা করে, বাঘের সঙ্গে তিনি অভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবী প্রভাব। কারণ, শুধু মূর্তিতে নয়—এই রায়ের পাচালাতে রাধা, সুবল, সুদাম, শচী, নিমাই প্রমুখের উল্লেখ আছে। অধিকন্তু আছে গো-পালকদের জীবনের হরেকরকম চিত্র। বন্দনা অংশে আছে তুলসী বন্দনা, গাভী বন্দনা, রাখাল বন্দনা, বুড়াবুড়ি বন্দনা

প্রভৃতি। এরা গানগুলিকে বলে 'শাকবোল'। রাখাল ও গোয়ালাদের জীবনের সঙ্গে বৈষ্ণবী-ধারণার সংযুক্তিকরণের [synthesis] ফলেই যে সোনা রায়ের উৎপত্তি তা বোধ হয় খুব সহজেই ধরা পড়ে তাদের গানগুলিতে। সোনা অর্থে স্বর্ণময় বা কল্যাণময় যে রায় অর্থাৎ দলপতি, তিনিই এই দেবতা;—তাই বলে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সোনা রায় বলে কেউ ছিলেন না—তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, গৌড় অঞ্চলে সোনা রায়ের গড় বলে একটা গড়ও আছে। তবে সেই নামের সঙ্গে অভিন্ন এই লৌকিক দেবতা তিনি নন—তা নিঃসন্দেহে বলা চলে, তা হলে, তার ঐতিহাসিক তথ্য এতদিনে নিশ্চয়ই মিলতো।

দু-চারটি গানে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও গো-পালকদের পূজার্চনার সঙ্গে জীবনাচরণের চিত্র কেমন ভাবে ধরা পড়েছে তা কয়েকটি গান পর্যালোচনা করলেই ধরা পড়বে। কোথাও বা আর এক গো উপকারী দেবতা মাণিক পীরের সঙ্গেও এই সোনা রায়ের সখ্যতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন:

১.

'আমরা রাখাল রে ভাই, গরুও চরাই,
সন্ধ্যার বেলা বাড়ী বাড়ী চাহিয়া বেড়াই ॥ ধ্রু ॥
আনিব ধূপের পুরিয়া[২] ডালিতে সাজাই,
আনিব সিন্দুরের পুরিয়া ডালিতে সাজাই
আনিব আতপ চাউল ডালিতে সাজাই,
আনিব গাভীর দুধ ডালিতে সাজাই,
আনিব কলার থোকা[৩] ডালিতে সাজাই,
আনিব পায়রার বাচ্চা ডালিতে সাজাই
পূজিব সোনা রায় আমরা সবাই।
আমরা রাখালেরা······ ·· ······॥ ধ্রু ॥
বল ভাই শিব।'

২.

'তোরা কে যাবি তো আয় কানাই ব্রজের পথে।
ওপারেতে পাইকরের গাছ গো পাতা ঝির ঝির করে ॥ ধ্রু ॥

গাছের তলোয় রাধাকৃষ্ণ গুলিডাণ্ডা খেলে,
খেলরে খেলোয়ারীর বেটা কেমন খেলা খেল।
এক হাতে মাণিক[৪] কলা, আর হাতে দৈ,
সোনা রায়ের পূজা দিব মাণিকঠাকুর কই।
মাণিক ঠাকুর উঠে বলে, আমার পূজা কই॥
ঢোল বাজিল, ঢাক বাজিল, আর বাজিল কাড়া,
বেঙের সংবাদ নিয়ে চলক তাঁতি পাড়া,
তাঁতি উঠিয়া বলে কোন দেবতা তারা।
দেবতা নাই, দেবতা নাই, তাঁতিরই গোঁসাই,
রাম ধাক্কা মেরে দিলাম তান্নি-মান্নি নাই।
তান্নি-মান্নি নিয়ে বুড়া উঠিল গাছেতে,
গোঁফ ধরে টানল বুড়া পড়ল মাটিতে।
কেউ মারে চড় চামেটা কেউ মারে জুতা,
কোন মুখে চুরি করিস্—মাগী টানে সুতা॥
তোরা কে যাবি তো আয়… · …… ॥ ধ্রু ॥
বল ভাই শিব।'

৩.

'ভাল ভুলেন!
ওপারেতে যেও না গো হেউ[৫] বসিয়াছে।
হেউয়ের মাথায় পাকাচুল গো দাদা দেখিয়াছে।
দাদার হাতে লোলক-লাঠি টিয়া মেরেছে।
টিয়ার বেটির বিয়া হবে লাল শাড়ী দিয়া,
লাল শাড়ী নিব না গো তোসক এনে দে,
তোসক করে লোসর ফোসর পালকি সাজায়ে দে।
পালকির ওপর ঢোরা সাঁপ গো ফোঁস ফোঁস করে।
বল ভাই শিব।'

---

১. আমাদের এই সংকলনের পূর্ববর্তী দুটি প্রবন্ধ [পৃ. ১৪-১৫ ও পৃ. ২৫ এই মূর্তি প্রসঙ্গে বিপরীত মত পোষণ করেছে। এই বৈপরীত্য

সম্পর্কে আমি পূর্বেই অবহিত ছিলাম ও কৌতূহলোদ্দীপক এই মূর্তিটির বিশিষ্টতা আমার নিজেরই একটি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। ফলে, আমি একদিকে যেমন প্রবন্ধকারত্রয়কে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করি ঐ মূর্তিটির একটি আলোকচিত্র পাঠিয়ে দিতে, তেমনি একদা আমি নিজে মালদহে উপস্থিত হয়ে ঐ মূর্তিটির আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের চার জনের কেউ-ই এই কাজে সফল হইনি। কারণ, মিউজিয়মটির চিররুদ্ধ দরজা ও নানা ধরণের অব্যবস্থা। আমরা যদি ভবিষ্যতে কোন ভাবে ঐ মূর্তিটির একটি আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে পারি তবে একদিকে যেমন সকল সন্দেহের নিরসন হবে—অন্যদিকে তেমনি মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোকচিত্রটির সাহায্যে ওইটির বয়স-কুলপঞ্জী ইত্যাদি নির্ণয়ে সক্ষম হবেন। অবশ্য আমরাও ঐটি সংগ্রহে চেষ্টার ত্রুটি রাখবো না।—সম্পাদক।

২. ছোট কাগজের মোড়ক।

৩. ছড়া।

৪. মর্তমান।

৪. বাঘ।



সুন্দরবন ও বাঘ

শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী

বাঘ প্রাণীটি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, শ্রদ্ধা এবং ভীতির সংমিশ্রণে নির্মিত ভীষণ-সুন্দর ও অভিনব এক অভিজ্ঞতা। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো থেকে সব চেয়ে পুরাতন যে মোহর ও তার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গেছে [আঃ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০] তাতে বাঘের চিত্র খোদাই করা আছে [এই গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। কোরিয়া দেশীয়রা বাঘকে প্রাণী জগতের রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন। সাইবেরিয়ার জনগণের সংস্কৃতিতে বাঘ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঘের সম্পর্কও অতি প্রাচীন—তাঁদের শিল্পে ও চিত্রাবলীতে বাঘ বিচিত্র চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। তাঁদের দেশের 'মুরাল' চিত্রগুলি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও এই প্রাণীটির এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও তার অব্যবহিত পূর্বে বিশ্বের ব্যাঘ্র-সমাজ এক বিরাট এবং সুবিস্তৃত ভৌগোলিক সীমানায় বিচরণ করতো। একদিকে পূর্ব-তুর্কির পবর্তমালা ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে রুশদেশের মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত, অন্যদিকে পূর্ব-প্রান্তের আফগানিস্তানের উত্তর ভাগ থেকে আরম্ভ করে, ইরাণ ও সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত এই প্রাণীটির বিচরণ ক্ষেত্র ব্যাপ্ত ছিলো। উত্তর-প্রান্তে কোরিয়া, চীনের পূর্বভাগ ও বোর্ণিও ছাড়া হংকং, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জ সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই প্রাণীটির সগৌরব অস্তিত্ব বিদ্যমান। হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালা, থরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত মরুভূমি ও সিংহল দ্বীপ ব্যতিরেকে ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই বাঘের অবস্থান অব্যাহত ছিলো। ভারতবর্ষের মধ্যে হরিয়ানার জঙ্গলে, রাজস্থান ও গুজরাটের বনভূমিতে বাঘ সগর্বে উপস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরালাতে এই প্রাণীটি বসবাস করছে। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের বনভূমি বাঘের একান্ত প্রিয় আবাসস্থল। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলও বাঘের অতি নির্ভয় ও মনোরম আবাসক্ষেত্র।

উত্তরখণ্ডের চির-সবুজ ও অন্যান্য বনাঞ্চল বাঘের উপযুক্ত আবাসরূপে পরিচিত। পূর্ব থেকে পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যকা ও হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত বনাঞ্চল রয়েছে তা ভারতবর্ষের বাঘের সবচেয়ে পরিচিত বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, সুন্দরবনের বাঘ, যা 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নামে সমধিক বিখ্যাত তা বিশ্বের ব্যাঘ্র-মানচিত্রে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে সুন্দরবনের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে আধুনিক কালে। এমন কি দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত ছিলো। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী থেকে ভৈরব ও তারপর পদ্মায় পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনে বদ্বীপের উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের একটি অতি নিবিড় সম্পর্কের এক বিরাট অথচ প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সুন্দরবন। বিশ্বমানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত সুবিশাল এই বনভূমি সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্মভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। ভয়াল সুন্দর বাঘ, পৃথিবীর বৃহত্তম কুমীর, বিষধর সাপ, হাঙ্গর, কামট, বিভিন্ন জাতের শামুক, কাঁকড়া, মাছ, বন্য বরাহ, বিভিন্ন ধরণের বিহঙ্গ, অনিন্দ-সুন্দর হরিণ শাবক এই সুন্দরবনকে বিশ্বের বন্য-প্রাণীর মানচিত্রে দ্বিতীয়-রহিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু এমন যে সুন্দরবন সেখানে ব্যাঘ্রকুলের আবির্ভাবের কারণ ও পদ্ধতি কি? এই প্রশ্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বা অপর শাখার বিজ্ঞানী ও কৌতূহলী মানুষের মনে উঁকি দিতে পারে। ব্যাঘ্রকুলের সুন্দরবনে আবির্ভাবের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। গঙ্গা অথবা ব্রহ্মপুত্র বা তাদের অজস্র শাখানদীর জলরাশির সাহায্যে বাঘেরা বঙ্গোপসাগরের বিরাট খাঁড়ি অঞ্চল যে সুন্দরবন সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং এর অখণ্ড সুবিশাল ও ব্যাপ্ত বনভূমিকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে। অন্যপক্ষে আর একটি মত হচ্ছে এই যে, যেহেতু সুন্দরবনের উৎপত্তি দুই বা তিন হাজার বছরের মতো [ভূ-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে] সেহেতু সুন্দরবনে বাঘ-এর উৎপত্তির ঘটনা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্বাভাবিক বা উপযুক্ত আবাসস্থল, অপেক্ষা কোন বিছিন্ন ঘটনা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে যে ব্যাঘ্রকুলের উৎপত্তি বা আবির্ভাব, সে ব্যাঘ্রকুল তার স্বাভাবিক আবাসস্থল, খাদ্য বা অপরাপর প্রয়োজনীয় জীবন-উপকরণের যোগান যেখানেই পেয়েছে সেখানেই

প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট নিয়মে তার আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছে। সুন্দরবন তাই বাঘ-সমাজের নতুন গড়ে ওঠা একটি আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিবর্তনশীল বনভূমি বা তার জলরাশির ক্রমবর্দ্ধমান লবণাক্ততার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং বাঘেদের সেই পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। আমরা আগেই বলে এসেছি যে, সুন্দরবনের এই বাঘ সাধারণের কাছে 'দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামে পরিচিত। কিন্তু এই ব্যাঘ্র-প্রজাতির কেন যে 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নাম হলো তার পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজ পযন্ত মেলেনি। অথচ, যুগ যুগ ধরে এই বাঘ কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই সমান কৌতূহল আকষণ করেছে। এতদসত্ত্বেও কিন্তু আমরা এই প্রাণীকুলের আহায, আবাসস্থল, প্রভৃতি তার নিত্য-প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির বিষয়ে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছি ও নিজেদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার প্রয়োজনে নির্বিচারে এদের শিকার করেছি। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে চলেছে। তাই আজ 'ব্যাঘ্র-প্রকল্প' তৈরী করতে হয়েছে—প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টিকে তার নিশ্চিত অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে 'ব্যাঘ্র-প্রকল্প' কেবল বাঘকে বাঁচানোর প্রকল্প মাত্র নয়; এটি বস্তুতপক্ষে একটি প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রকল্প—যার মাধ্যমে প্রকৃতির সুষ্ঠু ও অপরিহার্য ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। কারণ, জীব-বিজ্ঞানরূপ পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে এই বাঘ। কাজেই এই প্রাণীটিকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে এবং যে সকল প্রাণীর ওপর নির্ভর করে এই বাঘ বাঁচবে তাদর সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ,—অর্থাৎ অরণ্যের উদ্ভিদ ও অপরাপর প্রাণী-জগত নিয়ে সৃষ্ট এক বিরাট অথচ জটিল-সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়কারী ব্যবস্থার মধ্যেই এই ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ছে যে, আমাদেরই ক্ষমাহীন অবহেলার ফলেই এক সময়ে আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো, যখন জাভা-দেশের গণ্ডার ও বন্য-মহিষ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। সেই দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে রেখেই সুন্দরবনের বাঘকে অবহেলার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে এই বলিষ্ট পদক্ষেপ—অর্থাৎ 'ব্যাঘ্র-প্রকল্প' রচনা করা হয়েছে। আরও একটা কথা,—সুন্দরবনের বাঘ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে যে এই বাঘ নাকি জন্মসূত্রেই মানুষ খেকো। কিন্তু

সুন্দরবনের বাঘ-সম্পর্কে এই ধারণা যে অভ্রান্ত নয় পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে এখানকার ব্যাঘ্রকুলকে আচরণগতভাবে নিম্ন বর্ণিত বিভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে :

১. **পুরোপুরি ও মতলববাজ মানুষ খেকো :** সুন্দরবনের বাঘের শতকরা পঁচিশ ভাগ এই পর্যায়ভুক্ত। এরা মানুষ দেখা মাত্রই ছুটে যায় এবং আক্রমণ করে। মৃত মানুষের শতকরা সত্তর ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

২. **মতলবহীন মানুষ খেকো :** সুন্দরবনের বাঘের শতকরা মাত্র পনের ভাগ এই পর্যায়ভুক্ত। যখন মানুষেরা বাঘেদের আবাসস্থলে গিয়ে উপদ্রব করে তখনই কেবল এরা আক্রমণ করে। মনুষ্য-মৃত্যুর শতকরা মাত্র কুড়ি ভাগ এই শ্রেণীর বাঘের দ্বারা সংঘটিত হয়।

৩. **অবস্থাভেদে মানুষ খেকো :** সুন্দরবনের মোট ভাগের শতকরা মাত্র ষাট ভাগ এই শ্রেণীতে পড়ে। এই সব বাঘের মানুষ খাওয়ার প্রবৃত্তি সাধারণত আবাসস্থলের অবস্থার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। স্বাভাবিক শিকারের অভাব বা পছন্দমতো প্রাণী শিকারের অক্ষমতা বা অন্যান্য ঘটনার কারণে এই স্বভাবের বাঘেরা মানুষকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ফলে, এরা নিজেদের বাসস্থল ছেড়ে লোকালয়ে আসে এবং গবাদি প্রাণী বা মানুষ শিকার করে। এই শ্রেণীর বাঘের দ্বারা নিহত মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসাবে মাত্র দশ ভাগ। ভিন্ন ভিন্ন তথ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, কোন বাঘের নরখাদক হওয়ার পেছনের কারণ নিম্নরূপ :

ক. শারীরিক দুর্বলতা, বৃদ্ধবয়স প্রভৃতির জন্য স্বাভাবিক শিকার গ্রহণে অক্ষমতা [দ্র. করবেট এবং পাওয়েল ১৯৫৭]।

খ. অপরাপর শিকারযোগ্য খাদ্যের অভাব [দ্র টারনার ১৯৫৯]

গ. পিতা-মাতার কাছ থেকে মানুষ খাওয়ার অভ্যাস বংশানুক্রমে পাওয়া [দ্র. আণ্ডারসান ১৯৫৪]

ঘ. অনিচ্ছা বা অবস্থাভেদে কোন মানুষকে মারার পর তার মাংসের স্বাদ ভাল লাগা [দ্র করবেট ১৯৫৭]।

ঙ. পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহ পরিষ্কার করার পর সেই জীবন্ত-প্রাণীটির ওপর নজর পড়া [দ্র. টেলর ১৯৫৭]।

বাঘদের বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তিনটি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন :

অ. যথেষ্ট পরিসরবিশিষ্ট আশ্রয়স্থল। আ. যথেষ্ট পরিমাণ অ-লবণাক্ত জল এবং ই. যথেষ্ট সংখ্যক শিকারযোগ্য প্রাণী।

সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণ আশ্রয়স্থল ও শিকারযোগ্য প্রাণীর অভাব নেই; কিন্তু অলবণাক্ত জলের নিতান্তই অভাব। এই লবণ-বিহীন জল যতটুকু পাওয়া যায় সেটা হলো বৃষ্টির জল এবং তাও একটি বিশেষ সময়ে। এ-বিষয়ে পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণায় নিম্নবর্ণিত তথ্যের আভাষ পাই:

১. সুন্দরবনের বাঘের মানুষ খেকো অভ্যাস ও ভয়াবহতার সঙ্গে জলে নুনের ভাগের তারতম্য এবং জোয়ারের জলের ওঠা-নামার একটি ধনাত্মক, স্পষ্ট এবং নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে।

২. একটি ঋণাত্মক বা বিপরীতধর্মী সম্পর্ক পাওয়া গেছে মানুষ খেকো স্বভাবের বাঘ ও উদ্ভিদ এবং প্রাণী-সমূহের বৈচিত্র্যের সঙ্গে।

৩. সুন্দরবনের নদী-নালার জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকায় এবং সেই লবণাক্ত জল বাঘ গ্রহণ করার ফলেই হয়তো ওদের শরীরে পরিবর্তন আনতে পারে যকৃৎ ও মূত্রনালীর পরিবর্তনের মাধ্যমে।

সুন্দরবনের নদী-নালার জোয়ার-ভাটার ওঠা নামা সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জোয়ার-ভাটার ওঠা-নামার সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রদত্ত সারণির মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

উক্ত যে সারণি এখানে তৈরী করা হয়েছে তার থেকে সুন্দরবনের বাঘের মানুষ শিকার সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্যের আভাষ পাওয়া যায়। ঐ তথ্যগুলি এইরকম:

ক. ৩৬ থেকে ৪৫ বৎসর বয়স্ক মানুষের বাঘের কবলে পড়ে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। তবে কি বাঘ সবচেয়ে সবল লোককে আক্রমণ করে? এ-সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

খ. এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশী মানুষের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটে। এর কারণ অবশ্য সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ আরম্ভ হয় এপ্রিল মাস থেকেই এবং এই মাসেই মধু সংগ্রহকারীরা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় বনে গিয়ে থাকেন।

গ সকাল ৬টা থেকে ৮টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৫টার সময়ই মানুষের মৃত্যুর হার দিনের অন্যান্য সময়ের থেকে অনেক বেশী। কারণ, এই দুই

সময়ে কাঠুরে, মৌলে, জেলে প্রভৃতি হয় বনে প্রবেশ করে, না হয় বন থেকে বেরিয়ে আসে। আর যেহেতু বাঘেরা মানুষের আচার-ব্যবহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত সেই জন্যে তারা সুন্দরবনে প্রবেশকারী মানুষদের সব থেকে দুর্বল সময়টিকেই বেছে নেয় আক্রমণ করার জন্যে। তাই হয়তো রাত এগারটার সময় বাঘেরা নৌকা থেকে মানুষ তুলে নেওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে। কারণ, জেলে মৌলে বা কাঠুরেরা ঐ সময়ে সারাদিনের পরিশ্রমের পর অঘোরে ঘুমায় এবং বাঘেরা সেটা উপলব্ধি করেই এই পথ অবলম্বন করে থাকে।

সুন্দরবনের জল-কাদা ও অসংখ্য শুলোয় ভরা জঙ্গল এখানের বাঘদের অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি প্রাণী হিসেবে গড়ে তুলেছে। বাঘ সাধারণত রাত্রে শিকার করায় অভ্যস্ত, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘেরা এর ব্যতিক্রম। মানুষ শিকারের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের বাঘ রাত অপেক্ষা দিনেই শিকার করা বেশি পছন্দ করে। কেন না, হিসেবে দেখা গেছে যে রাতে নিহত মানুষ মোট মানুষ শিকারের শতকরা মাত্র বার ভাগের মতো।

সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাঁতারে দক্ষ এবং মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। সুন্দরবনের বাঘ মৌচাক ভেঙ্গে মধু খেয়ে থাকে এবং সে-সময় নাকি এরা তাদের শরীরকে বালি ও কাদা মাখিয়ে নেয়—মৌমাছির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

এরা মাথার খুলি সমেত মানুষের শরীরের সমস্ত হাড় খেয়ে ফেলে। বৃদ্ধ বাঘের পাকস্থলী থেকে পাখীর পালকও পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের বাঘ সাধারণত মানুষকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ও ঘাড়ের দক্ষিণ দিকে প্রথমেই গভীরভাবে আক্রমণ করে, যার ফলে আক্রান্ত মানুষটি সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ ঘটনাও বিরল নয় যে একটি বাঘ কোন এক বিশেষ স্থানে দুই থেকে তিন জন মানুষকে আক্রমণ করেছে। বাঘ মানুষের পাকস্থলী প্রথম আহার করে ও তারপরে শরীরের অন্যান্য অংশ খায়। এখানকার বাঘের সামগ্রিক মানুষ শিকারের মধ্যে শতকরা আঠাশটি ক্ষেত্রে মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যা এখানকার বাঘের মানুষ হত্যার ভয়াবহতার চিত্রটিকেই প্রকট করে তোলে, যার মধ্যে দিয়ে তাদের মানুষ খাওয়ার স্থির সঙ্কল্পের কথাই বোঝা যায়।

সুন্দরবনের বাঘের ব্যবহারগত একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা স্রোতের

সঙ্গে সমকোণ তৈরী করে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত—এবং এ-সময়ে স্রোত যতই শক্তিশালী হোক না কেন! এ-ছাড়াও কোন মৃতদেহ মাটিতে পোঁতা থাকলে তা মাটি খুঁড়ে এনে খাওয়ার নজীরও সুন্দরবনের বাঘের ক্ষেত্রে আছে। সুন্দরবনের বাঘেরা চিতল হরিণ অপেক্ষা বন্য বরাহকে খাদ্য হিসেবে বেশী পছন্দ করে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় দশ কিলোগ্রামের মতো মাংস একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘের আহার হিসেবে প্রয়োজন হয়। এখানকার বাঘের একটি অভিনব ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য এই যে এরা নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই গুণটি তাদের অনন্য। এবং এরই জন্যে এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিশেষভাবে সক্ষম হয়েছে। তাই মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ভীষণ লবণাক্ত জল গ্রহণ করেও 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' তীক্ষ্ণ শুলোয় ভরা সুন্দরবনের জঙ্গলে নিজেদের স্বকীয়তা সগর্বে প্রকাশ করে চলেছে। এর সঙ্গে যদি মানুষের সহনশীলতা ও বিচারবোধ যুক্ত হয় তবে এই প্রাণীটি অনাগত কাল ধরে তাদের অপ্রতিহত অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

প্রকৃতির এক অভিনব সৃষ্টি সুন্দরবনের এই বাঘ—'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। এদের বুদ্ধি, চাতুর্য, মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান এক আকর্ষণীয় পশু-কাহিনীর জীবন্ত নায়কের মর্যাদায় এদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ খেকো বাঘ সম্পর্কে আমাদের কুসংস্কার এদের ওপর বহু অতি-প্রাকৃত গুণাবলী আরোপ করতে সহায়তা করেছে। তাই সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশের আগে বাউলী [কাঠুরে], মৌলে [মধুসংগ্রহকারী] বা জেলেরা দক্ষিণরায়, নারায়ণী মা, বনবিবি, কালু খাঁ, শা জঙ্গলী, গাজী সাহেব প্রভৃতির পূজা অর্চনা করেন এই বিশ্বাসে যে, ঐ সব দেবতাদের পূজাই কেবল সুন্দরবনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর শত্রুর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এ-সব সত্ত্বেও যখন কোন হতভাগ্য বাঘের কবলে পড়েন, তখন তাঁরা সেই প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না। তাঁরা এর জন্যে তাঁদের ভাগ্যকেই দায়ী করে থাকেন ও অতঃপর সেই মহাশক্তিধর ব্যাঘ্র-রাজ্যে আবার সানন্দে প্রবেশ করেন; পূজা-অর্চনা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে মনের শক্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন; ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করার উদ্যোগ নেন। তাই সুন্দরবনের বাঘ এ-অঞ্চলের মানুষের কাছে শিব ও অশিব দুয়েরই জীবন্ত প্রতি-মূর্তি, যার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না। এই কারণেই এখানকার মানুষের জীবন-দর্শনে এই বাঘ এক এবং অদ্বিতীয়। কারণ, সুন্দরবনের বাঘকে যেমন

সুন্দরবনের মানুষ থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনিই সুন্দরবনের মানুষকেও সুন্দরবনের বাঘ থেকে পৃথক করে ভাববার কোন উপায় নেই। কালান্তক মৃত্যু সদৃশ বাঘ ও জীবনবাদী মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের এমন প্রত্যক্ষ নিদর্শন সভ্য-পৃথিবীতে প্রায় দুর্লভ বলেই মনে হয়। অধিকন্তু 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' সুন্দরবনের মানুষকে সংহার করুক না কেন, এখানকার মানুষের কিন্তু এই বাঘ সম্পর্কে কোন ক্ষোভ নেই;—কারণ, 'মানুষখেকো, সম্পর্কে তারা অচ্ছেদ্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী।



দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ

শ্রীসনৎ কুমার মিত্র

এক.

আমার এই প্রবন্ধটির আগে মুদ্রিত করে রেখে আসা আলোচনাগুলি বঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাসকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে। পুরাতন এবং একেবারে সম্প্রতি যত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সমস্তগুলিকে সমাজ-ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে সেখানে নিরীক্ষিত হতে আমরা দেখলাম। আমার এই প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ যতখানি সম্ভব এড়িয়ে নিম্ন দক্ষিণবঙ্গের বাঘ এবং তৎ-সম্পর্কিত দেবদেবী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। এবং দীর্ঘদিন ধরে নিম্ন-দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষেত্রানুসন্ধান করে যত তথ্য পাওয়া গেছে এখানে তাদের উপস্থিত ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্র-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজন দেব-দেবী অবস্থান করছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনকে নির্বাচন করে নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করলেই আমাদের মৌল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে মনে করি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে বসে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে চারজন ব্যাঘ্র সম্পর্কিত লোক-দেব-দেবীর পরিচয় ঘটছে। যেমন: ক. বনবিবি। খ. দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরাজ। গ. বড় খাঁ গাজী বা বড গাজী খান।[১] ঘ. বারা মুণ্ড।[২]

এখন আমরা একে একে এঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

দুই: বনবিবি

বনবিবি। ব্যাসবাক্য নিষ্পন্ন করে এই পদটির অর্থ পাওয়া যায়: 'বনের বিবি' অর্থাৎ অরণ্যের— জঙ্গলের যিনি বিবি। এর মধ্যেকার প্রথম পদটির বাংলা— অর্থ গাছ-পালা-বৃক্ষাদির ঘন-সমাবিষ্ট অঞ্চল। এবং দ্বিতীয় পদটি বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে আগন্তুক বিদেশী ফারসী শব্দ। যার অর্থ: 'মুসলমানের কুলবধূ বা কুলীন স্ত্রী; মুসলমান মহিলা; মুসলমানের স্ত্রী বা স্ত্রীলোক; মুসলমানের বিবাহিত কন্যা [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গীয় শব্দকোষ': পৃ. ১৫৫৬]।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই 'বনবিবি' নামটির মধ্যে দুই ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিষয়টিকে সূত্রাকারে দাঁড় করালে আমাদের উক্ত বক্তব্য যে চেহারা নেয়, তা এই রকম ঃ

বন+দেবী [চণ্ডী বা দুর্গা বা ষষ্ঠী যাই হোক না কেন] ঃ হিন্দু।

বন+বিবি [মুসলমান]।

∴ বন+দেবী [হিন্দু]+বিবি [মুসলমান]।

কিন্তু এই মত সম্পর্কে বিবুধজনের মতামত অভিন্ন নয়। আমরা পরে সেই সব মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার আলোচনা করেছি।

বনবিবি। দক্ষিণবঙ্গের বা বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ দিকস্থ সদর [আলিপুর]-সহ ডায়মণ্ডহারবার, বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমার প্রায় সমস্ত থানাতেই এই লোক-দেবী পূজিত হয়ে থাকেন। সুন্দরবনের খুলনা জেলার [অধুনা 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র] দক্ষিণাংশ বা তাকে ছাড়িয়েও এই দেবীর পূজা প্রচলিত আছে।[৩]

বনবিবি। এই লোক-দেবীর আকৃতি উগ্র বা রুক্ষ নয়। স্বভাবে ইনি প্রতিহিংসাপরায়ণা বা মনসার মতো ক্রুর [malignant type of deity] নন। 'ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট-রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে' রূপে এঁকে কোন সময়েই দেখা যায় না। তাই ভক্তদের সঙ্গে এঁর প্রীতি-ভালোবাসা ও অভয়দাত্রীর সম্পর্ক। ইনি দয়াবতী ও ভক্তবৎসলা। এই কারণেই বোধ হয় মূর্তিশিল্পীরা যখন এঁর মূর্তি কল্পনা করেছেন তখন এঁকে সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী রূপেই কল্পনা করেছেন [দ্র. আলোকচিত্র ঃ পৃ. ৭]। ক্ষেত্রগবেষণার কালে বনবিবির মূর্তির রূপ-ভেদ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ঃ **ক.** কোথাও অবাঙালী মুসলমান নারীর পোষাক পরিহিত মূর্তি। অর্থাৎ বুনো ফুল-লতা-পাতা আঁকা জরির টুপি মাথায়। চুল বিনুনী করে বাঁধা, ওপর কপালে টিকলি ঝুলছে। গলায় সোনা-পুঁতি ও বনফুলের মালা পরে আছেন। নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা বা পাজামা এবং উপরাঙ্গে শালোয়ার। দু-কাঁধের ওপর থেকে মলমলের ওড়না মালার মতো ঝুলে পড়ে বক্ষোদেশ আবৃত করেছে। হাতে সাধারণত কোন প্রহরণ দেখা দেখা যায় না। তার পরিবর্তে এক হাতে একটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে আছেন—অন্য হাতে বরাভয় বা একটি ফুল ; অথবা আশা বাড়ী বা ঝাণ্ডা। আবার কোথাও বা শিশুর পরিবর্তে এক হাতে বরাভয় এবং অন্য হাতে ফুল।

এঁকে কোথাও বাঘ, কোথাও বা মুরগীর ওপর আসীন দেখা যায়। অর্থাৎ বাহন বাঘ অথবা মুরগী যে-কোন একটা হতে পারে।[8] খ. বনবিবির হিন্দু ধারণায় তৈরী দেবী মূর্তির আলোকচিত্র আমরা এই গ্রন্থের সূচনায়, সাত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করে দিয়েছি। তাই আর বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না। কেবল কোন কোন স্থানে কোলে শিশু মূর্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়. এই মাত্র।

এই হিন্দু বা মুসলিম রীতিতে নির্মিত বনবিবির মূর্তি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা দরকার। ১. কোন অঞ্চলে হিন্দু রীতির বা মুসলমান রীতির অবস্থান[৫] সেই জায়গায় হিন্দু বা মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের বসবাসের কম-বেশীর ওপর নির্ভর করে নি বা করছে না। সরেজমিনে অনুসন্ধান করলে এই সত্য প্রমাণিত হতে পারে সহজেই। এ-ছাড়া বনবিবি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই উপাস্যা। সুন্দরবনের অরণ্যে উভয়কেই জীবিকার প্রয়োজনে প্রবেশ করতে হয়—এবং সুন্দরবনের আতঙ্ক উভয়কেই সমানভাবে প্রপীড়িত করে। তাই ভক্তরা যে যেখানে যেমনভাবে পেরেছেন তেমনি ভাবে আপন হৃদয়ের ভক্তি-বিশ্বাস দিয়ে এই দেবীর মূর্তি নির্মাণ করেছেন। এবং সুন্দরবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ জীবন-যাপনের প্রয়োজনে সেই দেবী-মূর্তির পায়ে আপন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ফলে, এখানে মুসলমান নারীর অনুকরণে দেবীমূর্তি নির্মিত হয়েছে—অতএব এখানে মুসলমানের বাসাধিক্য, আবার ওখানে হিন্দু দেবীর মতো করে বনবিবির মূর্তি তৈরী হয়েছে—অতএব ওখানে হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় বাস করেন—এমন মন্তব্য করা সঙ্গত হবে মনে করি না। ২. বনবিবির মূর্তি পরিকল্পনা রীতিমত অর্বাচীন। আদিতে এই লোক-দেবী অন্যান্য লোক-দেবীর মতোই ছিলেন মূর্তিহীন। এখনো সুন্দরবনের বহু বন-বাদা-অঞ্চল দেখা যায় যেখানটা কেবলই মা-বনবিবির থান নামে পরিচিত। সেখানে কোন মূর্তি নেই—মন্দির নেই—এমন কি সামান্য একটা বেদীও নেই। অর্থাৎ নিরবয়ব একটি জঙ্গল ও হিংস্র প্রাণী পরিপূর্ণ দ্বীপই মা-বনবিবির থান বা জঙ্গল নামে পরিচিত। সুপ্রাচীন সুন্দরবনের অতি পুরাতন ভয়ঙ্করতা আদিতে কোন মূর্তি লাভ করে নি। তাঁর আজ পর্যন্ত প্রচলিত মূল পূজা-পদ্ধতি[৬] আমাদের এই বক্তব্যকে প্রতিপাদন করে। সুন্দরবনের আদি প্রবেশকদের প্রথম ও প্রধান যে ভয়ের মুখে দাঁড়াতে হয়েছিল,—তা হচ্ছে বাঘের ভয়। এই ভয়ানক বাঘকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তাদের সেদিন কিছু খাদ্য এগিয়ে দিতে হয়েছে। সেই খাদ্য প্রথম স্তরে ছিলো

প্রধানত মানুষ ; পরবর্তীকালে বা অভাবে মনুষ্যেতর কোন জীব। সুন্দরবনে বাঘের মুখে পরিত্যক্ত দুখের দুঃখ নিয়ে রচিত কাব্য অর্বাচীন হলেও এর মৌল মানসিকতার প্রাচীনতা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় স্তরে মুসলমান আধিপত্যের পরে বনদেবী বনবিবি-তে রূপান্তরের অনুষঙ্গে এসেছে মুরগী 'বলি' বা 'উৎসর্গ'।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আদি নিরাকার আরণ্যক [sylvan] ভয় ধীরে ধীরে এক লৌকিক দেবী-ভাবনার সৃষ্টি করেছে ; যার ওপর প্রথমে হিন্দু ও পরে ঐসলামিক সংস্কৃতি সমন্বিত হয়ে বনবিবির আকারকে গঠিত করেছে। এ-প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন , তা হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজা বা পীর বা গোর-পূজা শরিয়তী ইসলাম বিরোধী কাজ। এ-সম্পর্কে প্রকৃত মুসলমান এই ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন : 'সুন্দরবনাঞ্চলের এক শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক, বিশেষ করিয়া অজ্ঞ সমাজ বনবিবি ও গাজীর নামে দোহাই দেয়। হিন্দুরা এই আরাধ্য দেবতাদের নামে পাঁঠা বলি দিয়া থাকে, গাজীর দরগায় সিন্নী মানত করিয়া তাঁহার গায়েবী সাহায্যের আশা রাখে। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত দরগায় শরিয়ত বিরোধী কার্য অবাধ ভাবে চলিয়া থাকে। মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া সাধারণ মানুষ গাজী বা কল্পিত নারী বনবিবির সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। এইভাবে বিপদে আপদে পীর দরবেশ ও গাজীদের সাহায্যের জন্য মানুষ আশা করিয়া থাকে। এবম্বিধ কুসংস্কার ও ধর্মবিরোধী কাযসমূহ সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষকে গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতেছে। পীর পূজা ও গোর পূজার কবে অবসান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই'।[৭]

সাধারণ মানুষ, দীন-দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ, ক্ষুধার জ্বালায়, জীবন-ধারণের প্রশ্নে ধর্মের নিষেধ কানুন-বিধি-বিধানের দিকে না থাকিয়ে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক যৌথ জীবন-চেতনার অংশীদার হয়ে, অধিকাংশের গৃহীত দৈবী আশ্রয়ের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাতে হিন্দুত্ব কতখানি রইলো বা মুসলমানের শরিয়ত কতখানি নষ্ট হলো তার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এবং এখানেই লৌকিক ধর্মের বিশেষত বাংলার লোকাচারের সার্বজনীনতা বা অসাম্প্রদায়িক চরিত্র-পরিচয়ের শক্তি নিহীত।[৮]

বনবিবি। বনবিবির পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ বা বার-তিথি নেই। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের জন্য প্রবেশের আগে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে কেউ

কেউ পূজা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। আবার কেউ কেউ বা বনের কাজ সুষ্ঠু ভাবে নিরাপদে সেরে এসে বেশ ঘটা করে পূজা দেন,—বনবিবির যাত্রা-পালার ব্যবস্থা করেন। চৈত্র-বৈশাখ-আশ্বিন-মাঘ প্রভৃতি মাসে বনবিবির পূজা হয়। কোন মাসের যখন ঠিক নেই, তখন কোন নির্দিষ্ট তিথিও অনুসরণ করে বনবিবির পূজা হয় না। দিনে, রাতে—যখন সুযোগ বা অবসর হয় তখনই এই দেবীর পূজা করা যেতে পারে। অনেকে বনবিবির রাজ্যে প্রবেশের আগে মুরগী উৎসর্গ করে থাকেন—অথবা মনে মনে মানসিক করেন যাতে নিরাপদে কার্য উদ্ধার হয়। এবং ফিরে এসে মানসিক মতো থানে বা বারোয়ারী ভাবে পূজা করে মানস-প্রতিজ্ঞা থেকে উদ্ধার লাভ করেন। নির্দিষ্ট সময়হীন এই পূজা, মূর্তিযুক্ত বা মূর্তিহীন, 'থান'-হীন বা 'থান'-যুক্ত অথবা একটা গোটা জঙ্গল বা জনমানবহীন দ্বীপকে বনবিবি বা তাঁর অধিষ্ঠান ভূমিরূপে কল্পনার মধ্যে লৌকিক দেবতা [দেবী] ভাবনার পরিপূর্ণ রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

বনবিবি। বনবিবির পূজা রীতিটিও লৌকিক স্তরকে অতিক্রম করতে পারে নি। প্রথমত, উপচার। ক. পাঁঠা বলি। খ. মুণ্ড ছিঁড়ে মোরগ-মুরগী বলি বা মা বনবিবির নামে মোরগ-মুরগী ছেড়ে দেওয়া। এই ছেড়ে দেওয়া মোরগ-মুরগীদের সাহায্যে সুন্দরবনের জঙ্গলের মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য অসংখ্য বন-মোরগের সৃষ্টি হয়েছে। গ 'বেদীর সামনে কিছুটা জায়গা নিকানো। সেখানে নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা পেতলের গামলায় সিরণী। সাদা বাতাসা, কদমা, পাটালি গুড়, ফলমূল রয়েছে বিভিন্ন থালায়'।[৯] দ্বিতীয়ত, এই পূজায় কোন মন্ত্র নেই। কোন পুরোহিত লাগে না। বনবিবির মাহাত্ম্যসূচক গানই এঁর মন্ত্র—এঁর গায়ত্রী বা পূজা পদ্ধতি। কোথাও কোথাও এই পূজা উপলক্ষে 'ধনা-মনার পালা' বা 'মা-বনবিবি-দুখে'র কাহিনী অবলম্বনে গ্রাম্য যাত্রা অভিনীত হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, যেখানে বনবিবির মূর্তি গড়ে অস্থায়ী ভাবে পূজা হয় সেখানে, সেই মূর্তি, জঙ্গলের ডালপালা ভেঙ্গে যে অস্থায়ী চালার মধ্যে রাখা হয় তা ঝড়-জল-রোদ্দুরের আক্রমণে ধীরে ধীরে মাটিতে মিশিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পড়ে থাকে কটা খুঁটি, একটা বাঁশ-খড়ের কাঠামো। সে পথ দিয়ে যেতে যেতে কেউ একটা প্রণাম ঠোকে, কেউ বা মা-বনবিবির নাম নিয়ে তাঁর দোয়া মাগে।

বনবিবি। এখন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে যে এই বনবিবি কে? তাঁর প্রকৃত স্বরূপ-পরিচয় কি?

প্রবীণ গবেষক শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এই স্বরূপ-পরিচয় উদ্ঘাটনে নানা মুনির নানা মত একত্র সংকলন করে যে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন তা এই রকমঃ 'বনবিবির স্বরূপ সম্বন্ধে লোক-সংস্কৃতি বা লৌকিক দেবতা বিষয়ে গবেষক এবং তাঁর পূজা অঞ্চলের ভক্তদের নানারূপ ধারণা আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি ঃ

১. ইনি হিন্দুদেবী-বনদুর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী ; মুসলমান প্রাধান্যকালে বনবিবি হয়েছেন।

২. হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্বিত বা মিশ্রিত অরণ্যদেবী।

৩. ইনি আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা ছিলেন, সে কারণে প্রথমে মুসলমান সমাজে বহুজন পূজ্য হন, পরে ভক্তি প্রাবল্যে দেবী পদে উন্নীত হন। এই দেবীর পূজার উৎপত্তি কেন্দ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা [বা দক্ষিণ খুলনা জেলা] অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকায় বা সহাবস্থানের ফলে ঐ উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হন—বর্তমানে তাহাই আছেন।

৪. আদিম যুগে শ্বাপদসঙ্কুল বনরাজ্যের অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা ভীতির কারণ ছিল ব্যাঘ্র, এই ব্যাঘ্রকুলের তুলনায় মানুষের শক্তি যথেষ্ট নয় তারা বুঝতে পেরে নানাপ্রকার যাদু প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাঘ্রের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার দৈব উপায় একটা কল্পনা করতে থাকে—আদিম সমাজে ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে পূজা বা ব্যাঘ্র পূজা এইভাবে প্রবর্তিত হয়। পরে ব্যাঘ্রের অধিষ্ঠিতা দেবতা যখন কল্পিত হয়, সে সময় ঐরূপ দেবতাদের মূর্তি বা প্রতীকের প্রচলন হতে থাকে বা বন অঞ্চলের দেবতারা ব্যাঘ্রদের অধিদেবতা বলেও পরিকল্পিত হতে থাকে।

বনবিবি যে আদিতে বনদেবী তা বর্তমানেও এঁর মূর্তি ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে ধরা পড়ে। এখনও এঁর আকৃতি ও বেশভূষায় অরণ্য-বৈশিষ্ট্য [Sylvan characteristic] একেবারে লোপ পায় নি'।[১০]

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলো। কারণ, গোপেন্দ্রবাবু নানা ধরণের মত একত্র সংকলিত করে রেখেছেন। এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই আমাদের সামনে সত্যমূর্তিতে বনবিবি প্রকটিত হতে পারবেন।

প্রথমত, ইনি কি কোনোভাবে 'দুর্গা' দেবী ধারণার সঙ্গে সংযুক্তা ? আমরা জানি যে, দুর্গা আর্যদেবতা। এ-সত্ত্বেও কিন্তু 'ঋগ্বেদে বর্ণিত স্ত্রীদেবতাগুলির কোনোওটিকেও কেন্দ্র করিয়া শক্তি উপাসনা অগ্রগতি লাভ করে নাই'। কেন না আমরা জানি যে 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের প্রথম অনুবাকে……

দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম দুর্গা বা দুর্গি এবং তাঁহার আরও কতকগুলি নাম-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়'। এবং তাতে তাঁর [দুর্গার] যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা এই রকম : 'অগ্নিবর্ণা তপ্তপ্রদীপ্তা সূর্য [বা অগ্নির] কন্যা, যিনি কর্মফলের [পুরস্কার প্রদানের জন্য লোকদিগের দ্বারা] প্রার্থিত হন, এমন দুর্গাদেবীর আমি শরণাপন্ন হই ; হে সুন্দর রূপে ত্রাণকারিণী, তোমাকে নমস্কার'।[১১] এছাড়াও বলা হচ্ছে যে : ক মূল রামায়ণে শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। খ. শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধার্থে অকালে দুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তা কৃত্তিবাস কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা সঠিক করে বলা যায় না। গ. মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের উল্লেখ থাকলেও সেগুলি প্রায়ই কিংবদন্তীমূলক। ঘ পণ্ডিত E. W. Hopkins-এর অনুসরণে এরকম অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে দেবীর পূর্ণ রূপ বিকাশের কাল খ্রীস্টাব্দ প্রবর্তনের সমসাময়িক।[১২]

রূপদী দুর্গার স্বরূপ ও ভাবনার মধ্যে কিন্তু কোন অরণ্যক [sylvan] প্রভাব নেই। কারণ, যিনি 'বনদুর্গা' বা বনের দুর্গা তিনি আদিম 'বৃক্ষ পূজা' [tree worship]-র সঙ্গে যুক্ত হলেও হতে পারেন। এর নাম 'বনদুর্গা' হলেও অরণ্য-প্রকৃতি বা তার পরিমণ্ডলে সৃষ্ট যে সংস্কৃতি তার সঙ্গেও এর যোগ ক্ষীণ। এমন কথা বলার পেছনে আমাদের যুক্তি, এর পূজাচার, পদ্ধতি-স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী ইত্যাদিকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে।[১৩]

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে : ১. আর্য 'দুর্গা'র সঙ্গে বনবিবির কোন সম্পর্ক নেই। ২. 'বনদুর্গা'র সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই ['তবে দক্ষিণবঙ্গের বনবিবি বা বিবিমা হইতে ইনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবতা'। কামিনীকুমার রায়]।

দ্বিতীয়ত, বনবিবি 'বনচণ্ডী'র সঙ্গেও সংযুক্তা এমন কথা কি বলা যায়? তথ্য অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে :

১. 'চণ্ডী' এই শব্দটিই আর্য সংস্কৃতির বাইরের জিনিষ। এ-বিষয়ে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলছেন : "বৈদিক দেবদেবীর মধ্যে চণ্ডী নামক কোন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়

না। কিন্তু দুর্গা, উমা, কালী,………ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এমন কি. 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত শক্তিদেবতার নামের তালিকার মধ্যেও চণ্ডী নামটির উল্লেখ নাই,……আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, যেমন, 'দেবী-ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীর নাম উল্লেখিত আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হইলেও, ইহাদের যে সকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার উল্লেখ আছে, তাহা যে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়'। ড. ভট্টাচার্য ঐ গ্রন্থেই আরও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: 'চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করিয়াছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবতঃ অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত'।[১৪]

এই অনার্য জন্ম-পরিচয় নিয়ে 'চণ্ডী' উঠে এলেন উচ্চতর সমাজে। অনার্য. লৌকিক, আর্য তিন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটলো 'চণ্ডী'র মধ্যে। এঁকে অবলম্বন করে এক বিশিষ্ট সাহিত্য, যার নাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'– রচিত হলো।

২. এই মিশ্র 'চণ্ডী' পরিচয়ের লৌকিকগুণের কিছুটা আর অনার্য আচরণের কিছুটা নিয়ে বাংলার লোক-জগতে 'বনচণ্ডী' নামে এক লোকদেবী [folk-goddess] জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হাওড়া. হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় সাধারণ লৌকিক চণ্ডীর নিয়মে, গ্রামসমাজের দ্বারা, আনাড়ম্বর উপচারে, বৎসরের যে কোন সময়ে [সাধারণত 'মঙ্গলবার'], অরণ্য-উপকূলে বা গ্রাম-সীমার বাইরে গাছের গোড়ায়, মূর্তিহীন ভাবে, প্রতীকে, প্রস্তর খণ্ডে বা ঘটে পূজা পেয়ে থাকেন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর সঙ্গে এঁর একমাত্র সাদৃশ্য যে উভয়ের মধ্যেই আরণ্য-গুণ [sylvan quality] বজায় আছে। এবং কেবল এখানেই 'বনবিবি'র সঙ্গে 'চণ্ডী' বা 'বনচণ্ডী'র সম্পর্ক।

তৃতীয়ত, এখন আমাদের আলোচ্য 'বনষষ্ঠীর সঙ্গে বনবিবির সাদৃশ্য প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে প্রথমেই আমাদের বক্তব্য এই যে বাংলা দেশে বছরের বারো মাসে যে বারোজন লৌকিক ষষ্ঠীদেবী যিনি একমাত্র স্ত্রী-সমাজ কর্তৃক পূজা পেয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে 'বনষষ্ঠী' নামে কেউ নেই। তবে 'অরণ্যষষ্ঠী'কে [তাঁর সর্বপ্রকার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পর] যদি 'বনষষ্ঠী' হিসাবে কেউ গ্রহণ করতে চান তা-হলে অবশ্য কিছু বলার থাকে না। অধিকন্তু এই বন বা অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের দেবী। এবং 'ইহার পূজা প্রকৃতপক্ষে কন্যার সন্তান লাভের

উদ্দেশ্যে জামাতার সম্বর্ধনা।'[১৫] তাই এঁর সঙ্গেও বনবিবির কোন দিক থেকে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে দক্ষিণ বঙ্গের যেখানে যেখানে হিন্দু পোষাকের বনবিবির মূর্তি দেখা যায় সেখানে [সর্বত্র নয়], কোন কোন মূর্তির কোলে 'দুখে' নামে যে শিশুকে দেখা যায় তাকে শিশুর দেবী ষষ্ঠী হিসাবে গ্রহণ করে 'বনষষ্ঠী'র সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় কি? কিন্তু এ-বিষয়ে কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন: **এক.** সুন্দরবনের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের বনবিবি-মা-কে সর্বত্র মূর্তিতে পূজা করা হয় না। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে উক্ত মূর্তি-পরিকল্পনা উচ্চতর হিন্দু সমাজের প্রভাবজাত ও অর্বাচীন। **দুই.** দুখের মূর্তির উপস্থিতি এই-ধরণের স্বল্প-প্রচলিত মূর্তি-পূজার মধ্যেও আবার খুবই কম। এবং **তিন.** যেখানে বনবিবি-মা-র মূর্তি মুসলমান রমণীর অনুরূপে নির্মিত সেখানে দুখের স্থান অত্যন্ত গৌণ। অতএব দুখে-কোলে বনবিবিকে মাতৃকামূর্তির অনুরূপে ষষ্ঠী বা বনষষ্ঠী বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

এখন উপরের আলোচনার সাহায্যে একটি ছক তৈরী করলে যা দাঁড়ায়:

বনবিবি

	স্থান ও কাল	উপচার	পূজা-পদ্ধতি	মূর্তি	ফল
দুর্গা	×	×	×	×	১
বনদুর্গা	×	*	×	×	×
চণ্ডী	×	×	×	×	২
বনচণ্ডী	*	*	×	×	×
ষষ্ঠী	×	×	×	×	৩
বনষষ্ঠী	×	*	×	×	৩

× কোন প্রকার সাদৃশ্য প্রায় নেই-ই বলা চলে।

* কোন কোন ক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু মিল দেখা যায়

[১]দুর্গার অন্যতম গুণ, ইনি ত্রাণকারিণী [দ্র. এই প্রবন্ধের ১১৪ পৃ.], বনবিবিও বাঘের আক্রমণ থেকে ত্রাণ করেন।

[২]চণ্ডী 'যোষিতামিষ্ট দেবতা' [খুল্লনার ছাগল ফিরিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমন্তকে তাঁর পিতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ইত্যাদি]। বনবিবিও দুখেকে তার মা-র কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

[৩]উভয়েই শিশুপালক বা রক্ষক। কোন কোন মূর্তিতে বনবিবির কোলে একটি শিশুর উপস্থিতি দেখে কেউ কেউ এঁকে ষষ্ঠীর সঙ্গে মেলাতে চাইতে পারেন—সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে।

বিশিষ্ট গবেষক ড. পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্যপ্রকাশিকা'-র চতুর্থ খণ্ড-এ দেখিয়েছেন যেঃ "তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাঘ্রবাহনা দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। অভিচারিকা দেবীর বাহন বহুস্থলেই ব্যাঘ্র-সিংহ প্রভৃতি।...অজ্ঞাতনামা রচয়িতার একখানি মনসামঙ্গলের পুঁথিতে দেবী চণ্ডিকাকে 'বাগবাহিনী' বলা হইয়াছে। 'শিবপুরাণে' দেবী কালীর বাহন, বাঘ 'সোমনন্দী'। ধর্মপুরাণে ধর্মঠাকুরের নিকট বলিস্বরূপ অজার বোহির্দ্বারে 'বাঘসেন'কে বসানো হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের বল্লুকাতীরস্থ মন্দিরের দ্বারী 'দীপক বাঘের' কাহিনী রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দ্বারকেশ্বর ও মুণ্ডেশ্বরী বা 'মুড়াহ' নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বাগদী পণ্ডিত-পূজিত ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের বেদীতে, ব্যাঘ্রবাহনা দেবী 'অম্বিকা চণ্ডী' অদ্যাপি নিত্য পূজিতা হইতেছেন। দক্ষিণরাঢ়ের কোন কোনও গ্রামের বনেদী গৃহস্থের গৃহদেবতা বাঁকুড়ারায় ও ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের বাহন বাঘ; দেবতা 'পঞ্চানন্দে'র বাহন 'বাঘেশ্বর'" [পৃ. ১৩৩]। এখনও বঙ্গের বহু বনেদী পরিবারের দুর্গা-প্রতিমায় দেখা যায় দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী।

অতএব এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে সুন্দরবনের অরণ্যভীতি [মূলত ব্যাঘ্রভীতি] যখন ধীরে ধীরে মূর্তি লাভ করেছে তখন বঙ্গীয় সংস্কারের সর্বস্তরের অসংখ্য দৈবী চেতনার তিল তিল উপাদান সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত দেব-দেবীদের সৃষ্টি করেছে—বনবিবি তাঁদেরই অন্যতমা। এবং মুসলমান আধিপত্যের প্রাধান্যের ফলে নয়, ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানেরা তাঁদের নবগৃহীত ধর্ম এবং পূর্বতন সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এক বনদেবীকে 'বনবিবি' করে নিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার মিশ্রিত বা সমন্বিত অরণ্যদেবী হিসাবে বনবিবিকে

গ্রহণ করার মধ্যে ঐতিহাসিক কালাসঙ্গতি [anachronism] লক্ষ্য করা যায়। কারণ, ১। সুন্দরবনের ইতিহাসকারদের মতেঃ 'অতি প্রাচীনকাল হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ...সুন্দরবন যে অতীব প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই'।[১৬] এবং এই প্রাচীনত্ব নিশ্চয়ই বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার [১২০৪ খ্রীঃ] অনেক পূর্ববর্তী। অতএব, ২। সেই পূর্ববর্তী কালেই সুন্দরবনের দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারের জন্য যে দেবভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে আর যে-ই উপস্থিত থাকুন, মুসলমান ধর্মচিন্তার কোন চিহ্ন ছিলো না। ফলে, ৩। ইসলামী ধর্মচিন্তা পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটি সমন্বয় সাধন করলেও, মিশ্রিত চিন্তার সৃষ্টি এই বনবিবি এমন কথা কি করে বলা যায় ?

এ পরের যে সিদ্ধান্ত তা ও ইতিহাসের বিচারে ধোপে টেঁকে না। কেন না, ক. বিবি-মা নাম্নী কোন পীরানা এই বনাঞ্চলে মুসলমান ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পীরদেব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক গবেষণা করেছেন যিনি—তিনিও এঁকে 'কাল্পনিক পীরগণের দলভুক্ত করেছেন।[১৭] খ. সুন্দরবন সুপ্রাচীন, তার আরণ্যভীতিও প্রাচীন, তাকে অবলম্বন করে সৃষ্ট দেবী-ভাবনাকেও অবাচীন হিসাবে গ্রহণ করার পেছনে কোন যুক্তিও নেই—সে-অবস্থায় কি ভাবে ঐতিহাসিক যুগের [১৩শ শতাব্দীর পরবর্তী তো বটেই] 'মুসলমান সাধিকা ও ইসলামধর্ম প্রচারিকা অভিজাত মহিলা' প্রথমে মুসলমানদের পূজা ও পরে হিন্দুদের পূজা পেয়ে দেবীত্বে উন্নীত হবেন ? এই গবেষণা ঘোড়ার আগে গাড়ী যুতে দেওয়ার মতো নয় কি ? গ. এই বনবিবির কাহিনী, তা যতই অবাচীন হোক এবং বাংলা মঙ্গলকাব্য ও বিশেষ করে রায়মঙ্গল কাব্যের অনুসরণে ও প্রতিপক্ষে রচিত হোক, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের বা সহাবস্থানের কোন পরিচয় রাখা অপেক্ষা দক্ষিণরায়ের হীন পরাভবের কথাই বিশেষ জোর দিয়ে বলে। ঘ. বর্তমান বনবিবি উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের দ্বারা সমানভাবে পূজনীয়া হলেও বাংলায় ইসলাম ধর্ম [রাজাও বটে] প্রচারের সূচনায় উভয় শক্তির সংঘর্ষ ঐতিহাসিক সত্য। 'বনবিবি' কাব্যে সেই সত্যই উপস্থিত—এবং সেই সংঘর্ষের শেষেই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তার পূর্বে সরল ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী দৈবীভাব প্রতিষ্ঠা বনদেবীর মধ্যে সম্ভব হয় নি। ঙ. বনবিবি-মা কেবল সাধিকা বা ধর্মপ্রচারিকা 'বিবি' নন। তিনি বনেরও

অধিশ্বরী। সেই আদি আরণ্য-চরিত্রকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ভক্তিভাব বা দেবীত্ব আসে কোথা থেকে? অতএব এই মতবাদও গ্রহণীয় নয়।

বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার করে দু-একটি কাব্য রচিত হয়েছে। এদের রচয়িতাদের মধ্যে বয়নদ্দিন, মুন্‌সী মোহাম্মদ খাতের এবং মোহাম্মদ মুন্‌সী-র নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব কেচ্ছা-কাব্যের মধ্যে বয়নদ্দীন রচিত কাব্যটি সর্বাধিক প্রচার পেয়েছে। এটির নাম 'বনবিবি জহুরানামা'। অন্যদের রচিত কাব্যের বিষয়বস্তুও প্রায় একই, পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। আমার সংগ্রহে যে ছাপা বইটি আছে তার আখ্যাপত্রটি এইরকম:

এলাহি / ভরসা / ছহি চাঁদ মার্কা ছাপা / বোন বিবী জহুরনামা / নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা / মরহুম মুন্‌সী মোহাম্মদ খাতের সাহেব / প্রণীত / গওসিয়া লাইব্রেরী / নূরুদ্দীন আহম্মদ / ৩০নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা / কলিকাতা—৭ / ৩০নং মদন মোহন বর্মণ স্ট্রীট / গওসিয়া লাইব্রেরী হইতে / নুরুদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক / প্রকাশিত

মূল্য—এক টাকা

এই কাব্যের মধ্যে দুটি কাহিনী: প্রথম নারায়ণীর জঙ্গ বা যুদ্ধ। এখানে দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর পৌর শক্তির সঙ্গে বনবিবি ও শা জঙ্গলীর যুদ্ধ হয়েছে। এই কাহিনী 'রায়মঙ্গলে'র কবি কৃষ্ণরাম-এর[১৮] অনুসরণ বা প্রতিরূপে রচিত। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ ধনা-দুখের পালা নামে পরিচিত। এটি মঙ্গলকাব্যের ঢঙে পৌরাণিক 'ধ্রুব-সুনীতির' আধারে রচিত।

এই কেচ্ছা-কাব্য গ্রন্থগুলির রচনাকাল খুবই আধুনিক। কাহিনীর উৎস-ভূমিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ওপারে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। এর মধ্যের প্রথম কাহিনীটির মূল ঘটনা অর্থাৎ সুন্দরবনের আঠারো ভাটি অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিয়ে হিন্দু শক্তির সঙ্গে বিরোধ। বাকী আর সবই কেচ্ছা-কাহিনী মাত্র।

তিন: বড় খাঁ গাজী বা বড় গাজী খান

ইতিহাসকারদের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায় [খ্রীষ্টীয় ১২০১ বা ১২০৪ অব্দে] গাজী ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী গৌড়-লক্ষ্মণাবর্তী অধিকার করেন। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বঙ্গদেশও হিন্দু ধর্মের প্রতিস্পর্ধী,—এ-দেশের পক্ষে নতুন, ইসলাম-ধর্মীয় শস্ত্র-শক্তির কাছে পরাভূত

হয়। ইসলাম কর্তৃক নতুন রাজ্য জয়ের পেছনে পেছনেই পীর-দরবেশগণ এদেশে আসতে থাকেন, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে। অবশ্য ইসলামী শাসক বা তাঁদের অনুচর কর্মচারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দ্বারা[১৯] বাঙালী হিন্দুদের মুসলমান করলেও পীর-দরবেশ-গাজীদের দ্বারাই ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ, যা তার ধর্মাদর্শ এবং সংস্কৃতিও বটে,—এ-দেশবাসীর মধ্যে প্রচারিত হতে থাকে। এখন এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা প্রথমেই 'পীর' ও 'গাজী' শব্দ দুটির তাৎপর্য নির্ণয় করে নেবো।

ক। **'পীর'** শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মুসলমান সিদ্ধ সাধুপুরুষ। এটি ফারসী শব্দ। বৃদ্ধ [জ্ঞান] বা প্রাচীন ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে ইনি মুসলমান সমাজে গৃহীত। এঁরা ছিলেন দেশে দেশে অ-মুসলমানদের মধ্যে ইসলামধর্মের প্রচারক। ইসলামধর্মের প্রকৃত পথ প্রদর্শক হিসাবে মান্য। "অনেকটা 'সদ্‌গুরুর' ন্যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে পীর মুসলমান সাধুপুরুষ, যিনি নানা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উপস্থিত বিপদ-আপদ, আধি-ব্যাধি দূর করিতে এবং বহুবিধ কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। মুসলমান রাজত্ব-কালে এদেশে এঁদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল"।[২০] এ-ছাড়াও পীরদের সঙ্গে ধর্মসূত্রে সেদিনের শাসকদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাঁরা বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি-শালীও হয়েছিলেন, এঁরা সন্তুষ্ট হলে জাতিধর্মনির্বিশেষে অনেকের উপকার করে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আদায় করতেন। যেমন ঘুটিয়া শরীফের পীর মোবারক বারুইপুরের ভূস্বামী মদন রায়কে নবাবের কোপ থেকে রক্ষা করেন।[২১] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'পীর' শব্দটির সঙ্গে যুগ্মভাবে অনেক সময় 'পয়গম্বর' [ফারসী। যেমন : পীর-পয়গম্বর] শব্দটি উচ্চারিত হয়। তার অর্থ হচ্ছে মাননীয়, ঈশ্বরের দূত, ভবিষ্যদ্বক্তা [**prophet**]।

খ। **'গাজী'** এটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : 'ধর্মের জন্য বিধর্মীদের বিজেতা মুসলমান বীরপুরুষ।' 'মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে বলে, যিনিই বিধর্মীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী। শাহ জালালের সময় [১২৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ][২২] হইতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে বহুজন এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ২টি শ্রেণী আছে—আউলিয়া ও গাজী। আউলিয়া ও ফকিরগণ শান্তিপ্রিয়, তাঁহারা যুক্তিতর্কে বা কৌশলে হিন্দু-বৌদ্ধকে নিজের ধর্মে টানিয়া লইয়াছেন ; গাজীদিগেরও উদ্দেশ্য এক, কিন্তু তাঁহারা বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই গাজী-

নামধারী রাজনৈতিক সন্ন্যাসিগণ প্রয়োজন মতো রাজার সাহায্যে সৈন্যসামন্ত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ এমন কি লুটপাট করিতেন। আউলিয়াগণ প্ররোচনায়, সাধুজীবনের আদর্শে এবং জনহিতৈষিতার পরিচয়ে কার্যসিদ্ধি করিতেন; কিন্তু গাজিগণ ছলে-বলে-কৌশলে-অবিচারে-অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন করিয়াছিলেন। গাজীদিগের মধ্যে যে কেহ কেহ সাধু ছিলেন না তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। ......সময়ে সময়ে গাজীদিগের মধ্যে জাতি নির্বিশেষে অতিরিক্ত দয়ালু লোক দেখা যাইত, এজন্য আমাদের দেশে কোন অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে 'দয়ার গাজী' বলিয়া থাকে"।[২৩]

অতএব এই পীর বা গাজী সম্প্রদায়ের সকলেই প্রত্যক্ষভাবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এবং আমাদের আলোচ্য 'রায়মঙ্গল' কাব্য-সমূহে তাঁদের ধর্মযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য, আচার-আচরণ ও কর্ম-পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। এমন কি একই ব্যক্তি একাধারে পীর ও গাজী। যেমন, ঘুটুরিয়া শরীফের পীর মোবারক গাজী। এখন প্রশ্ন এই যে: ১। দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্র দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে বড় গাজী খান বা বড খাঁ গাজী তার ঐতিহাসিকতা কি? ২। দেবমূর্তিতে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে পূজা পাচ্ছেন তার পেছনে মানসিকতা কি? এবং ৩। তিনি কি ভাবে ব্যাঘ্র বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

উক্ত প্রসঙ্গগুলি পর্যালোচনার আগে আমরা যদি বড খাঁ গাজীর মূর্তি-বর্ণনা, বিস্তার-ক্ষেত্র, পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির আলোচনা সেরে নিই তবে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা অনেকটা সহজ হবে বলে মনে করি।

প্রথম, গাজী সাহেবের মূর্তি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের পাঠকদের অনুরোধ করবো যে বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই আমরা বড় খাঁ গাজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত করে দিয়েছি [পৃঃ ৮],—সেটিকে দেখে নিতে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাজী সাহেবের মূর্তি সুশ্রী এবং বীরপুরুষের মতো যোদ্ধবেশে একটি বড় ঘোড়ার উপরে এক হাতে লাগাম ধরে অন্য হাতে ফুল বা ছড়ি বা বরাভয় নিয়ে আসীন। বুট জুতা পরিহিত পা-দুটি ঘোড়ার রেকাবে দৃঢ় ভাবে স্থিত। মাথায় পাগড়ী, গালে গালপাট্টাযুক্ত গোঁফ-দাড়ি ও বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি সম্মুখভাগে প্রসারিত।

দ্বিতীয়, এই মূর্তিতে গাজী সাহেব যেমন বহুলভাবে দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে পূজিত হন, তেমনি কেবল মাজারে বা স্তূপ-প্রতীকেও চব্বিশ পরগণা,

হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে পূজা পেয়ে থাকেন, এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মূর্তিতে যেখানে,—প্রধানত ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনায় পূজা পেয়ে থাকেন, সেখানে তিনি একটি সাধারণ নাম অর্থাৎ বড গাজী খাঁ, বা বড় খাঁ গাজী বা বর খান গাজী হিসাবেই পরিচিত হন। কিন্তু স্তূপ-প্রতীক বা পীরের দরগা, সুনির্দিষ্ট কোনো পীরের নামেই পরিচিত। যেমন হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের দরগা। আনোয়ার শা রোডের দাদা পীরের মাজার। মেদিনীপুরের গদা পীরের মাজার ইত্যাদি। এই সব পীরের প্রত্যেকের সঙ্গেই কোন না কোন অলৌকিক কাহিনী জড়িত।

তৃতীয়, এই সব পীর বা গাজী। বড় খাঁ গাজী সহ সকলের পূজা উপচার হচ্ছে সাধারণত চিনির সাদা বাতাসা, বীরখণ্ডী, এলাচদানা, পাটালী প্রভৃতি। দুধ বা ক্ষীরের শিরণিও দেওয়া হয়। ভক্তরা অনেকে, প্রধানত মুসলমানেরা, মুরগী এনে পীরস্থানে প্রথমে জীবন্ত উৎসর্গ করে পরে, তা-ই প্রসাদ হিসাবে রান্না করে খেয়ে থাকেন। অনেকে মাজারে ফুল উপহার দেন, দেন নগদ পয়সা-টাকা। ধূপ-মোমবাতিও জেলে দেওয়া হয়। কেউ কেউ গাছের প্রথম বা 'বছরকার' নতুন ফল এনেও উৎসর্গ করেন। অর্থাৎ ভক্ত 'দেবতারে প্রিয় করি' আপন প্রেয় বস্তুই তাঁকে নৈবেদ্য দেন।

চতুর্থ, এই সব দরগার কর্তা বা পুরোহিতদের খাদেম বা ফকির বলে। তারা ভক্তের হয়ে পীর বা গাজীর কাছে দোয়া মাগেন, নানা ধরণের রোগের টোট্‌কা দেন, কবচ-মাদুলিও কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। অনেকে গাজার কাছে মানসিক করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে 'ছলন' দিয়ে, দণ্ডী কেটে, শিরণি দিয়ে গাজীর হাজোত বা পূজা দেন। এই হাজোত বা পূজা শেষ হলে খাদেম সুর করে বলে ওঠেন :

'গাজী মিঞার হাজোতে সিন্নি সম্পূর্ণ হলো।
হিন্দুরা সব বলো হরি, মোমিনে আল্লা বলো॥'

এখানে বড় খাঁ গাজী এবং অন্য সবপ্রকার গাজী-পীরের পূজা হাজোত-এর প্রকৃতি ও উপাদান সম্পর্কে একই সঙ্গে আলোচনা করা হলো এই কারণে যে, সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে পীর এবং গাজিগণ—যাঁরা বৃহৎ বঙ্গে এখনও উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমান ভাবে ভক্তি-পূজা পেয়ে আসছেন তাঁদের আরাধনায় ব্যবহৃত উপচারের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কেবল স্থানভেদে বা ঐ ঐ পীর-গাজীর ব্যক্তিগত কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য

বা রুচি অনুযায়ী দু-একটি উপাদানের তফাৎ হয়ে থাকে মাত্র! যেমন: কোথাও একখণ্ড সাদা কাপড় দেওয়া হয়, কোথাও গদার আকৃতি একটি কাষ্ঠখণ্ড, কোথায় দরগার পাশের পুকুরে ফুল ভাসিয়ে হাত পেতে বসে থাকা ইত্যাদি।

কিছু আগে বড় খাঁ গাজীকে অনুসরণ করে আমরা তিনটি প্রশ্ন তুলেছিলাম এইবার একে একে তাদের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। **এক**। প্রথমে আমরা দেখি বড় খাঁ গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? আমরা 'পীর' এবং 'গাজী'র পরিচয় নিতে গিয়ে আরম্ভেই দেখেছি যে বাংলার পীর ও গাজিগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারে যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা সমস্ত ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। তাঁরা বহুদিন ধরে, বহু জনে, বিভিন্ন নামে, একাদিক্রমে শাস্ত্র ও শস্ত্রের সাহায্যে বাংলায় ইসলামকে এক উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রাবাল্য একদিক থেকে যেমন তাঁদের বীরত্বকে সবার কাছে আকর্ষণীয় করেছে—অর্থাৎ ভয়ে ভক্তি—তেমনি তাঁদের অনেকে আপন চারিত্র্যশক্তিতেও জনমনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁরা তাঁদের মহত্ত্বের জোরে সাধারণ মানুষ থেকে একটু উঁচুতে উঠেছেন। তাই-ই ধীরে ধীরে ভক্তের শ্রদ্ধাপ্লুত কল্পনায় তাঁদেরকে দেবতা বা **'অবতার মহাপুরুষে'** পরিণত করেছে। কেবল 'পীর' বা 'গাজী'র ক্ষেত্রে নয়—পৃথিবীর সব দেশে, সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই আজও এই একটু অ-সাধারণ মানুষের চরিত্রের কিছু মহৎ গুণ, কিছু বীরত্বের সঙ্গে কম-বেশী অলৌকিকতা মিশিয়ে তাকে দেবতায় পরিণত করার ইচ্ছা অপরিবর্তনীয় ভাবে চলে আসছে। 'পীর' ও 'গাজী'র ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে।

এর পরে ঐ ঐ পীর বা গাজী যখন বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন তা যে একেবারে নিরঙ্কুশ ভাবে হয়েছে, কোথাও তাঁরা বাধা পাননি—তাও নয়। যদি বাধার ভয় না থাকতো তবে তাঁদের শস্ত্রপাণি হতে হতো না। এবং এই বাধাটা প্রথম অবস্থায় যতটা তীব্র হয়েছিল পরবর্তীকালে তা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে একটা বোঝাপড়া, একটা সামঞ্জস্যে এসে স্থির হয়। এবং বিজিতরাও প্রথমে যেমন উগ্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, পরে তারা বুঝতে পারলো যে এই পরাজয় অলঙ্ঘনীয়। তেমনি বিজয়ীরাও 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র সূত্রে তাঁদের আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিত্যাগ করে প্রীতি, সৌভ্রাত্র ও পারস্পরিক সমন্বয়ের পথে একই জল-হাওয়ায় স্থিত হয়। পূর্ববর্তী মাধব আচার্য, কৃষ্ণরাম, হরিদেব প্রমুখের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই

দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের চিত্র সার্থকভাবে আঁকা আছে। কল্পনা, অতিরঞ্জিত অলৌকিকতা, পৌরাণিক ভাবাবেগ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন একমাত্র 'রায়মঙ্গল' কাব্যের আশ্রয়ে বড় গাজী খান বা 'পীর'-গাজীদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সংগ্রামের ঐতিহাসিকতাকে প্রমাণ করতে চাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই কাব্য-কাহিনীর যা মূল প্রতিপাদ্য—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও অধিকার ভোগগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন, তা তৎসময়ের ঐতিহাসিকতার নিরিখে সুস্পষ্ট ভাবে পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে। এখন এই বড় খাঁ গাজীকে কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করার মতো পাথুরে প্রমাণ না পাওয়া গেলেও ঐ সময়-কালের এবং ঐ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত বা তাঁদের প্রতিভূ হিসাবে এক প্রতীক 'বড় খাঁ গাজী'কে তৈরী করা হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ, ১. 'রায়মঙ্গলে'র গাজী এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি হতে পারেন ; যিনি ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বিধর্মী দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন। অথবা ২. 'রায়মঙ্গলে'র গাজী ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সময়কালে যেসব প্রধান প্রধান গাজী বা পীর বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সকলের বীরত্ব ও সংগ্রামের মিলিত ইতিহাসের সমবায়ে একটি কাল্পনিক 'বড় গাজী খাঁ'-তে সমীভূত হয়েছেন [collective heroic character]। অন্যদিকে, ৩. প্রতিরোধকারী হিন্দুদের বীরত্ব গাথাও ঐভাবে একটি যৌথ নাম দক্ষিণরায়ে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে।

অর্থাৎ, ঐতিহাসিক আধারে, ঐতিহাসিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক রেণুপুঞ্জে কাব্যের প্রয়োজনে এক বড় খাঁ গাজী এবং এক দক্ষিণ রায়ের জন্ম।

দুই। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে : মুসলমান ধর্মবিশ্বাস তার আরাধ্যের মূর্তি-প্রতীক মানে না—মূর্তি পূজা তার কাছে প্রবল দোষের। অথচ মুসলমান ধর্ম-প্রচারক গাজীর মূর্তি তৈরী হয়েছে এবং তা পূজাও পেয়েছে। মহত্ত্ব ও অলৌকিকত্বে 'অবতার মহাপুরুষ'রূপে গাজী হিন্দুর কাছে পূজনীয়। তাঁর দোয়া তার জীবন-সঙ্কট দূর করবে। অতএব হিন্দু কর্তৃক গাজীর মূর্তি নির্মাণ ও মানসিকতা বোধগম্য। কিন্তু মুসলমানগণের এমন করার কারণ কি? এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক উপলব্ধি এই যে : 'যারা ইসলাম ধর্মকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলো তারা যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচারে পারঙ্গম ছিল তা নয় ; নিতান্ত আধিভৌতিক কারণেই তারা মুসলমান

নর-নারী* আঁকা বারা হল দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর বলে লোকে বিশ্বাস করে। হয়, তাদের নাড়ীর যোগ থেকে যায় পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রচলিত গল্পকাহিনীতেই, ইসলাম ধর্ম-শাস্ত্রাদি চর্চা না করে তারাও পূর্বপুরুষদের মতোই রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করতো :

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে পড়ে,
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।

হিন্দুরা যেমন গুরুর প্রতি ভক্তিশীল তেমনই মুসলমানরা গুরুর পরিবর্তে পীরের প্রতি ভক্তিশীল অর্থাৎ মুসলমানের পীর হলো হিন্দু গুরুর বিকল্প······বড় খাঁ গাজী বা জিন্দাপীর বা গাজী সাহেব এখনও দক্ষিণ বঙ্গের বনময় অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজো ও হাজোত পান'।[২৪] এবং সঙ্গে রয়েছে হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার, এমন কি মূর্তি পূজার প্রবৃত্তিও। এর থেকেই গড়ে উঠেছে গাজীর মূর্তি রচনা ও তার পূজার্চনা। তবে গাজীর মূর্তি হিন্দু না মুসলমান, কার দ্বারা সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিলো তা নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় যে হিন্দুর মূর্তি-পূজার প্রবল সংস্কার এ-বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দু ভক্ত গাজীর মাহাত্ম্যে যতই মুগ্ধ হোক না কেন, তাঁর প্রতি ভক্তি যতই প্রগাঢ় হোক না কেন, মুসলমানের মূর্তি তৈরী করবে,—এতখানি ঔদার্য, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসম্মত বলে গ্রহণ করা কঠিন। তাই মনে হয় ধর্মান্তরিত হিন্দু তার পূর্ব সংস্কারের প্রাবল্যে দক্ষিণ রায়ের মূর্তির প্রতিরূপে গাজীর মূর্তি রচনা করে থাকতে পারেন।

তিন। গাজীর সঙ্গে বাঘের **সম্পর্ক** যুক্ত হলো কেন? গাজীর প্রায় অধিকাংশ মূর্তিই ঘোড়ায় চড়া। ব্যাঘ্রবাহন মূর্তি তাঁর নেই বললেই চলে। অথচ তিনি সুন্দরবনের বাঘ নিয়ন্ত্রণ করেন, বাঘ-সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রয়োজনে কখনও কখনও তিনি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কেবল সুন্দরবনের গাজী নন, বঙ্গের যেখানে যত পীর বা গাজী আছেন সকলেরই বাঘের সঙ্গে দারুণ দোস্তী—প্রয়োজন হলেই বাঘের দল তাঁদের সেনাবাহিনী পূর্ণ করে, বাঘ তাঁদের ইচ্ছা মতো স্থানে দ্রুত গতিতে পৌঁছিয়ে দেয়।[২৫] এমন কি বীরভূম থেকে সংগৃহীত গাজীর পটে দেখা যাচ্ছে যে গাজী সাহেব বাঘের পিঠে চেপে অশ্বারোহী বৈষ্ণবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন [দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র : পৃষ্ঠা ২]। অতএব ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সুন্দরবনে ধর্মপ্রচারকারী গাজী ব্যতিরিক্ত যেখানেই গাজী বা পীরের

অবস্থান বা উল্লেখ আছে সেখানেই তাঁর অনুষঙ্গে বাঘ আছে। কেন এমন হলো? ১. বীরত্ব বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী এই গাজী-পীরদের দেবত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁদের ব্যাঘ্রারূঢ় হিসাবে উপস্থিত করতে হয়েছে। এই মত প্রকাশের পেছনে একটি ঘটনার উল্লেখ, মনে হয় আমাদের যুক্তিকে কিছুটা দৃঢ় করতে পারবে। কয়েক বছর আগে আমি যখন বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে ঝাঁপান দেখতে যাই, তখন দেখি যে বেশ কিছু গুণিন মাটির তৈরী বাঘ মূর্তিকে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে তার ওপর বসে ঝাঁপান খেলতে আসছেন [দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র ঃ পৃ. ৩]। গুণিন-সাহেবের এমন বাঘের পিঠে চড়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় আমাকে জানানো হলো যে ঃ একবার আমাদের এই গুণিন বাড়ার সামনে বসে কিছু কাজ করছিলেন এমন সময় তাঁর থেকে ক্ষমতায় ছোট আর এক গুণিন স্পর্ধাভরে তারই সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বীরদর্পে চলে যায়। এতে গুণিন অপমানিত বোধ করেন। তাঁর কাছে উপস্থিত তাঁর শিষ্য ও গুরুকে ঐ স্পর্ধিত গুণিনের ঔদ্ধত্যের বিষয়টির দিকে নির্দেশ করলে তিনি বলেন যে, শীঘ্রই তিনি এর উত্তর দেবেন। এর কিছুদিন বাদে আমাদের গুণিন মন্ত্রবলে বনের বাঘকে বশে এনে, তার পিঠে চেপে বেশ কিছু বিষধর ও ভয়ঙ্কর সাপ নিয়ে সেই স্পর্ধিত গুণিনকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই থেকে তিনি ঝাঁপানে বেরুলেই ঐভাবে বাঘের পিঠে চেপে বার হন।- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসের গাজী সাহেবকেও আমরা আপন কেরামতি দেখানোর উদ্দেশে বাঘের পিঠে চেপে বসতে দেখি। এখানেও পীর ও গাজীসাহেবরা ঐ একই উদ্দেশে বাঘকে বাহন করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এত জীবজন্তু থাকতে পীর-গাজীরা তাঁদের অলৌকিক শক্তির কেরামতি দেখাতে বাঘের পিঠে চেপে বসলেন কেন? এর উত্তর এই যে ঃ প্রথমত, বাংলার যে অংশে পীরেরা সবচেয়ে বেশি[২৬] আধিপত্য বিস্তার করেছেন সেখানে বাঘই সবচেয়ে প্রত্যক্ষ শত্রু এবং সেই বাঘকে বশ করতে পারলে সবচেয়ে কার্যকরী ভাবে অলৌকিকতা প্রদর্শন করা যাবে—এবং দ্রুত স্থানীয় জনমনে প্রভাব বিস্তার করা যাবে। এই ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকেই পীর-গাজীদের বাঘের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রারূঢ়ও করা হয়েছে। ২. ঐতিহাসিক পীর-গাজীরা যখন 'অবতার-মহাপুরুষ'-এ বিবর্তিত হয়ে এই অঞ্চলের জনমানসে শ্রদ্ধা-ভক্তি পেতে আরম্ভ করলেন কোন কোন ক্ষেত্রে জোর কোরে পূজা আদায় করলেন, তখন 'পীর ও গাজী সাহেবদের

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল গ্রাম-দেবতাদের নিয়ে। ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রধানত যাঁদের কাছে তাঁরা করেছিলেন এবং তার আবেদনও ছিল যাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি, তাঁরা সাধারণ গ্রামের লোক, গ্রাম দেবতার পূজা করতেন। তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মীদের সংখ্যাও কম ছিল না। বৃক্ষ, জীবজন্তু, ভূতপ্রেতের পূজারীদের সংখ্যাও কম ছিল না। গাজী সাহেবেরা এই গ্রাম-দেবতাদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। কারণ বড় বড় অভিজাত দেবতাদের যত সহজে দেবালয় থেকে উৎখাত করা যায়, ইঁট পাথরের দেবালয় পর্যন্ত ধূলিসাৎ করে ফেলা যায়, গ্রামদেবতাদের সেইভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। সাধারণ গ্রামের লোকের মতনই তাঁরা দীনদরিদ্র, তাদের মতন জীর্ণ পর্ণকুটিরেই তাঁরা বাস করেন। সহজেই সন্তুষ্ট হন। গাজী সাহেবরা তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। বুঝে-সুঝেই তাঁরা বাংলার গ্রাম-দেবতাদের সঙ্গে একটা আপস-রফা করে বাংলার জনসাধারণকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম-দেবতাদের গুণগুলি পীর ও গাজীসাহেবরা নিজেরাই আত্মসাৎ করে ফেলেন'।[২৭] এবং এই কাজ করতে গিয়েই তারা দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব থেকেই প্রচারিত বাঘ-বিষয়ক বিশ্বাস ও অলৌকিকতাকেও নিজেদের মধ্যে সংহরণ করে নিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঘেরা তাঁদের সৈন্যবাহিনী হলো, যখন তখন বাঘের পিঠে চড়ে ভক্তমণ্ডলী বা উদ্ধত প্রতিপক্ষের সামনে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা বা বিনতি আদায় করতে থাকলেন।

এ-প্রসঙ্গে সবশেষে একটা কথা বলা দরকার; তা হচ্ছে এই যে, বাঘ-সম্পৃক্তির জন্যে বনবিবি বা দক্ষিণ রায়কে ঘিরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁরা বাঘেরই দেবতা; গাজী-পীরদের ক্ষেত্রে তা হয় নি। বাঘ তাঁদের সৈন্য, মাঝে মধ্যে বাঘ চড়েন—এই মাত্র; কোন অর্থেই তাঁরা বাঘের দেবতা নন ['রামচন্দ্র লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানর সৈন্য নিয়ে। তাঁকে কি কেউ বানর-দেবতা বলবে'?[২৮]]। এই কারণেই গাজী সাহেবের যতগুলি মূর্তি দেখা যায় তার প্রায় কোথাও তিনি ব্যাঘ্র-বাহন নন—প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি ঘোড়ায় চড়ে আছেন।

পীর-গাজীদের নিয়ে নানা ধরণের লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাদের কিছু কিছু মুদ্রিত রূপ পেয়েছে। অধিকাংশই পয়ারে লেখা, পাঁচালীর স্তরকে অতিক্রম করতে পারে নি। এর মধ্যে কৃষ্ণরাম-হরিদেব প্রমুখের 'রায়মঙ্গলে' দক্ষিণ রায়কে জড়িয়ে গাজীদের কাহিনী পাওয়া যায়।

এ-ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গীয় 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' [৩৫ বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা] 'গাজী সাহেবের গান' নামে এক গাজীর মাহাত্ম্য-কাহিনী সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছিলেন। আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত 'গাজী কালু-চম্পাবতী কন্যার পুঁথি' নামক কাব্যেও গাজীর কেরামতির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গাজীদের কাহিনী-বীরত্ব ইত্যাদি অবলম্বন করে 'গাজীর পট' অঙ্কিত হতেও দেখা যায় [দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র : পৃষ্ঠা ২]। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজী নিজে বা তাঁর কোন সহচর দরাফ খাঁ শেষ জীবনে গঙ্গা-ভক্ত হয়ে অপূর্ব এক গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন।

চার : দক্ষিণ রায় বা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণ রাজ ।২৯

দক্ষিণ রায় সম্পর্কে আলোচনার সূচনাতেই আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে পূর্ণ মনুষ্য-মূর্তি 'দক্ষিণ রায়' এবং ঘটাকৃতির 'বারা মূর্তি'—এই দুটিকে আমি পৃথক দেবতা হিসেবে বিবেচনা করি এবং সেই বিবেচনায় আমি তাঁদের উভয়কে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, আমি কেন উভয়কে আলাদা দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই তা সবিস্তারে বলা দরকার; পরে সে-সম্পর্কে যথাপ্রয়োজন আলোচনা করা হয়েছে।

আমার সম্পাদিত এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে দক্ষিণ রায় ও 'বারামুণ্ড' এই দুই দেবতা সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিশেষ করে বন্ধুবর ড. দুলাল চৌধুরীর 'দক্ষিণ রায়' প্রবন্ধে [পৃ. ৯২-৯৯]। দক্ষিণ রায়ের বিস্তারণ ক্ষেত্র, পূজারী, পূজার কাল, পূজার স্থান, পূজার প্রচলন, ধ্যান-মন্ত্র, মূর্তি-প্রকরণ, বাহন, পূজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা থাকায় এবং আমার ক্ষেত্র-গবেষণার সঙ্গে তাঁর মৌলিক এবং তথ্যগত পার্থক্য বহু-স্থানেই ন্যূন হওয়ায়, এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ করে, আমার প্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা থেকে বিরত হলাম।

এখন আমরা দক্ষিণ রায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই বিচার করতে চাই যে, দক্ষিণ রায় এবং 'বারামুণ্ড' **কেন একই দেবতা নন ?**

পৃথক দেবতা : কেন নন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে—কিভাবে উভয়ে একই দেবতা এই ধারণার উৎপত্তি হলো সে-বিষয়ে একটু খোঁজ নেওয়ার

দরকার। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণরাম প্রমুখ 'রায় মঙ্গলে'র কবিগণ তাঁদের কাব্যে [কৃষ্ণরামের কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীঃ] দক্ষিণ রায় ও 'বারামুণ্ড' দেবতাকে একই বলেছেন। যেমন :

'কাটামুণ্ড বারাপূজা সেই হইতে করে।/ কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে'।৩০

অথবা

'বাঘের উপর নাক্তি দক্ষিণের রায়।/ একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায় ॥৩১

এই অর্বাচীন কাব্যের কাল্পনিক বক্তব্যের দোহাই দিয়ে 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কেহ উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই এবং অনেকে আজও দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর অভিন্ন এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন'।[৩২]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ্ ও পুরাতাত্ত্বিক প্রয়াত কালিদাস দত্ত মহাশয় দক্ষিণ রায় ও বারামুণ্ডের পার্থক্য প্রমাণ করে যা বলেছেন[৩৩] তা সূত্রাকারে উপস্থিত করলে এইরকম দাঁড়ায় :

১. দক্ষিণ রায় ও 'বারামুণ্ড' একই দেবতা হলে উভয়ের **পূজা**-পদ্ধতি একই রকম হতো। কিন্তু তা নয়। ২. 'বারামুণ্ড' অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রেও **যুগ্ম** ; কিন্তু দক্ষিণ রায় সর্বত্র এবং সর্বদা **একক** ভাবে পূজিত। ৩. উভয়ে **মূর্তি প্রকরণের** দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে **পৃথক**। ৪. দক্ষিণ রায়ের **আয়ুধ** ও বাহন আছে, 'বারামুণ্ড' দেবতার কিছুই নেই। ৫. দক্ষিণ রায়ের **নিত্যপূজা**-বিধি প্রচলিত ও স্থায়ী **মন্দির** [পাকা বা চালা] আছে। কিন্তু 'বারামুণ্ড' দেবতার পূজা বছরে একবারই মাত্র অনুষ্ঠিত হয়, এবং কোথাও কখনও কোন মন্দির বা আর কিছু দেখা যায় না। ৬. 'বারামুণ্ড' মূর্তির পূজা যে মদ্য-মাংস ব্যবহারের [?] মধ্যে দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তির দিন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় তা সাধারণ ভাবে **'জাঁতাল'** নামে পরিচিত ; কিন্তু দক্ষিণ রায়ের পূজা ১লা মাঘ অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জাঁতাল' ধরণের কোন পূজা সেখানে অনুষ্ঠিত হয় না ['ধপধপি'র দক্ষিণ রায়ের পূজাপদ্ধতি অনুধাবণীয়]। এ-ছাড়াও আরো বলা যায় যে ৭. দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, হিঙ্গলগঞ্জ ইত্যাদি বেশকিছু থানার বিস্তৃত অঞ্চল আছে যেখানে 'বারামুণ্ডের'র

খবরই কেউ জানে না, পূজা তো দূরের কথা; কিন্তু ব্যাঘ্র-ভয় নিবারক বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের প্রচার-পরিচিতি ও পূজার চল প্রায় সমস্ত দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণাতে বা তার সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রয়েছে। উভয়ে একই দেবতা হলে এমন হতো না। [আমি উক্ত থানাসমূহে উভয়ের আলোকচিত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম অনুসন্ধান করে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি]। ৮. উভয়ের পূজার **উদ্দেশ্যও** ভিন্ন। যেমনঃ দক্ষিণ রায়ের পূজায় রোগ-ব্যাধি, বিশেষ করে বাত-ব্যাধি দূর হয়, হারাণো বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, সুন্দরবনে নির্ভয়ে মধু-কাঠ-মাছ সংগ্রহ করা যায় ইত্যাদি। অর্থাৎ আর পাঁচটি দেবতার কাছে মিশ্র-কামনা নিয়ে যেমন পূজা করা হয়, দক্ষিণ রায়েরও তেমনিভাবেই পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু 'বারামুণ্ড'র এমন কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কামনা নিয়ে পূজা করা হয় না। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অসংখ্য গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে পৌষ-সংক্রান্তির দিন প্রায় সর্বশ্রেণীর ও সর্বপ্রকার আর্থিক সঙ্গতির হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে পৌষ-লক্ষ্মীর পূজার মতো গৃহ-সংলগ্ন মাঠ-ঘাট-বাগান বা উঠানে একটি বা দুটি বারা মূর্তি স্থাপন করে ব্রাহ্মণদ্বারা, গণেশের মন্ত্রে, পূজা করা হয়। যেন সম্বৎসরের পরিশ্রমের পর প্রচুর শস্য-প্রাপ্তিতে শস্য-দাতা ও তার রক্ষককে 'ধন্যবাদ জ্ঞাপক' [thanks giving] পূজা দেওয়া হচ্ছে। ৯. "বীরমল্ল দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের সহিত ইহার যোগ-কল্পনা, নাম-সাদৃশ্যে 'কাকতালীয়' মাত্র।[৩৪]

আশাকরি উল্লিখিত প্রমাণগুলি হাজির করার পর আর উভয় দেবতাকে একই 'আদিম উৎসজাত' বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে 'পাণ্ডিত্য' প্রকাশ করার দরকার হবে না। 'রায়মঙ্গল' কাব্যের "দক্ষিণরায়ের কাটা-মুণ্ডের সহিত এই বারার যোগাযোগের কল্পনা, চাষা-ভোলানো 'ভাষা' বা লোক-ভোলানো জোড়াতালি মাত্র" [পা. টী. ঐ]।

বাঘের দেবতা? : দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। বাঘের দেবতা অর্থাৎ: **এক.** যিনি বাঘ তিনিই দেবতা? **দুই.** বাঘ বা তার ভয় থেকে রক্ষা করেন যে দেবতা? **তিন.** ব্যাঘ্ররূপী দেবতা? **চার.** বাঘদের নিয়ন্ত্রণ করেন বা বাঘ বাহন, বাঘ সঙ্গী, বাঘ সৈন্য ইত্যাদির যে দেবতা?

উপরের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **প্রথমে:** আমাদের এই গ্রন্থের পূর্বসূত্র অধ্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে দেখেছি যে, [বিশেষ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ-এর আঠাশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] বাঘ দেবতা

হিসেবে পূজা বা কুলকেতু [totem] রূপে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন সারা ভারত সহ বঙ্গদেশের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বাঘ কুলকেতু ও কুল-পদবী এই নজির বাঙ্গালায় ও বহির্বঙ্গে প্রচুর মিলিবে।......ভারতে মানবেতর প্রাণিপূজার পরম্পরায় প্রায় কোনওটিই অর্বাচীন কালের নহে।......রূপে গুণে উপকারিতায় একক এবং কোনও জন্তু, বস্তু বা ঘটনা সহজ-ব্যাখ্যার অতীত হইলেই, আদিম মানুষের মনে তাহা দেবভাবনায় পর্যবসিত হইয়াছে; পৃথিবীর সকল দেশেই এই মনোভাব দুর্লক্ষ্য নহে। এদেশে বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে, এই বিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছে, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ভারতবর্ষের জীব-জন্তু তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণধর্মের জোরে, এইভাবেই সহজ পরিণতির পথে দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছে।......ভারতের অন্য প্রদেশের মতো, বাঙ্গালাদেশেও লোকে নিছক বাঘেরই পূজা করিয়া থাকে। এই লোকেরা কেবল সাঁওতাল কোল ভীলাদি আযেতর সমাজের নহে; আদিম ও লৌকিক, এবং বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক ধারাপুষ্ট সংস্কৃতির বাহক তাহারা পল্লীবাসী বাঙ্গালী'।[৩৫] এখন বাঙ্গালীর পূজা ঐ যিনিই বাঘ তিনিই দেবতা—কে?

একথা সত্য যে, আজ আর বাংলার কোথাও বাঘকেই দেবতা জ্ঞানে, বাঘের মূর্তি গড়িয়ে, বা থানে বাঘের নামে বাঘের মন্ত্রে পূজা হচ্ছে এমন দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে দক্ষিণ বঙ্গের ভয়াল-মনোরম সুন্দরবনের ভীষণ-সুন্দর বাঘ যে প্রাচীনকাল থেকেই ভয়ের উৎস হিসেবে এই অঞ্চলের সব যুগের অধিবাসীদের কাছ থেকে সভয়-শ্রদ্ধা ও পূজা পেয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় কি করে? তা-হলে ঐ দেবরূপ ও তাঁর পূজাচার কই? সেটা কি হারিয়ে গেছে? মানুষ কি ক্রমশ সভ্য হওয়ার পথে তা কি ধীরে ধীরে বিস্মৃত হতে হতে একেবারে ভুলে গেছে?

না এমনটি হয়নি, এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তবে? সমাজ ও ইতিহাসের সাধারণ বিবর্তন ধারায় ঐ সুপ্রাচীন সভয়-শ্রদ্ধা এবং পূজার কিছুটা 'বনবিবি-'র মধ্যে বর্তেছে, এবং কিছুটা দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সংহত হয়েছে। 'বনবিবি'-র কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি,- দক্ষিণ রায়ের কথা এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয়েঃ সুন্দরবনের আদি-মধ্য-আধুনিক অধিকার-ভূমির মধ্যে যে সব মনুষ্যকুল বসবাস করে এসেছেন এবং এখনও আসছেন তাঁরা 'বাঘ'-থেকে রক্ষা

পাবার আশায়, ক্রমপর্যায়ে কোন এক অলৌকিক শক্তি, মন্ত্র-তন্ত্র-ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি জাদু-বিশ্বাস ও অথবা কোন এক অলৌকিক দেব-শক্তিকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন ও করছেন। এই দিক থেকে এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন দেবতা যেমন এঁদের বাঘ থেকে রক্ষা করে থাকেন বা করতে পারেন বলে এঁর বিশ্বাস[৩৬] [যেমন : বনবিবি, দক্ষিণ রায়, বারামুণ্ড, বেণাকি, বড় খাঁ গাজী ইত্যাদি], তেমনি কিছু গুণিন ও তাঁদের মন্ত্র-বাঘবন্ধন কবচ, ছড়া ইত্যাদি তাঁদের আজও রক্ষা করে আসছে। অতএব পরিপূর্ণ ভাবে এবং যুক্তি বা বুদ্ধি-বিচারের **acid-test**-এ উত্তীর্ণ না হলেও দক্ষিণ রায় বহুলাংশে সুন্দরবনের মানুষদের বাঘ বা তার ভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন।

তৃতীয়ে : প্রথম প্রশ্ন এবং এই তৃতীয় প্রশ্ন প্রায় একই। অর্থাৎ দক্ষিণ রায় কি বাঘরূপী দেবতা? আমরা দক্ষিণ রায়ের যে আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছি [পৃ. ৮] এবং তার বাইরেও দক্ষিণ রায়ের যে সব মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় তাদের কাউকে দেখে এ-কথা বলা যায় না যে দক্ষিণ রায় বাঘরূপী দেবতা। যদিও 'উর্দ্ধাঙ্গ রায়মল্ল ও নিম্নাঙ্গ ব্যাঘ্র, এইরূপ চিত্রিত মৃন্ময় মূর্তি বিশ্বভারতীর কলাভবন ম্যুজিয়মে রক্ষিত'[৩৭] আছে; তথাপি ঐ ধরণের বা ওর-ই কাছাকাছি কোন মূর্তি বা দেবকল্পনা যে দক্ষিণ রায় নয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

চতুর্থে : আমাদের দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে সুন্দরবন অঞ্চলে যে বিশ্বাস, আচরণ [practice]-কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাতে তাঁকে বাঘদের নিয়ন্ত্রণকারী, ব্যাঘ্রবাহন, বাঘ সঙ্গী, বাঘ সৈন্যাধিপতি হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না। এতে তিনি বাঘের দেবতা না হলেও 'বাঘ' সম্পর্কিত, এমন কি বাঘেদের কাছে দেবতা হিসাবে পরিচিত হতে পারেন নিশ্চয়ই। যেমন রামচন্দ্র বানর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করলেও বানর-দেবতা নন ঠিকই;[৩৮] কিন্তু তিনি সমগ্র বানর সমাজের কাছে দেবতার ন্যায় পূজ্য ছিলেন; ঠিক দক্ষিণ রায়ের ক্ষেত্রে তেমনটি হতে আপত্তি কোথায়!

অবতার মহাপুরুষ : ১। 'কেহ কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার করেন, তাঁহার চরিত্রটিই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রায় **নাকি*** যশোহর জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি

* স্থূলাক্ষর লেখকের

ছিলেন, তিনি নিম্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর। অবশ্য এই সকল কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই'।[৩৯] শ্রদ্ধেয় ডঃ ভট্টাচার্য কেন কোনো সত্য নেই, তার উল্লেখ করেন নি, তাঁর উক্তিকে যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদিত বা নাকচও করেন নি।

এরপর যাঁর 'ইতিহাসে [একদিন] আমাদের দেশের পাঠকেরা সত্য-সন্ধানের কঠিন সাধনা উপলব্ধি করিতে'[৪০] পেরেছিলো সেই প্রয়াত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে'র প্রথম খণ্ডে [১৯৬৩ সং] দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ রায়কে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন; এবং গাজীর সঙ্গে তাঁর ধর্ম-যুদ্ধের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন [৪২৬-৩৯ পৃ.]।

তাঁর ঐ তথ্যকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে সরাসরি নাকচ করতে আজ পর্যন্ত কেউ উদ্যোগী হন নি। তাই তাঁর প্রতিপাদিত বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্যও যে আছে, তর্কের খাতিরে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। এমন কি সম্প্রতিকালে সুন্দরবনের জনৈক ইতিহাসকাব সতীশবাবুর ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে কটাক্ষ করেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে: 'সতীশবাবু বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনী ইতিহাস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ-সমস্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যের মূলনীতি বিরোধী। বনবিবি কাল্পনিক চরিত্র, [কিন্তু] গাজী ও দক্ষিণ রায় বীর যোদ্ধা......তাঁহাদিগের দেবতা বা অতিমানুষ আখ্যা দেওয়া নিছক ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কার।

'গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পুঁথিতে আবর্জনা রাশির মধ্যে **কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে**।......দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য এই পুঁথিতে পাওয়া যায়'।[৪১]

এখন ঐ সন্দিগ্ধ ঐতিহাসিকের মত বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচ্ছে এই যে: ১। বনবিবির বিষয় নিছক গল্প [এ সম্পর্কে আমরা আগেই আমাদের সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করে এসেছি]। ২। গাজী ও দক্ষিণ রায় বীর যোদ্ধা এবং প্রাপ্ত কেচ্ছা গ্রন্থাদিতে তাঁদের সম্পর্কে, স্বল্প হলেও, কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এবং ৩। এই তথ্য ইতিহাসের স্বক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত। ৪। তবে ঐ প্রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের দেবতা বা অতিমানব [Superman] বলাতেই তাঁর আপত্তি। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য ঐতিহাসিকের এই আপত্তি

সম্বন্ধে আমরা কিছু পরেই আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ঐতিহাসিক সীমার মধ্যে অবস্থিত মানুষেরা দেবতা বা অতিমানবে অথবা অবতার মহাপুরুষে পরিণত হতে পারেন।

উপরে বিবৃত দক্ষিণ রায়ের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে যদি এখনও কারো সন্দেহ থাকে তবে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিক তথ্য বলছে যে: "নিম্নবঙ্গে পাঠান-অধিকারের প্রারম্ভে অরাজকতার সময়ে, বর্তমান দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণার হিন্দুগণকে দক্ষিণ রায় বিপদে-আপদে রক্ষা করিতেন। সেই হেতু কালক্রমে স্থানীয় জনসাধারণ শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁহাকে দেবতায় পরিণত করেন: তজ্জন্য দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার যোদ্ধবেশী মূর্তি পূজিত হয়।

"আঠারো ভাটি আমল করিবার জন্য বড় খাঁ গাজির সহিত খনিয়াতে তাঁহার যুদ্ধ হয়। রাজা মুকুট রায়ের কন্যাকে রক্ষার জন্যও বড়খাঁর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল।

"খনিয়া আদিগঙ্গার মজা খাতের পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে এখনও 'মুকুটের দীঘি' ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। তাহা সেন-যুগের পরিচয় বহন করে। খনিয়ার দেড় মাইল উত্তরে চণ্ডীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে বড় খাঁ গাজি ও চাঁপা-বিবির কবরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। তাহাতে পাঠান আমলের প্রারম্ভকালের নিদর্শন মিলে। কবরের সন্নিকটে খনিয়াতে পাঠান সম্রাট ইল্‌তুত্‌মিসের [আল্‌-তাম্‌সের] ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের রৌপ্যমুদ্রা মিলিয়াছে।

"খনিয়ার প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে খাড়িগ্রাম। প্রবাদ, সেখানে দক্ষিণ রায় থাকিতেন। সেখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে, প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন মসজিদের সদৃশ একটি ভগ্ন গৃহে বড় খাঁ গাজির মনুষ্য-প্রমাণ একটি দারুময় অশ্বারোহী মূর্তি আছে"।[৪২]

এ-ছাড়াও সমসাময়িক কালের প্রায় কোন আলোচকই দক্ষিণ রায়, গাজী প্রমুখের ঐতিহাসিক অবস্থান এবং তাঁদের স্বধর্ম রক্ষা ও নব্য ধর্ম প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধ-এর কথাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা বিষয়টিকে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তা পারম্পর্যানুসারে দাঁড় করালে এই হয় যে: ক. 'দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান খাড়ি গ্রাম।......উত্তর-পশ্চিম সুন্দরবন [খাড়ি যার অন্তর্ভুক্ত] থেকে যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই মুসলমান পূর্ব হিন্দু যুগের।......লক্ষ্মণসেনের উল্লিখিত সুন্দর বনলিপিতে দেখা যায় যে, দ্বাদশ

শতাব্দীর শেষে [১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে] শ্রীমদ্ ডোম্মন পাল [পাঠান্তরে শ্রীমদম্মন পাল] নামে কোন সামন্ত পূর্বখাড়িতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।······ মুসলমানযুগেও দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সহজে সম্ভব হয়নি। পাঠান আমলেও তাই দেখা যায়, হিন্দু সামন্তরা দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণায় প্রায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছেন। চৈতন্যভাগবতকার উল্লিখিত রামচন্দ্র খাঁ সেইরকম একজন সামন্ত ছিলেন। ছত্রভোগে [খাড়ি থেকে একক্রোশের মধ্যে] তাঁর সঙ্গে যখন নীলাচলযাত্রী শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় তখন স্থানীয় লোকেরা তাঁকে **দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি** বলে যেভাবে একবাক্যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করা কঠিন নয়।··· ···খাড়ির নারায়ণীতলা দেখলাম।······নারায়ণীর পাশেই দেখলাম খাড়ির গাজী সাহেব। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন ধর্মযোদ্ধা গাজীসাহেবের এরকম মূর্তি চব্বিশ পরগণায় আর কোথাও দেখিনি'।

খ. "পীর সাহেবের প্রতিপত্তি শুধু চব্বিশ পরগণার বিশেষত্ব নয়, বাংলা দেশেরই বিশেষত্ব। মুসলমান অভিযানের সময় থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত **মুসলমান ফকিররা এদেশের শাসনকার্যে ও ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন**।·· ···মধ্যে মধ্যে তাই নিয়ে বিরোধ যে হয়নি তা নয়। চব্বিশ পরগণার ব্যাঘ্রদেবতা [অর্থাৎ বাঘের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে দেবতা] দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের বিরোধ হয়েছিল।···যুগসন্ধির সময় মুসলমান পীর ও ফকিররা বাংলার গ্রামদেবতাদের সঙ্গে এইভাবে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা 'সমন্বয়' হয় উভয়ের মধ্যে। বিশেষ করে দৃঢ়মূল উন্নত সংস্কৃতির কাছে বিজয়ী সংস্কৃতি এইভাবে আপোষ করতে বাধ্য হয়।"

গ. "মুসলমান আমলে হয়ত একাধিক 'রায়' উপাধিধারী দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল। শুধু দক্ষিণ রায় নয়, হরি রায়, বিষম রায়, কালু রায় ইত্যাদি। এই রকম 'রায়' উপাধিধারী অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে— হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া ও বীরভূমে। এঁরা অনেকেই হয়ত আঞ্চলিক সামন্ত-রাজা, জমিদার ও যোদ্ধা ছিলেন এবং পরে গ্রাম্য লোকদেবতার মহিমা আত্মসাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন"*।[৪৩]

* উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যকার স্থূলাক্ষরগুলি লেখকের।

ওপরে সংগৃহীত সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য অন্ততঃ এই সত্যকে প্রমাণিত করেছে যে দক্ষিণবঙ্গে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ স্থানীয় বীর, প্রতাপশালী, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সামন্ত অধিপতিগণের কাছ থেকে আসা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এবং সেই বাধাদানকারী এক বা একাধিক হিন্দু 'রাজার' গুণসমষ্টি সমীভূত হয়ে একক দেবতা 'দক্ষিণ রায়'কে নির্মিত করেছিল। অথবা এমনও হতে পারে পূর্বকথিত 'রামচন্দ্র খাঁ'-এর—যাঁকে চৈতন্যভাগবতকার 'দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি' বলেছেন,—তাঁর সঙ্গে কোন এক গাজীর ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। এবং সেই যুদ্ধের কারণেই তিনি হিন্দু দেশবাসীর কাছে পূজনীয় হয়েছিলেন। বীরপূজা আমাদের কাছে নতুন কিছুই নয়—বীরকে ধীরে ধীরে দেবত্বে উন্নীত করাও আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও সুপরিচিত ভাবাবেগপুষ্ট-এক সাধারণ প্রবণতা।[৪৪] বুদ্ধ-যীশু-মহম্মদ-নানক-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অসংখ্য ঐতিহাসিক পুরুষই মহাপুরুষ থেকে অবতারত্ব পেরিয়ে মন্দিরে-মসজিদে-গীর্জায় গিয়ে ফুল-বেলপাতা-ধূপ-ধুনা প্রদীপ-বাতির মধ্যিখানে আসন পেয়েছেন। তাঁদের ঘিরে কত 'মিথ', কত অলৌকিক কাহিনী তৈরী হয়েছে—কাব্য-গাথা-সাহিত্য মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক তেমনি মধ্যযুগের বাংলার কোন এক 'দক্ষিণ দেশের রাজা' [প্রকৃত নাম তাঁর শৌর্য-গাথার নিচে চাপা পড়ে গেছে] সেদিনের মানুষের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করে, তাঁদের হৃদয় বেদী তলে দেবতার মূর্তিতে আসীন্ হয়েছেন। একটা কাজচালানো মতো মন্ত্র[৪৫] উপচার ইত্যাদি তৈরী করেও নেওয়া গেছে। পরবর্তী কালে লোক-কবি ঐ বীরত্ব গাথাকে কল্পনা ও অলৌকিকতার সম্বরা দিয়ে কাব্য রচনা করে ইতিহাসের অনুপানকে লিজেণ্ডে-এ চোলাই করেছেন।

এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ এখানে সংবরণ করতে পারছি না। তিনি বলছেন: 'অনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না। মনে করে পুষ্প নৈবেদ্য না দিলে পূজা হয় না। তাহারা ভাবে না, মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার পূজা করিয়াছিল। আচরণ দ্বারা, কেহ তাঁহার প্রিয় চরকায় সুতা কাটিয়া, কেহ তাঁহার কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছিল। লাটসাহেব নগরে আসিবার পূর্বে পথ পরিষ্কৃত ও জল-সিক্ত, পথের দুই পার্শ্বে বনমালা লম্বিত, স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত, সভামণ্ডপ সুসজ্জিত হয়। আগমনকালে হর্ষধ্বনি হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করেন, তাঁহার গুণ ও কর্ম কীর্তন করেন। ইংরেজীতে বলি address পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করেন। যেমন, আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে জল দান করুন, আমরা মেলেরিয়া রোগে ভুগিতেছি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিউন ইত্যাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি। আচরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সহৃদয়তা কামনা করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার্হ। আমরা গাভীর পূজা করি। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, তাহা স্মরণ করি! গৃহের অঙ্গণে তুলসী গাছ পালন করি; দেখিলে হরি স্মরণ হয়।... বস্তুতঃ আমরা ভাবের পূজা করি, মূর্তির পূজা করি না' ['পূজা-পার্বণ' : ১৩৫৮ : পৃ. ৮৫-৬, ১১৩]।

এর পরেও আমাদের একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়। তা-হচ্ছে এই যে 'দক্ষিণ রায়' নামের পেছনে যে বা যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তির শৌর্য-বীর্য ও স্বধর্মের জন্য সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাস লুকিয়ে থাকুক না কেন তাতে তাঁরা হঠাৎ বাঘ বাহন বা বাঘ-এর ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী বা বাঘ সৈন্য ব্যবহারকারী হতে গেলেন কেন? অর্থাৎ 'দক্ষিণ রায়'-গাজীর—হিন্দু-মুসলমান, সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে এ-ভাবে বাঘ যুক্ত হলো কেন?

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়: রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী myth হলেও তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল কি সত্যিই লাঙ্গুলযুক্ত কদলীপ্রিয় পশু— বানর, ছিলো? সেদিনের সেই সুপ্রাচীন কবি যতই কল্পনাপ্রিয় ও অতিপ্রাকৃত-অতিরঞ্জনলোভী হোন না কেন, মানুষ যে কিছুতেই বানর দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না এটুকু বোধ-বুদ্ধি তাঁদের ছিলো। এটুকু বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে উন্নত আর্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি রামচন্দ্র সেদিনের অনার্য সভ্যতার প্রতিনিধি কোন জাতি-গোষ্ঠীর সহায়তায় যুদ্ধ করেছিলেন। ঠিক তেমনি সত্যি সত্যি সুন্দরবনের চতুষ্পদ 'দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নয়, বাঘ কুলকেতু যাঁদের এইরকম নিম্নশ্রেণীর কোন জনসম্প্রদায়[৪৬] 'রায়' নামের পেছনের ঐতিহাসিক পুরুষটির সৈন্যশ্রেণীকে সমৃদ্ধ করেছিলো।

আমার এই বক্তব্যের পেছনে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি এই যে: 'গাজী ও দক্ষিণ রায় দু'জনেরই সেনাদল বাঘ। দু'জনে যখন বিরোধ বাদল তখন বনের বাঘ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল'।[৪৭] একই জনগোষ্ঠী উভয় পক্ষে ভাগ হয়ে

গেছে। অর্থাৎ সেদিনের তীব্র বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদনীতির বলি যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য গ্রাম্য সামাজিক, হিন্দু সমাজ-ধর্মের প্রতি সহানুভূতি এবং আস্থাহীন হয়ে, অবজ্ঞায় জর্জরিত হয়ে, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা গিয়েছিলেন গাজীর দিকে, আর তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা তখনও দেশীয় ধর্ম-কর্মের প্রতি আস্থা হারান নি, তাঁরা রইলেন দক্ষিণ রায়ের দিকে। সেই কারণে সপ্তদশ শতকের কবিও দুই দিকেই দেখেন 'বাঘ' সৈন্য [ঠিক যেমন, যে ধর্মঘট করছে সেও দুনিয়ার সর্বহারা শ্রমিকের এক অংশ, আর যারা ধর্মঘট ভাঙছে তারাও দুনিয়ার সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আর অংশ। 'কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুই বয়ে নিয়ে আসে'।]।

এই দক্ষিণ রায়কে আশ্রয় করে সপ্তদশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী কালে কয়েকটি 'রায়মঙ্গল' কাব্যে রচিত হয়েছে। সেখানে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো দৈব অলৌকিকতা এবং তৎকালীন সমাজচিত্র, দুই-এর উপাদান মেলে। ঐসব কবিদের কবিত্ব শক্তির ঘাটতি মিটেছে প্রচুর পরিমাণে অতি মানবীয় ও অপরাপ্রাকৃতিক ঘটনার ব্যবহার দ্বারা। এই কবিরা "...দক্ষিণের রাজার' নিকটে বাগ সেনার লড়াইয়ের যে বাস্তব বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও দক্ষিণ রায় যে ঐতিহাসিক রায়মল্ল তাহা বিশ্বাস করার প্রবণতা জাগে। কিন্তু ইতিহাসের শেষ রক্ষা হয় নাই। যুদ্ধ-বর্ণনায় পুরাণ আসিয়া ইতিহাসকে কোণঠাসা করিয়াছে।......কেবলমাত্র রায়-গাজির যুদ্ধ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কৃষ্ণরাম ইতিহাস মানিতে চাহিলেও, রুদ্রদেব নিছক উপকথা বানাইয়াছেন"।[৪৮]

পাঁচ : বারামুণ্ড

আমাদের গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠার উপরাংশে যুগ্ম বারামুণ্ডের একটি আলোকচিত্র এবং মূল গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় একটি বারামুণ্ডের রেখাচিত্র আছে। এগুলি পোড়া মাটির তৈরী এবং সাদা-কালো-লাল-হলুদ ইত্যাদি রঙে চিত্রিত। অতএব ঐ মূর্তিগুলির ভাষা-বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।

ক. বারার বিস্তার-স্থান : সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণার নিম্নাংশে, বিচ্ছিন্নভাবে হাওড়া ও হুগলীর প্রধানত দক্ষিণ পূর্বাংশে উক্ত মুণ্ডমূর্তির পূজা হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, হিঙ্গলগঞ্জ বাসন্তী, গোসাবা থানায় এই বারা মুণ্ডমূর্তির পূজার প্রচলন নেই। অনেকে

এঁর নাম পর্যন্তও জানেন না, সেকথা আগেই বলেছি। আবার বেহালা, বজবজ, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, গড়িয়া, সোনারপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, ভাঙ্গড়, বসিরহাট, জয়নগর ইত্যাদি ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলে বারামূর্তি-পূজার ব্যাপক প্রচলন আজও অপ্রতিহত ভাবে বর্তমান।

খ. বারা পূজার-কাল : 'সাধারণতঃ ১লা মাঘ, আবার কোন কোন স্থানে মাঘ মাসের মধ্যে অন্য কোন এক তারিখেও, বৎসরের একদিন মাত্র, গ্রাম্য লৌকিক দেবতার আস্তানায় অথবা লোকের গৃহাদি সংলগ্ন মাঠ, ঘাট ও উঠানে জনসাধারণ'[৪৯] বারামুণ্ডমূর্তির পূজা করেন। 'পৌষ সংক্রান্তিতে বা পয়লা মাঘ মুণ্ডমূর্তিতে ইহার পূজা হয়'।[৫০] 'মাঘ মাসের প্রথমদিনে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও অপর দু-একটি জেলায় বারাঠাকুর পূজার প্রচলন আছে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অংশে এই দেবতার পূজার আধিক্য লক্ষ্য করলে মনে হবে না যে, পল্লী-সমাজে লৌকিক দেবতার মর্যাদা আজও কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে। এই অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র—শহরেও ঐ দিন [বা তার কাছাকাছি কোনদিন] সকল স্তরের ও বর্ণের বহু হিন্দু এই বারা-ঠাকুরের পূজা করেন'।[৫১] 'পৌষ-সংক্রান্তি ও ১লা মাঘে দিনে ও রাত্রে বিশেষ পূজা করা হয় দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড প্রতিমার' [?]।[৫২]

উপরে উদ্ধৃত মতামতের পটভূমিকায় আমার ব্যক্তিগত সমীক্ষা লব্ধ তথ্য হচ্ছে এই যে, সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির দিনই বারামুণ্ড মূর্তির পূজা হয়ে থাকে। অন্যদিনে—মাঘমাসে—পূজার প্রচলন তুলনামূলকভাবে বা শতকরা হিসাবে প্রায় নগণ্য।

গ. বারার পূজা-পদ্ধতি ও উপচার : এঁর পূজায় প্রায় সকল ক্ষেত্রে বর্ণ-ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন, শাস্ত্রীয় বিধানও অনুসৃত হয়। গণেশের মন্ত্রে পূজা হয়। সাধারণ পূজার মতোই ফলমূল উপচার হিসাবে সাজানো হয়। নবান্ন,বা পৌষ-লক্ষ্মীর মতো উপচার-আয়োজনও কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে [নতুন ধান, গুড়, পাটালি ইত্যাদির নৈবেদ্য]। তবে এমন কয়েকটি আচরণ এঁর প্রতি এখনও করা হয় যাতে এঁর আয কৌলীন্য আজও যে নিঃসংশয়িত হয় নি তা বোঝা যায়। যেমন : ১. গৃহস্থ গৃহের বাইরে মাঠ-ঘাট গাছতলা বা জলাশয়ের ধারের আশ্রয় আজও এঁর ঘোচেনি। ২. বছরে মাত্র একদিন পূজা। ৩. মূর্তি বিসর্জিত হয় না। খোলা আকাশের নীচে থেকে সারা বছরের রোদ-ঝড়-জল ভোগ করতে থাকেন। ৪. শাস্ত্রীয় হিন্দু-নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বারামুণ্ড মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে প্রস্তুত করা হয়।

ঘ. বারা পূজার উদ্দেশ্য : বিঘ্ননাশের বা প্রচুর ঐশ্বর্য কামনা করে এঁর পূজা হয় বলে ধারণা করেন কেউ কেউ। এই পূজার উদ্দেশ্য বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা বলেও কেউ মনে করেন। ১৪. ১. ১৯৭২-এ চব্বিশ পরগণার ফলতা থানার মামুদপুর গ্রামে [মৌজা : মামুদপুর] তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল যে, এ অঞ্চলে কোন কোন শুভ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বারামুণ্ড মূর্তির পূজা হয়ে থাকে ; যেমন ; পুকুর কাটা, বাড়ীর ভিত কাটা। তখন দোকান থেকে ঐ মূর্তি কিনতে পাওয়া না গেলে শুধু **ঘটেই** বারাঠাকুরের পূজা করা হয়ে থাকে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই দক্ষিণ রায় এবং বারা-র পূজাঞ্চলের জনসাধারণের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুর একই দেবতা হিসাবে গ্রাহ্য এবং গবেষণার কিমাশ্চর্যম হিসাবে বিনয় ঘোষ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ ঐ বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

সে-যাই হোক, বারামুণ্ড পূজার আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মনে করি কঠিন নয় যে এই পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্যের দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। অর্থাৎ এটি **'tnanks giving festival'** ; 'বারামুণ্ড মূর্তি' কে ? এই প্রশ্নটি আলোচনার সময় বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হবে।

ঙ. বারামুণ্ড মূর্তি যুগ্ম কেন ? : নিম্ন দক্ষিণ-বঙ্গের ব্যাঘ্র-সম্পৃক্ত দেবতাগণের সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত ইংরেজী-বাংলায় যতো বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার মধ্যে অনেকে তাঁদের আলোচনায় 'বারা'-র প্রসঙ্গই আনেন নি। অনেকে পূর্ণ মনুষ্যমূর্তি-দেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে 'বারা'র কোন পার্থক্য-ভেদ রাখেন নি। আর যাঁরা পার্থক্য করেছেন তাঁরা কেউই-ই নিশ্চিত করে বলেন নি যে যেখানেই 'বারা' পূজা হয়েছে বা হচ্ছে সর্বত্রই তাঁরা যুগলরূপে বর্তমান। অর্থাৎ 'বারা'— তাঁদের মতে, কোথাও যুগলে আবার কোথাও একক ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন। 'বারা'-র যুগল মূর্তির পূজা করতেই হবে এমন কথা কেউ-ই নিঃসংশয়িত ভাবে উল্লেখ করেন নি। যেমন : "এক সঙ্গে দুটি বারার পূজার প্রচলন বেশী। এই বারা দুরকমের হয়। অধিক প্রচলিত দুটির একটিতে নরের ও অপরটিতে নারীর মুখ আঁকা থাকে। নরমূর্তিটির মুখে গোঁফ গালপাট্টা আঁকা থাকে, নারীটির মুখে গোঁফ না থাকলেও গালপাট্টা দেখা যায়।……এই রকমের

নর-নারী* আঁকা বারা হল দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর বলে লোকে বিশ্বাস করে। অনুরূপ যুগ্ম বারাও দেখা যায়, তার দুইটিতেই পুরুষের মুখ আঁকা।...... সুন্দরবন অঞ্চলে এই রকমও **একটি**† বারার পূজা বেশী হয়। 'জাঁতাল' পূজাতে দক্ষিণ রায়ের **একটি**† বারার পূজার প্রচলন অধিক......"৫৩

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সর্বত্র না হলেও কোন কোন জায়গাতেই বা কেন যুগ্ম বারামূর্তি পূজিত হয়? এর তাৎপর্য কি? এর উত্তরে বলা যায়: ১। ব্যক্তিগত পূজাস্থানের বাইরে যে বৃক্ষতলে বা মাঠের ধারে স্থায়ী গ্রামভিত্তিক বারাপূজার জায়গা আছে সেখানে একটা বা দুটো বারা নয় অনেকগুলি বারামুণ্ড মূর্তি একসঙ্গে সমষ্টিগতভাবে পূজার দিনে পূজা পেয়ে থাকে। ফলে, এর থেকেই এক বা তদূর্ধ্ব মূর্তির একত্র পূজার ব্যাপারটি প্রচলিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে যুগল-মূর্তি কোন ইঙ্গিতবহ নাও হতে পারে। ২। সপ্তদশ শতাব্দী বা তার পরবর্তী যতগুলি 'রায়মঙ্গল'কাব্য রচিত হয়েছে তারা, গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে রায়ের কর্তিত মূর্তির কথা বললেও [যা 'বারা' নামে খ্যাত হয়েছে], কোথাও, কেউ-ই যুগ্মবারার কোন উল্লেখ করেন নি ['কাটা মুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে'। বা 'একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়']। অতএব যুগ্ম বারামুণ্ডমূর্তির পূজার ব্যাপারটি অনেক অর্বাচীন ব্যাপার। ৩। বারামূর্তির পূজা এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক-পূজা [ঠিক কত প্রাচীন তা কিন্তু কেউ-ই বলেন নি] এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই প্রাচীন বারা মূর্তি মনে হয় আদিতে একটিই ছিলো। পরে দক্ষিণ রায়, যিনি বাঘ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তিনি এই অঞ্চলের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অলৌকিকতার অতিরেকে দ্বিতীয় বারামুণ্ড হয়ে পাশে স্থান করে নিয়েছেন। আর এই জন্যই 'রায়মঙ্গল'-এর কবিগণের দৃষ্টিতে রায়ের খসে পড়া মুণ্ড বারে বারে 'বারামুণ্ড' হয়ে যাচ্ছে। ৪।'......... এককালে ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিকবাদের খুব প্রাধান্য ছিল, পরে দক্ষিণ রায়েরও সেখানে প্রাধান্য হয়, সেই সময় সম্ভবত দক্ষিণ রায় উপাসনা [কাল্ট] ও লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের একটা মিশ্রণ ঘটে, তার ফলে এই বারা পূজায় দক্ষিণ-রায়-নারায়ণী'৫৪ [?] এই যুগ্ম ঘটমূর্তির প্রচলন হয়। ৫। প্রয়াত কালিদাস দত্ত মহাশয় বলেছেন যে 'বারাঠাকুর আদিম দেবতা। এবং প্রাচীনকালের অশিক্ষিত অজ্ঞ-গ্রাম্যলোকেরা ঐ আদিম দেবতার অস্বাভাবিক মূর্তির প্রকৃত

* গালপাট্টাওয়ালা নারী! † স্থূলাক্ষর আমার।—লেখক

তাৎপর্য' নির্ধারণ করতে না পেরে এবং অতি-প্রাকৃতে আত্যন্তিক বিশ্বাস থাকায় তারা 'ঐ প্রকার ['কাটা মুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে'] কাল্পনিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেন'। ফলে, একদিকে একটি বারামুণ্ড মূর্তি ব্যাঘ্রভীতি নিবারক দক্ষিণ রায়-এর নাম গ্রহণ করে, তেমনি স্থানীয় নদীর কালান্তক কুম্ভীর ভীতি থেকে রক্ষাকর্তা কালু রায়ের নামে আরও একটি মূর্তি তাঁরই পাশে আসন করে নেয়। এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একজন হন গোঁফহীন গালপাট্টার অধিকারী ও অপরজন পান সগুম্ফ গালপাট্টা।

অতএব যেহেতু যুগ্ম বারামুণ্ড মূর্তির ব্যবহার আবশ্যিক এবং সর্বত্র প্রচলিত নয়, সে-হেতু এর তাৎপর্য ও ব্যবহার উপরশায়ী, লঘু-চৈতন্যজাত ও অর্বাচীন।

চ. বারার জাঁতাল কি ? ১. "লৌকিক দেবতার বিশেষ বা সমারোহ সহ পূজা বুঝায়। এরূপ পূজাকে 'জাতের-পূজা'ও বলা হয়। জাতাল পূজা বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোন কোন দেবতার জাতাল বা বার্ষিক পূজা-কালে কিছু কিছু আদিম যুগীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—সীমান্ত বাংলার রংকিনীর বিঁদাপর্ব এবং চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের জাঁতাল পূজার উল্লেখ করা যায়।

"'জাতাল' শব্দের অর্থ বিষয়ে কোন কোন মনীষী মন্তব্য করেছেন - ইহা জাতিবাচক 'জার্তিল' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। স্থানীয় ধারণা—জাঁকজমকের পূজার পরিভাষা জাঁতাল।

"লৌকিক দেবতার পূজা প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন—লৌকিক দেবতার থানে নিত্য পূজা বড একটা হয় না, তাঁদের পূজার প্রশস্ত দিন সাধারণতঃ শনি-মঙ্গলবার, এ দু'দিনের পূজাকে 'বারের-পূজা' বলা হয়। সময় সময় অন্যদিন বা বিশেষ পূজাও হয়, দেশে কোন ব্যাধির প্রকোপ মহামারী বা মড়করূপে প্রাদুর্ভূত হলে"।[৫৫]

২. 'লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পূজা-উৎসব। তৎপর্যায়ঃ জাতের পূজা। এই পূজার দিনে দূর দূরান্তর হইতে মানতকারীরা নানা অর্ঘ্য লইয়া পূজার থানে আসে; এই উপলক্ষে বহু স্থানে মেলাও বসে'।[৫৬]

৩. 'উহার রাত্রিকালের পূজাটি জাতাল নামে অভিহিত। উহাতে ঐ মূর্তি দুইটিকে খেজুর গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া উহাদের নিকট আমিষ নৈবেদ্য ও দেশী মদ উৎসর্গ করা হয় এবং ছাগ ও হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়'।[৫৭]

৪. "দক্ষিণ রায় পূজা-উৎসব প্রসঙ্গে জাঁতালানুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ রায়ের প্রসিদ্ধ 'জাঁতাল উৎসব' সতর্ক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই 'জাঁতাল' শব্দ মূলত জাতিবাচক 'জর্তিল' শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। মহাভারতে 'জার্তিল' জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। ···সিজবেড়িয়া গ্রামের পূর্ব প্রান্তিক সীমানা থেকে আউসবেড়িয়া গ্রামের সুরু। এখানেই জাঁতালের থান অর্থাৎ ধান ক্ষেতের প্রাপ্তলগ্ন একফালি ঘেসো জমি। এইখানেই পুরুষানুক্রমে 'জাঁতাল পরব' হয়ে আসছে। এই জাঁতাল থানে দুই গ্রামের লোক অংশ-গ্রহণ করেন। যাঁরা জাঁতাল করেন তাদের বলা হয় 'জাতালের চাকরান্'। কাছেই রয়েছে 'জাতালপুকুর'। থানে রয়েছে হাড়িকাঠ বসানোর জায়গা। পাশেই কিছু বনঝোপ।······দক্ষিণদ্বারের 'চাকরান্‌রা' অধিকাংশই কৃষক।······ "······এটা সুন্দরবনের অঙ্গ ছিল। জঙ্গল হাসিল করে ১লা মাঘ দক্ষিণদ্বারের বার্ষিক পূজা করা হতো। এই পূজারই অপরিহার্য অঙ্গ 'জাতাল'। প্রবাদ আছে, 'জাঁতাল খায়, মাতালে'। বস্তুত, জাঁতালে যে পশু বলি [পাঁঠা] দেওয়া হোত; সেই মাংস তরি-তরকারি সহযোগে রান্না করে গ্রামস্থ সকলকে প্রসাদ দেওয়া হতো। প্রচলিত রীতি অনুসারে সকলেই জাঁতালের প্রসাদ গ্রহণ করত। সঙ্গে মদ্য নিবেদন [দক্ষিণদ্বারকে] ও গ্রহণ উভয়ই চলত। যেমন আজও চলে পঞ্চানন্দকে গাঁজা নিবেদন।····· জাঁতালের হাঁড়ির [অর্থাৎ যে হাঁড়িতে মাংস রান্না করা হয়] জল পান করলে 'মৃগী' রোগ সেরে যায়। অনুসন্ধানে, আরো জানা গেল, কাঁচা পাতা দিয়ে জাঁতালের রান্না করা হোত। খাবার অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সকলে 'দক্ষিণদ্বারের কৃপায় হরিবোল' বলে ধ্বনি দিত। তারপর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করা হোত।

"মদ্য 'গঙ্গাভাটি'র দক্ষিণ রায়ের পুজোপচার। সুন্দরবনের 'রাক্ষসখালি'তে বনের চারদিকে আগুন জেলে রাত্রে জাঁতাল করা হতো। সম্ভবত 'বাঘ তাড়ানোর' জন্য এই আগুন জ্বালানো। জাঁতাল মূলত নিষাদাচার সম্পৃক্ত ক্ষেত্রপূজা।·····

"জাঁতাল পূজায় মদ্য-মাংস দেওয়ার রীতি সুপ্রাচীন। দক্ষিণদ্বার পূজার পরদিন জাঁতাল পালন করা হয়। নউসা গ্রামে [ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা] পূর্বে জাঁতালে 'বলির মাংস' রান্না করে ভোগ দিতেন। এই গ্রামের পূজারী বা ভক্ত্যারা 'কারণ বারি' সেবন ও 'বাবা'কে নিবেদন করতেন। ··"[৫৮]

৫. "The potters and *patuas* of 24 Parganas [the district

covering the mouths of the Ganges in Southern Bengal] prepare images of Dakshin-dai [the door of the South], a *puja*-God, otherwise known as Dakshin-Ray [the Lord of the South] a Dakshineswar [the King of the South]. He is known as *Bara-thakur* also and is annually worshipped on the last day of the month of *Poush* [December-January], just after the main harvesting in Bengal is over. His *Puja* is followed by the *zatal* ceremony.

"... We can certainly recognize in this image from 24-Parganas the portrait of a high government officer, the 'Governor of the South', which has traditionally come down to us from the remotest antiquity as an important historical document in the 'archives' of the South Bengal. Dakshin-dar is a Bengali Zat—our 'Great One of the Southern Eighteen [*atharo-bhathir-raja*]—for whom an ancient days *zatal* used to be performed for official collection of *bhathis* [taxes], payable annually to a Zat or Vizir by his tenants just after the harvesting of the main crop, *i.e.* paddy."[৫৯]

ওপরে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে 'জাঁতাল' কথাটির অর্থ এবং তাৎপর্য ইত্যাদি উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ঐ বক্তব্যগুলিকে বিশেষ মনোযোগ ও তৌলন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো অসঙ্গতি বা সত্য নিষ্কাশিত হয় কি না তা এখন দেখা যাক।

প্রথমেই, জাঁতালের প্রাচীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সকলেই বলতে চান যে এই অনুষ্ঠান 'আদিম যুগীয়' [১], 'আদিম পদ্ধতি' [৩], 'নিষাদাচার সম্পৃক্ত' [৪] ইত্যাদি। এখন এই আদিম বা প্রাচীনত্ব কতখানি। অর্থাৎ এই প্রথার উৎসকে আমরা মানব-সভ্যতার জন্মের কতখানি পেছনে টেনে নিয়ে যেতে পারি? বারামুণ্ড মূর্তি পূজা ও তাঁর জাঁতাল প্রচলনের যে এলাকা তারই উপান্তে 'ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় ছয় মাইল সোজা দক্ষিণে গঙ্গার ভাঙ্গনের মুখে হরিনারায়ণপুর গ্রাম। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে বিস্মৃত যুগের নানা আশ্চর্য নিদর্শন।.........হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে আছে নব্য

প্রস্তরযুগের……'[৬০] নানান দ্রব্য-সামগ্রী। কালিদাস দত্ত মহাশয়ও বলেছেন: 'ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে, হুগলী নদীর ভাঙ্গনে, নব্য-প্রস্তর যুগের অনুরূপ……' [৩] বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নব্য-প্রস্তর যুগ মোটামুটি ভাবে আজ থেকে হাজার সাতেক বছর পূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক কাল। এই সময় থেকেই আমরা দেখছি মানুষ কৃষিকাজে ব্যাপৃত হচ্ছে। এবং কৃষিকাজের এই উৎপাদিত ফল সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে বানাচ্ছে সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র। এযুগে মানুষ পোড়ামাটির পাত্র বানাবার কায়দাও আবিষ্কার করেছে।[৬১]

অতএব জাঁতালে আচরিত মদ্য-মাংস পান-ভোজন, রাত্রে পূজা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের স্বভাব-ধারা বাহিত হয়ে এসেছে। কিন্তু 'প্রাগৈতিহাসিককালের ঐ আদি মানুষেরা যে সব কলাকৌশল, সামাজিক রীতিনীতি, মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছিল তার অনেক কিছুই এখন আমাদের কালেও টিঁকে রয়েছে। আমরা দেখতে পাবো, আধুনিক কালে আমাদের মধ্যে যে সকল ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো চিরায়ত ও সৎ মূল্যবোধের উদয় ঘটেছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক মানব-সমাজেই। অপরপক্ষে বর্তমান কালের অনেক কদাচার, কুসংস্কার ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগে তথাকথিত সভ্যতার উদয়েব পর'।[৬২]

উক্ত সত্য যদি গ্রাহ্য নাও করা হয় তবে এ কথা তো বলা যায় যে; ঐ অঞ্চলের বা অন্য সর্বত্রের নব্য-প্রস্তর যুগের [যাকে পূর্ব উল্লেখিত গবেষকগণ 'আদিম কাল' বলেছেন] মানুষেরা মদ্য-মাংস পান-ভোজন বা অন্যবিধ নিষাদাচার, যা পালন করতেন তা কেবল 'জাঁতাল' নামের একটি মাত্র পারিভাষিক শব্দে পরিচিত হবে কেন? এর উত্তরে হয়তো কেউ বলবেন যে; না, নব্য-প্রস্তর যুগের কৃষিক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ ফসল প্রাপ্তির পর বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে যে উৎসব নিষ্পন্ন করতো তাই-ই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় 'জাঁতাল' নামের একটি আঞ্চলিক অভিধা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যে জাঁতাল বা জাতাল শব্দটির অর্থমূলে 'উৎসব' বিষয়টি রয়েছে। কেননা পশ্চিমবঙ্গের অনেক উৎসব বা মেলাকেই 'জাতের [যাতের] মেলা' বলা হয়ে থাকে। বেশীদূর যেতে হবে না, বজবজ থানার রায়পুর গ্রামে [কোলকাতার ধর্মতলা-বাবুঘাট থেকে যে ৭৫নং

বেসরকারী বাস ছাড়ে তার হুগলী নদী তীরবর্তী শেষ স্টপ] মকর সংক্রান্তির পর যে মেলা বসে তাকে স্থানীয় সকলেই জাতের মেলা বলে। নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে এরকম অসংখ্য মেলা-উৎসবের সঙ্গেই 'জাত' শব্দটি যুক্ত আছে। এবং ঐ সমস্ত পূজা-উৎসব বা মেলাতে তো আনুষ্ঠানিক ভাবে মদ্য-মাংস ইত্যাদি পানভোজন হয় না বা কোন নিষাদাচারও পালিত হয় না। তবে সেখানে কিভাবে 'জাত' বা 'জাঁক'-জমক,—তার সঙ্গে সংযোগার্থে 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে জাঁতাল অনুষ্ঠান হচ্ছে? আমি মনে করি যে, বারামুণ্ড মূর্তির জাঁতালের অনুষ্ঠানটিকে সুপ্রাচীন মানব গোষ্ঠীর নানা আদিম ক্রিয়া-পদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখাটা ঐতিহাসিক বোধ-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, পুরাতন মানবগোষ্ঠীর [তা নব্য প্রস্তর বা অন্য কোন যুগেরই হোক না কোন?] ক্রিয়া-কর্ম আজও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাধনার মধ্যে [কালীপূজা বা শব-সাধনা ইত্যাদি তান্ত্রিক আচরণের মধ্যেও তো পঞ্চ ম-কারের প্রয়োগ দেখা যায়] নানারূপে ও পদ্ধতিতে বর্তমান আছে—বারামুণ্ডর পূজা উপলক্ষে জাতালও তেমনি একটি।

কেননা এই প্রসঙ্গেই আমরা জানি যে, "পৃথিবীর আদিম মানব [অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, নর্ডিক যাঁরাই হোক না কেন] মানসিকতার দিক থেকে 'তরল পৃথিবীতে' অভিন্ন ছিল। তাই 'ফোকমাইনড'—লোক-মানস, বিশ্বের দিগদিগন্তে একই ভাবানুসারী। সভ্যতার ক্রম-উর্ধ্বায়ণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, যখন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই 'বস্তুগত সংস্কৃতি'তে রূপভেদ দেখা দিল। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের মূলকথা, গ্রহণ-বর্জন ও দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের রূপান্তর। এই সত্য সর্বত্রই প্রযোজ্য" [বাঘ ও সংস্কৃতি : পৃ.১২০]।

এর মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত তাঁদের অভিনব উদ্ভাবনকে ঠেকো দেওয়ার জন্য জাঁতাল পূজার বিশেষ অনুষ্ঠানে—'অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি' [অর্থাৎ খিস্তি-খেউড়—প্রবন্ধকার] 'অবাধ যৌনাচার' লক্ষ্য করেছেন। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে: প্রথমে, এই অঞ্চলের যে মানুষগুলির মধ্যে এই জাঁতাল অনুষ্ঠিত হয় তাঁরা প্রধানত মৌলে-বাউলে-নৌজীবী প্রমুখ অশিক্ষিত-দরিদ্র ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরা সাধারণ জীবনাচরণেও অশ্লীল বাক্য হামেশা প্রয়োগ করে থাকেন; এটা তাঁদের কাছে বিশেষ কোন দোষের ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়, ঐ সব মানুষগুলি প্রায় দৈনিকই তাড়ি বা 'অম' বা দেশী মদ পান করে থাকেন। তৃতীয়, বিশেষ একটা উৎসব উপলক্ষে [আবার যে উৎসব **post-harvest,**

হাতে সবে পয়সা এসেছে] মদ পান করবেন ও পানাধিক্যে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি ? অতএব একটি সাধারণ এবং প্রায় দৈনন্দিন স্বভাব বা আচরণকে বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়ানোর মধ্যে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি আছে ? চতুর্থ, জাঁতাল অনুষ্ঠানের মধ্যে 'শিথিল যৌনাচার' জনৈক গবেষকের একটি অতি অভিনব আবিষ্কার। কারণ, জাঁতাল অনুষ্ঠানের একেবারে উদ্যোগ-পর্বে যদিও কোথাও কোথাও এক আধজন গৃহবধূ পূজায়োজনের প্রয়োজনে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু যখন 'জাঁতালের ভাত মাতালে খায়' তখন, সেই উদ্দাম-প্রমত্তাঙ্গিনায় কোন নারীই উপস্থিত থাকেন না বা থাকবার রেওয়াজ নেই। পঞ্চম, এমন একটি তাৎপর্যমূলক অনুষ্ঠান ['শিথিল যৌনাচার'] পূর্বোক্ত বিশিষ্ট গবেষকগণ কেউই কোন ভাবে কেন লক্ষ্য করেন নি ? না কি, তাঁদের নিরীক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ, না কি, তাঁরা লক্ষ্য করেও তাঁদের আলোচনায় উল্লেখ করতে লজ্জা বোধ করেছেন ? বর্তমান প্রবন্ধকার কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লজ্জ [!] ভাবে, আপ্রাণ অনুসন্ধান করেও ঐ রকম কোন শিথিল আচরণের চিহ্নমাত্র কোনও জাঁতাল পূজায় দেখতে পায়নি !

পরিশেষে মন্তব্য এই যে, বারামুণ্ড মূর্তি পূজার তাৎপর্য ও তাঁর পরিচয় অনুষঙ্গে জাঁতাল একটি আনন্দোৎসব। এই উৎসব একক বা গোষ্ঠীর গোপন কোন আচার নয়—এ প্রায় সব ক্ষেত্রেই সার্বজনীন সমষ্টি-চেতনার মেলামেশায় তৈরী মেলানুষ্ঠানের উৎস-বস্তু। এখানে গোপন যৌনাচারের অবকাশ কোথায় ?

ছ. বারামুণ্ড মূর্তি কে ? কালিদাস দত্ত মহাশয় বলেছেন : 'উহা কোন শক্তির প্রতীক এবং কি উদ্দেশ্যে উহার পূজা হয় তাহা অজ্ঞাত' ['বাঘ ও সংস্কৃতি' : পৃষ্ঠা উনিশ]।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মতে : "দক্ষিণদ্বারের 'দ্বার' কথা থেকেও 'বারা' কথা আসতে পারে—দ্বার>বার>বারা শব্দ ব্যুৎপন্ন হওয়া বিশেষ অসঙ্গত নয়। চব্বিশ পরগণা জেলায় বারাসাত, 'বারাতলা' প্রভৃতি নামে বহু গ্রাম আছে। দক্ষিণ রাঢ়ে 'বারাসাত' শব্দ প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়; সম্ভবত বিঘ্ননাশের ও প্রচুর ঐশ্বর্যের কামনা করে আদিম যুগের কোন কালে 'বরাম' বা 'বারা পূজা' প্রচলিত হয়েছিল। ধানের মরাই সম্পর্কেও এই শব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে"।[৬৩]

সুধাংশুকুমার রায় সুনির্দিষ্ট ভাবে বারামুণ্ডের পরিচয় না দিলেও মোটামুটি ভাবে যেন ইঙ্গিত করতে চান যে বারামুণ্ড মূর্তির সঙ্গে দক্ষিণ মিশরের প্রধান

রাজা নরমারের [৩২০০ খ্রীঃ পূঃ] মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ ইনি বারা পূজার পেছনে মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবকে অগৌণে গ্রহণ করতে চান।[৬৪]

ড. পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় তাঁর 'সাহিত্য প্রকাশিকা : চতুর্থ খণ্ডে' দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডরূপ ও কুম্ভপুরুষ বারা-প্রতীক—এই দুটিকে পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে : প্রথমে, মুণ্ডরূপ হচ্ছে, "প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মুণ্ডপূজা ও উত্তরবৈদিক উপনিষদ যুগের ক্রমবিবর্তিত 'রুদ্র'-ভাবনার সমন্বয়ে, দক্ষিণাধিপতির মুণ্ডপূজার প্রবর্তন হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্তভাবেই করা যাইতে পারে। বীরমল্ল দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের সহিত ইহার যোগ-কল্পনা, নাম-সাদৃশ্যে 'কাকতালীয়' মাত্র"। আবার তিনি 'কুম্ভপুরুষ বারা-প্রতীক'-কে একটি পৃথক একক [unit] ধরে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছেন যে : "যাহাই হউক, 'বারাসাত' বা 'ৰারাতলা' নামে দক্ষিণ রাঢ়ে অসংখ্য গ্রামের নাম ও দেবস্থান আছে। দক্ষিণ-রাঢ়ে 'বারাসাত' শব্দের অর্থ—'প্রাচুর্য'। বিঘ্ন-বিনাশের এবং প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্যের কামনা করিয়াই, মনে হয়, একদা আদিম যুগে 'বরাম' বা 'বারাপূজা' প্রচলিত হইয়াছিল ; ক্রমে, দর্শনতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে, সে ঐশ্বর্য, ইহলোক হইতে পরলোকেও বিস্তারলাভ করিয়া, কাটা-মুণ্ডে 'ঝারা'-বারা প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল"।[৬৫]

ড. দুলাল চৌধুরী আমাদের এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর 'দক্ষিণ রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে বারামুণ্ড মূর্তি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন [পৃ ১১৯] : 'পক্ষান্তরে বারামূর্তি অতি প্রাচীন, [এমন কি, বঙ্গদেশে মনসা, চণ্ডী, শিব প্রভৃতির পূজা প্রচলনের পূর্বেকার] এক অন্-আর্য লোকায়ত ক্ষেত্রপাল দেবতা। এই দেবতার উদ্ভবে তন্ত্র, যাদুবিশ্বাস ইত্যাদি বিশেষ সহায়তা করেছে।'

এ-ছাড়া বারামুণ্ড মূর্তি সম্পর্কে পৃথক অভিধা রচনা করে আর স্বল্প যে দু-একজন আলোচনা করেছেন তা আমাদের এখানে উদ্ধৃত আলোচনাগুলিরই অনুপূরক। অতএব এখানে তাদের পৃথক ভাবে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখি না। এখন আমরা উপরে রেখে আসা বিভিন্ন আলোচনা, এই মুণ্ডমূর্তি পূজার বিস্তার ক্ষেত্র, কারা এই পূজা করে থাকেন, মন্ত্র ও উপচার, জাঁতাল ইত্যাদি অবলম্বনে আমাদের সিদ্ধান্তকে এমন এক স্থির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবো যার সাহায্যে সহজেই বারামুণ্ড মূর্তিকে চিনে নেওয়া যেতে পারবে বলে মনে করি।

১. বারামুণ্ড মূর্তিটিকে মূর্তিনির্মাণ-কলা-বিষ্ঠার সচেতন বিবেচনা দিয়ে নিরীক্ষণ করলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি মূলে একটি ঘট ছিলো—নাক, কানদুটি ও মাথার চালি বা শিরোস্ত্রাণ পরে,—অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত বা সংযুক্ত হয়েছে। আসলে, বারামুণ্ডমূর্তির পূজা **ঘটপূজারই** বিবর্তিত রূপ। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এই সিদ্ধান্ত করার কারণ কি ? উত্তর : **ক**. 'প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কুম্ভকারগণ, পরম্পরাগত প্রথায়, ঐ দেবতাটির উক্তরূপ শত শত মূর্তি, পূজার জন্য নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করেন।' এই নির্মাণের সময় মূর্তিটির ঘট অংশ প্রধানত চাকে তৈরী হয়, পরে মাটির তাল পিটে চালি ও পৃথকভাবে নাক ও কান তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়। কালিদাসবাবু ঠিকই ধরেছেন যে : 'বারাঠাকুরের বর্তমান মূর্তিতে এখনও উক্তরূপ আদিম বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কালপ্রভাবে উহাতে যে পরিবর্তন **[sophistication]** ঘটিয়াছে তাহা বুঝা যায় উক্ত মূর্তির চোখ, কান ও মুখের স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় আকার হইতে।' **খ**. "এবং এই 'বারা' যে ঘট, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, ঘটে 'আবাহন' ও পূজার অন্তে,—'দক্ষিণ রায়ের বারা ঝারা মাথায় করিয়া/ক্রিষ্ণরাম কবি গায় দক্ষিণ রায় ভাবিয়া।' হরিদেব 'ঘট'-অর্থেই 'ঝারা-বারা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। হেমঘটে বা হেমঝারিতে পূজা করিতে হয় চণ্ডীর। 'কুম্ভে' হয় বিষহরির পূজা। হরিদেবের মতে. দক্ষিণ রায়ের পূজার জন্য 'ঝারা-বারা' আনাইয়াছিলেন কামাখ্যারাজ বলিভদ্র। ······এই 'কুণ্ড' বা মৃৎ-ভাণ্ডের নামান্তর 'বারা' বা বারিপূর্ণ ঘট। ইহা অগ্নি-উগ্র ও আরোগ্যপ্রদ শুভ-সোম বারিধারক"।[৬৬]

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আজ যাকে 'বারামুণ্ডমূর্তি' পূজা বলছি তা আসলে ঘট পূজা। এবং এই ঘটই ক্রমে ক্রমে বাইরের ও ভেতরের বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস-সংস্কার-এর প্রভাবে নানা বিবর্তন-পরিবর্তন-পরিবর্জনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই বারামুণ্ডমূর্তি পূজায় এসে স্থিত হয়েছে। এখন বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। এর মধ্যে **প্রথমে** আমরা আলোচনা করবো 'ঘট' কিসের প্রতীক বা ঘটপূজার তাৎপর্য কি ?

১. আমরা জানি যে, ঘটে-পটে-বা প্রতিমায় দেব-দেবী আবাধনার বিধি আছে। "দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্র, নয় রাত্র, নয় তিথির ব্রত।······সে সে প্রদেশের লোক 'দশারা পরব' বলে, ঘট স্থাপন

করিয়া পূজা করে। ঘটের সম্মুখে নয় দিন চণ্ডীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের বিসর্জন।····· বঙ্গদেশে আমরা প্রতিমায় পূজা করি, নবরাত্র- ব্রত ভুলিয়া গিয়াছি।'······কিন্তু···'ঘটে পূজা হইলেও পূজা সিদ্ধ হয়।' '······অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন'। ···'তবে কি প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে যে পূজা হয়, তাহা কি নিষ্ফল'?[৬৭] শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বঙ্গীয় বা ভারতীয় বিভিন্ন পূজার ক্ষেত্রে ঘট ব্যবহার প্রসঙ্গে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা আমরা এখানে [বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও] উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্যকে উপস্থিত করার চেষ্টা করলাম যে ঘটে পূজা বা ঘট পূজা মোটেই অপ্রাচীন-অশাস্ত্রীয় বা আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

২. এখন সর্বাগ্রে ঘটের প্রয়োগ-পরিচয় গ্রহণ করা যাক। "সংস্কৃতে ঘট অর্থ কলস এবং ক্ষুদ্র ঘট—ঘটী। কিন্তু বাংলায় যে কলস বা কলস-জাতীয় পাত্র দেবতার পূজা-অর্চনায় বা অপর কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঘট বলে। **অনেক লৌকিক দেবতার নিত্য পূজা অনেক ক্ষেত্রে ঘটেই সম্পন্ন হয়** ; এমন কি দুর্গাপূজা এবং কালীর নিত্য পূজাও কেহ কেহ শুধু ঘটেই করিয়া থাকেন। নানা রকম ঘটে নানা দেবতার অধিষ্ঠান ; তাই ঘটকে প্রতীক কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজা করা হয়। স্থান ও অনুষ্ঠান ভেদে ঘটের আকৃতি বিভিন্ন ; উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন। ···· [যেমন : দ্বার ঘট, মঙ্গলঘট, দেবীঘট, জলঘট, ডাবরা ইত্যাদি] ··· রাঢ় অঞ্চলে মনসার ঘটের লোকপ্রসিদ্ধ নাম বারি ; কখন কখন 'বারা' কথাটাও শুনা যায়। ····· এক একটি মৃৎ পাত্রের [মনসার ঘটের] গায়ে অতি নিপুণভাবে কয়েকটি সর্পফণা গড়িয়া তোলা হয়। কোন কোন ঘটে সর্পফণাব সহিত হংসবাহনা একটি নারী মূর্তিকেও দেখা যায়। শুধু মনসার নয়, অন্য কোন কোন দেবতার পূজার ঘটকেও বারি, বারা বলিতে শুনা যায়।······

'এতদ্ব্যতীত ইতুঘট, ধর্মের ঘট, কার্তিকের ঘট—অনুষ্ঠান ভেদে আরও নানা ঘট ব্যবহৃত হয়। কার্তিকের ঘট বিবিধ আলপনাযুক্ত থাকে। উহার অপর নাম কার্তিকের ভাঁড়। ধর্মের ঘটে সূর্যের আলপনা শোভা পায় ; **বারা-ঠাকুরের মুণ্ড মূর্তিও এক শ্রেণীর ঘট**"।*[৬৮]

৩. এখন এই ঘট-পূজার তাৎপর্য কি? ক. প্রতিমার সামনে অথবা একক ভাবে সেখানে কেবল ঘটেরই পূজা হয়, যেখানে এই ঘটকে একতাল

* স্থূলাক্ষর লেখকের।

মাটির ওপর বসানো হয়। খ. তার চার কোণে চারটি শর পুঁতে কয়েকবার সুতো দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলা হয়। যেন এটি বস্ত্রগৃহ। গ. ঐ ঘটের উপর পাঁচটি পাতাযুক্ত আমের পল্লব ও সশীষ ডাব বসানো হয়। পাঁচ যাদু-সংখ্যা এবং পুষ্পাকার আমের পল্লব গর্ভের ফুলের প্রতীক। ডাব পূর্ণতার প্রতীক। ঘ. ঘটের গোড়ার ঐ মাটিতে বা সামনে অলক্তক, ছুরি রাখা হয়। নাড়ী কাটার জন্য ছুরি, অলক্তক রক্তের প্রতীক। ঙ. এ-ছাড়াও ঘটের সামনে কেশ-সংস্কারের জিনিষ, অঙ্গরাগের দ্রব্যাদি, অলঙ্কার, মধুপর্ক ইত্যাদি দেওয়া হয়। চ. ঘটের গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে একটি পুতুল আঁকা হয়। গর্ভ-সম্ভাবনার চিন্তা না করলে এই সমস্ত জিনিষের দরকার হয় না। অতএব জলপূর্ণ ঘট পূজা আসলে গর্ভ পূজারই নামান্তর।

৪. আমরা জানি যে আদিম জনগোষ্ঠীর কাছে ঘট পূজা অজ্ঞাত। ঘট-পূজা উচ্চতর হিন্দু-সংস্কৃতিরই দান। এর আচার-আচরণ বা কোনো দু-এক স্তর-পর্যায়ে আদিম জনগোষ্ঠী-বাহিত সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু আজো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রস্তর খণ্ড, গাছ, পাথরের নুড়ি, পাহাড় ইত্যাদি আদিম জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পূজা পেয়ে আসছে। অতএব বারা-ঘট আদিম জনগোষ্ঠীর কোন পূজা আচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

৫. এখন দেখা দরকার : 'মকর সংক্রান্তির দিনে এই অঞ্চলে যে বারা ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে,……ইহার মধ্যে যে একটি প্রতীক পূজিত হয়, তাহা মুণ্ড মাত্র,……সমগ্র দেহের মধ্যে মুণ্ডই যে প্রধান, তাহা পৃথিবীর একটি অতি আদিম বিশ্বাস। ইহার উপব ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী বিশেষতঃ আফ্রিকার আদিবাসী সমাজের ধর্মকর্ম বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, আসামের নাগাজাতির মুণ্ড শিকার নামক বহু নিন্দিত প্রথার মধ্যে। মুণ্ড-শিকার বা **head-hunting** প্রথাটি—এই বিশ্বাস অর্থাৎ সর্বাঙ্গের মধ্যে মুণ্ডই শ্রেষ্ঠ এবং ইহার উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। আসামের নাগা জাতির বিশ্বাস দেহের মধ্যে যখন মুণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ, তখন মুণ্ডটি মাত্র অধিকার করিলেই কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই নরবলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেইজন্য প্রতিবেশী গ্রামের মধ্য হইতে কাহাকেও বধ করিয়া তাহার মুণ্ডটি তাহার দেহ হইতে কাটিয়া লইলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এই মুণ্ডটি পাহাড়ের ঢালুতে যে ধান ক্ষেত করা হয়, পুঁতিয়া দিলে বেশি ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কিংবা সেই মুণ্ডের কঙ্কালটি

কণ্ঠে ধারণ করিলে দেহে শক্তিলাভ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।…কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুণ্ড পূজার প্রাচীনতর ধারাটি সুন্দরবন অঞ্চলে স্বাধীন ভাবেও রক্ষা পাইল'।[৬৯]

এই তথ্যকে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের দেখতে হবে: **প্রথমে**, এই আদিবাসী কারা,—অর্থাৎ বিবর্তিত মানব-গোষ্ঠীর কোন পূর্বস্তরের অধিবাসী এঁরা? **দ্বিতীয়ে**, এই মানব-গোষ্ঠীর আচরিত নৃ-মুণ্ড শিকারের মতো আর কোনোও বিশেষ আদিম-বিশ্বাসজাত অনুষ্ঠান এখানে এখনও স্ব-রূপে বা বিবর্তিত রূপে বর্তমান আছে কি না? **তৃতীয়ে**, নৃ-মুণ্ড শিকারী ঐ আদি-অধিবাসী ঐ ভূ-খণ্ডে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের স্তর বেয়ে আজও বিবর্তিত রূপে বর্তমান, না নৃ-মুণ্ড শিকারের প্রাচীনতর ধারাটিকে স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে নিঃশেষ হয়ে গেছে? **চতুর্থে**, ডায়মণ্ডহারবারের কাছে হরিনারায়ণপুরে যে আদি অধিবাসীর ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁদের বংশধারা কি আজও বারামুণ্ড মূর্তির পূজা-অঞ্চল-সীমার মধ্যে বসবাস করছেন? **পঞ্চমে**, যেখানে আজও পূর্ণদেহ দেবদেবীর মূর্তির বদলে কেবল মুণ্ড পূজা হয় সেখানেও কি আমরা ঐ নৃ-মুণ্ড শিকারের তত্ত্ব প্রয়োগ করবো। অর্থাৎ পুর্ববঙ্গে পূজিত নারীমুণ্ড মূর্তি অঙ্কিত মনসার ঘট, বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামের সুসন্তান যামিনী রায় বা বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের গৃহে দুর্গাপূজাতে দুর্গা-মুণ্ডের যে পূজা হয়, 'পচামুড়ী' শীতলা, বর্ধমানের মুণ্ডেশ্বরী, কালীঘাটের কালী, ত্রিপুরার পীঠ দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী, ত্রিপুর রাজবংশেরচতুর্দশ কুলদেবতা—ইত্যাদি যে সব জায়গায় মুণ্ড পূজার আজও প্রচলন আছে সেখানেও কি ঐ নৃ-মুণ্ড শিকারের ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়ে বা স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করছে?

সুন্দরবনের যে অঞ্চলে বারামুণ্ড মূর্তির প্রচলন আজও রয়েছে, সেখানকার জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক নিম্ন এবং উপরি-স্তরের আনুপূর্বিক পরিচয় গ্রহণ করলে কিছুতেই বারামুণ্ডমূর্তিকে ১. নৃ-মুণ্ড শিকারের প্রাচীনতর ধারার প্রতীকী অবশেষ এবং ২. উক্ত প্রতীক হিসাবে কৃষি, জাদু-বিশ্বাস, প্রজনন ও উর্বরতার দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না; কারণ:

ক। 'একদিকে যেমন দক্ষিণ রায় অন্যদিকে তেমনি বারামুণ্ড মূর্তি মাহিষ্য, বাগদী, বাউরী, মালো, জালোদের কাছ থেকেই প্রধানত পূজা পেয়ে থাকেন।

ড. সুকুমার সেনের মত অনুসরণে[৭০] এঁরা যদি অষ্ট্রিক-মঙ্গল জাতির লোক হন তাহলে তাঁরা তো বারামুণ্ডমূর্তির পূজাঞ্চলের [পূর্বে দেখুন। পৃ ২৩৮-৯] মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ রয়েছেন এমন তো নয়। ঐ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যত্র, এমন কি আশে-পাশের থানাতেও ঐ জনগোষ্ঠীর যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের মধ্যেও ঐ নিষাদাচার [?] কেন প্রচারিত বা প্রচলিত হলো না ? এর উত্তরে হয়তো কেউ বলতে পারেন যে : মালদহের ফজাল তো পুরুলিয়ায় হয় না ! কিংবা পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ তো জলপাইগুড়িতে দেখা যায় না। এই-ভাবেই দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণাতেই সুপ্রাচীন নৃ-মুণ্ড শিকারের অবশেষ ঐ প্রতীকী পূজার মধ্যে রয়ে গেছে। কিন্তু, এই মত যুক্তিসহ নয়। কেন না, আদিম মানব জাতির ক্ষেত্রে মুণ্ড শিকারের মতো এত বড় একটা আচার কেবল ঐ ক্ষুদ্র অঞ্চলের স্থানিক [**localised**] অনুষ্ঠান হয়ে থাকবে এ-যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়; এমন কি, ঐ জন-গোষ্ঠীর লোকেরা আশে-পাশে, নিকটে-দূরে আরও প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করছেন।

খ। হরিনারায়ণপুরের প্রত্ন-আবিষ্কার থেকে যা পাওয়া গেছে তাকে একদিক থেকে বারামুণ্ডমূর্তির আদিম রূপ হিসেবে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যায় না। ['উহা বারাঠাকুরের (**prototype**) হওয়া সম্ভব'।—কালিদাস দত্ত]; তেমনি হরিনারায়ণপুরের ঐ 'কিম্ভূতকিমাকার [**grotesque**] ও পক্ষীর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট' মুখমণ্ডলকে যদিও তর্কের খাতিরে বাবামুণ্ডমূর্তির আদিম রূপ হিসেবে গ্রহণ করাও, যায় তবে তা কিভাবে নৃ-মুণ্ড শিকারের ঐতিহ্য বা স্মৃতি বহন করছে প্রমাণ হলো ?

গ। আমরা আগেই বলেছি যে অন্ততঃ বাংলা বা ভারতের অন্যত্র আরও বহু দেব-দেবী আছেন যাঁদের মুণ্ডমূর্তির পূজা হয়ে থাকে ?[৭১] মুণ্ডপূজা দেখলেই যদি তাকে শিকার করা নৃ-মুণ্ড পূজার প্রতীকী অবশেষ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে অবশ্য কিছুই বলার নেই। কিন্তু এমন বলা কি ঐতিহাসিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হবে ?

ঘ। বারামুণ্ড মূর্তির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে; এক. এর শিরোস্ত্রাণে লতাপাতা ও ফুল আঁকা থাকায় তার মধ্য দিয়ে অরণ্যচারিতা বা বৃক্ষপূজার প্রতীকী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। দুই. মুণ্ড-রূপ মুণ্ড শিকারের প্রতীকী ভাবনার প্রকাশক। তিন. কিম্ভূতকিমাকার মুখ-চোখ-নাক ইত্যাদি আদিমতার লক্ষণাত্মক। এখন প্রশ্ন এই যে, ফুল-লতাপাতার

মধ্যে প্রতীকী-চিন্তার যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও **sophistication** রয়েছে, অন্য দুটি কিন্তু তার থেকে অনেক আদিম স্তরের চিন্তা-প্রসূত। আমরা জানি যে পৃথিবীর যে কোন দেশের মূর্তিবিদ্যা কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে থাকে। যেমন : পাথর, নুড়ি, গাছ-পালা, বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষ, বৃক্ষশাখা, প্রতীক, মুণ্ড, পশু ও মানুষের মিশ্রণ, শুধু পশু-জীব প্রতীক, মানুষী মূর্তি ইত্যাদি। এ-সব ক্ষেত্রে কিন্তু এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণের ঐতিহাসিক ক্রম প্রায় আবশ্যিক-ভাবে অনুসৃত হয়। কিন্তু বারামুণ্ডের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এইরকম অসম্পূর্ণভাবে স্তরোৎক্রান্তি কি ইতিহাসের যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হতে পারে? খুব স্বাভাবিক কারণেই তা হয় না। তাই আমরা এই দিক থেকেও বারামুণ্ডমূর্তিকে আদিম মুণ্ড শিকারের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না।

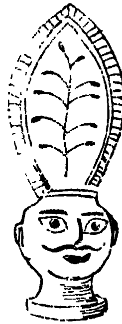
ঙ. সুন্দরবনাঞ্চলের আদি-অধিবাসীদের নৃ-মুণ্ড শিকারের প্রেক্ষিতে যে কৃষি-জাদু-বিশ্বাস, প্রজনন ও উর্বরতার কথা বলা হয় তা কি গ্রহণযোগ্য? না, এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, লোক-চৈতন্যের বিশ্ববিজ্ঞান-শাস্ত্র অনুসন্ধানের পর একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, উর্বরতাবাদ ও প্রজননের দেবতা হবেন অবশ্যই নারী।[৭২]

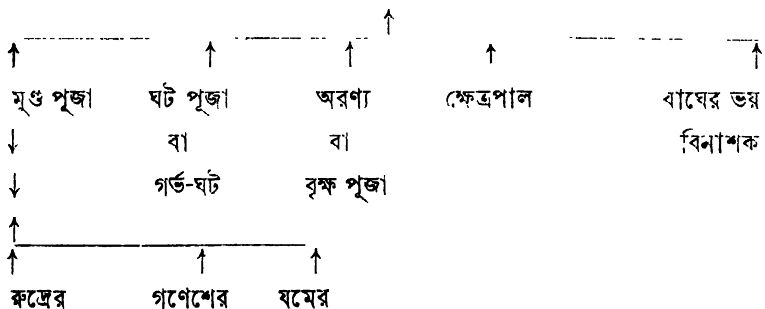
অতএব আমরা এখন বারামুণ্ড মূর্তি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে : ১, বারামুণ্ড মূর্তি আসলে ঘট পূজা। পরবর্তী স্তরে এতে চোখ-কান-নাক ও শিরোভূষণ যুক্ত হয়েছে। ২. দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা বা দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মিশরীয় সভ্যতার সংযোগ ছিলো। সেইখানকার কোন রাজার [রাজা নরমারেরও হতে পারে] শিরোভূষণের অনুরূপে বারার মাথায় চালি তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৭৩] ৩. বারাকে দক্ষিণের অধীশ্বর হিসাবে কল্পনা করায়, তাঁর প্রাধান্য ঘোষণার জন্য মুকুট-এর পরিকল্পনা থেকে এই চালির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মূর্তি-প্রকরণ তত্ত্বানুযায়ী মূর্তি সৃষ্টি আর্য সংস্কৃতির দান হিসাবে মনে করা হয়। তাই বারা-কে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করার পর তাঁর দৈবী মহিমা প্রকাশের জন্য মাথার পেছনে দেব-সুলভ তেজঃপুঞ্জ [hallow] রচনার প্রয়োজনে ঐ চালি বা চালচিত্রের প্রয়োজন হয়েছে। ৪. বারা ঘটের মুণ্ডমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে শনির কোপে উড়ে যাওয়া গণেশের মুণ্ড-এর চিন্তা বিশেষভাবে সক্রিয় একথা অস্বীকার করা কঠিন। ৫. মৃত্যু-অধিপতি যমের বাস পৃথিবীর দক্ষিণে [স্মরণীয় : 'যমের দক্ষিণ দুয়ার']। এই বিকট মুণ্ড মূর্তির পরিকল্পনায় ভীষণ-দর্শন মৃত্যু-অধিপতি

যমের প্রভাব থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। ৬. এই বারামুণ্ডে কৃষকের ফসল রক্ষার দেবতা ক্ষেত্রপালের গুণও যে সংযুক্ত আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে মন্তব্য এই যে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের পথ বেয়ে 'বারা' মূর্তি এক অপূর্ব ও বৈচিত্র্যময় সমন্বয় নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছেন। স্তরে স্তরে দীর্ঘদিনের পলি যেমন নানারূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শিলারূপ ধারণ করে, ঠিক তেমনিই এই বারামুণ্ড মূর্তিও দীর্ঘকালের বিভিন্নমুখী চিন্তা ও চেতনার অভিঘাতে আজকের রূপে এসে পৌঁচেছে। তাই এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে দাঁড়ানো অন্ধের হস্তি দর্শন হতে বাধ্য। ফলে, 'উহা কোন্ শক্তির প্রতীক এবং কি উদ্দেশ্যে উহার পূজা হয় তাহা অজ্ঞাত'।[৭৪]

'বারা' যে বিভিন্ন চিন্তা, যে বহুমুখী সমাজ-ঐতিহাসিক উপাদানকে নিজের মধ্যে সমীভূত করেছে, রোগে-দুঃখে-শোকে-ভয়ে-সম্পদে আপন প্রয়োজনে বিভিন্ন যুগের, নানা শ্রেণীর মানুষ বহুমুখী বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁকে নির্মাণ করে নিয়েছেন, তা-সবকে একটা সারণিতে আবদ্ধ করলে মোটামুটি যা দাঁড়ায়ঃ





১. এই অঞ্চলে নানা নামের গাজী বা পীর আছেন। এঁদের অধিষ্ঠান-ভূমি বঙ্গভাষাভাষী এক বৃহৎ অঞ্চল। এঁদের সকলের সঙ্গেই বাঘের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এঁরা যখন-তখন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রু দমন করেন। দ্রষ্টব্য : **ক.** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রাধা' উপন্যাস। **খ.** ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস : 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' [১৯৭৬]। **গ.** ড. সুকুমার সেন : 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' [১৯৭৩]।

২. ইনি এই অঞ্চলের সর্বত্র দক্ষিণ রায় বা বারা বা জোড়া বারা বা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণদ্বার ইত্যাদি নানা নামে পূজিত হন।

৩. দ্রষ্টব্য : এ. এফ. এম. আবদুল জলীল : 'সুন্দরবনের ইতিহাস' [ঢাকা ১৯৬৮] : পৃ. ২৫৭-৬০, সতীশচন্দ্র মিত্র : 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' [প্রথম খণ্ড ১৯৬৩] : পৃ. ৪৩৮-৯।

৪. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : 'বাংলার লৌকিক দেবতা' [১৯৬৬] পৃ. ৮।

৫. ঐ ঐ ঐ

৬. সুভাষ মৈত্র : 'মা বনবিবির উৎসব' : 'যুগান্তর' : ২৯ মার্চ ১৯৭৩।

৭. আবদুল জলীল : 'সুন্দরবনের ইতিহাস' [ঢাকা ১৯৬৮] পৃ. ২৬০।

৮. এ-সম্পর্কে যদিও মন্তব্য করা হয়ে থাকে : **'rites are not spontaneous reactions to dangerous situations; but rather are institutionaliezed performances.' : Thomas F. O'Dea :** ***The Sociology of Religion*** **[New Delhi 1969] p. 10**; তথাপি আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নতর মত পোষণ করতে চায়।

৯. বনবিবি এবং তাঁর পূজার একটি সংক্ষিপ্ত, বাস্তবিক, অথচ মনোরম বর্ণনা রয়েছে শ্রীপ্রলয় সেন রচিত 'কয়েদখানা' [১৩৮০] নামক উপন্যাসের ১৮২ পৃষ্ঠায়। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করলে সেটি পড়ে নিতে পারেন।

১০. দ্র. ৪নং পাদটীকা গ্রন্থ। পৃ. ৯-১০।

১১. এই উদ্ধৃতিগুলি আমরা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পঞ্চোপাসনা' [১৯৬০] গ্রন্থের ২২৬, ২২৭, ২২৯ পৃ. থেকে গ্রহণ করেছি।

১২. ঐ পৃ. ২৩২-৩।

১৩. এই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : **ক.** ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য' : ৩য় খণ্ড : ১৯৬৫ : পৃ. ৪৫০-২ ; **খ.** চিন্তাহরণ চক্রবর্তী :

'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' [১৩৭৭] : পৃ. ১১২ ; গ. ড. কামিনীকুমার রায় : 'লৌকিক শব্দকোষ' : ২য় খণ্ড ১৯৭১ : পৃ. ২১৮-৯।

১৪. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [১৯৬৪] পৃ. ৩৩৬।

১৫. ঐ : পৃ. ৭৪১।

১৬. এ. এফ. এম. আবদুল জলীল : 'সুন্দরবনের ইতিহাস' [ঢাকা ১৯৬৮] : পৃ. ৪৭। এবং সতীশচন্দ্র মিত্র : 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' [প্রথম খণ্ড : ১৯৬৩] : পৃ. ৪৭-৪৮।

১৭. ড গিরীন্দ্রনাথ দাস : 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' [১৯৭৬] : দ্বিতীয় ভাগ : পৃ. ৩৭১।

১৮. "নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণা জিলার মুসলমান সমাজে প্রায় রায়মঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। .... ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়।" দ্র. ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৭৬২ ও ৭৬৫।

১৯. শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' [১৩৮৩] গ্রন্থে মুসলমানেরা কোথাও বল-প্রয়োগ দ্বারা ধর্ম প্রচার করেননি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েও লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে : 'কোন কোন ক্ষেত্রে তুর্কীদের বল প্রয়োগের মাত্রা যে সত্যিকার নৃশংসতার পর্যায়তেও চলে যেত সে কথাও অনস্বীকার্য,...বাংলার প্রথম মুসলিমরা ছিল সংস্কৃতি বর্জিত তুর্কীরা' : পৃ. ১০২।

২০. দ্র. ১৩নং পাদটীকার গ. সংখ্যক গ্রন্থ। পৃ. ২১৭।

২১. পীরদের কর্মধারা ও জীবনাচরণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও ইতিহাস-সম্মত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস' [২য় খণ্ড : ১৩৭৩] : পৃ. ২৪৬-৭।

২২. ঐ : পৃ. ২৬।

২৩. সতীশচন্দ্র মিত্র : 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' [১ম : ১৯৬৩] পৃ. ৪২০-১।

২৪. দ্রষ্টব্য ১৯নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ১০৩।

২৫. তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ যেতে, হরিণখোলার পুল পার হওয়ার একটু পরেই বাঁ হাতে রাস্তার ধারে একটি সুন্দর বাঁধানো পীরের থান আছে। তার দুধারে সিমেণ্টের তৈরী সুন্দর দুটি বাঘের মূর্তি লক্ষণীয়।

২৬. 'পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণ রাঢ়ে, পীর ও গাজী-সাহেবের প্রতিপত্তি খুব বেশি দেখা যায়। পীর সাহেব চব্বিশ পরগণার

গ্রামদেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত লোকপ্রিয়। ····· পশ্চিম সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রাধান্য খুব বেশি। হাওড়া হুগলী বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় বিখ্যাত পীরস্থান আছে অনেক।'—বিনয় ঘোষ: 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' [১৯৫৭]: পৃ. ৬৮৬।

২৭. ঐ: পৃ. ৬৮৬-৭।

২৮. দ্রষ্টব্য 'বাঘ ও সংস্কৃতি': পৃ. ছাব্বিশ।

২৯. আমার এই প্রবন্ধের আরম্ভে আলোচনার ক্রম হিসেবে দক্ষিণ রায় দ্বিতীয়ে ছিলেন। এখানে অনিবার্য কারণে এবং আলোচনার খানিকটা সুবিধার জন্য সেই ক্রম ভেঙ্গে দক্ষিণ রায়কে তৃতীয়ে আনা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। —লেখক।

৩০. ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য: 'কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' [১৩৬৩]: পৃ. ১৭:

৩১. ঐ।

৩২. দ্রষ্টব্য: 'বাঘ ও সংস্কৃতি': পৃষ্ঠা একুশ।

৩৩. ঐ।

৩৪. ড. পঞ্চানন মণ্ডল: 'সাহিত্য প্রকাশিকা' [৪র্থ খণ্ড: ১৯৬০]: ভূমিকা: পৃ. ১৩১-২। এইসঙ্গে যোগ করা যায় গোপেন্দ্রবাবুর মন্তব্য: 'অনুমান,—বারা দক্ষিণ রায়ের আকৃতি-ভেদ হতে পারে না।'

৩৫. ঐ। পৃ. ১৩৮।

৩৬. দেবতা-মন্ত্র-কবচ ইত্যাদির জন্ম বিশ্বাস ও তারই রস-নির্যাস ভক্তিতে, যুক্তির কঠিন মনন ক্ষেত্রে নয়।

৩৭. দ্র. ৩১নং পাদটীকা: পৃ. ১৩২।

৩৮. দ্র. ৩০নং পাদটীকা: ভূমিকা: পৃ. ৪;

৩৯. দ্র. ১৪নং পাদটীকার গ্রন্থ: পৃ. ৭৫৭।

৪০. সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। ২৩নং পাদটীকার অন্তর্গত গ্রন্থের প্রারম্ভ পত্র দ্রষ্টব্য।

৪১. দ্রষ্টব্য ৭নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ২৬০।

৪২. দ্রষ্টব্য ৩৪নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ১২৯।

৪৩. এই অংশের [ক. খ. গ.] সমস্ত উদ্ধৃতিই ২৬নং পাদটীকার গ্রন্থ ৬২৯-৩২, ৬৮৬-৮, ৬৯৩ পৃষ্ঠার থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৪. এ-প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য W. Crooke প্রণীত *The Popular*

Religion and folk-lore of Northern India [1896] গ্রন্থের পৃষ্ঠা 83-122 দ্রষ্টব্য।

৪৫. দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই ধ্যান মন্ত্র দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে মেলে না—বা পৌরাণিক দেব-দেবীর মতো মূর্তি বা পূজাচারের সঙ্গে তন্নিষ্ঠ নয়। কেমন যেন জোড়া-তালি দিয়ে তৈরী।

৪৬. দ্রষ্টব্য ৩৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৩৪ [পাদটীকা ১৫]।

৪৭. দ্রষ্টব্য ২৬নং পাদটীকার গ্রন্থ। পৃ. ৬৮৭।

৪৮. দ্রষ্টব্য ৩৪নং পাদটীকাব গ্রন্থ : পৃ. ১৩০।

৪৯. 'বাঘ ও সংস্কৃতি' : পৃ. উনিশ।

৫০. দ্রষ্টব্য ২০নং পাদটীকা : পৃ. ২২০।

৫১. দ্র. ৪নং পাদটীকা : পৃ. ২১।

৫২. 'বাঘ ও সংস্কৃতি' : পৃ. ৯৬।

৫৩. দ্র. ৪নং পাদটীকা : পৃ. ২২।

৫৪. ঐ। পৃ. ২৩।

৫৫. ঐ। পৃ. ১৯৩।

৫৬. কামিনীকুমার রায় : 'লৌকিক শব্দকোষ'[১ খণ্ড : ১৯৬৮] :পৃ.২২৩।

৫৭. 'বাঘ ও সংস্কৃতি' : পৃ. উনিশ।

৫৮. ঐ : পৃ. ৯৯-১০০।

৫৯. S. K. Ray : *The Ritual Art of the Bratas of Bengal* : Calcutta, 1961 : pp. 28,30.

৬০. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত : 'চব্বিশ পরগণায় পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান' : 'স্মরণী' : চব্বিশ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৬৯ : পৃ. ২৫।

৬১. এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ড. এবনে গোলাম সামাদ রচিত 'নৃতত্ত্ব' [ঢাকা : ১৯৬৭] : পৃ. ২৯-৩৭।

৬২. আবদুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম : 'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' [ঢাকা ১৯৭৭] : পৃ. ৯।

৬৩. দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ২৩।

৬৪. দ্রষ্টব্য ৫৯ পাদটীকা গ্রন্থ।

৬৫. ৩৪নং পাদটীকার গ্রন্থ : পৃ. ১৩৭-৩৮, ১৪১।

৬৬. ঐ : পৃ. ১৩৯।

৬৭. ‘পূজা-পার্বণ’ [১৩৫৮ আশ্বিন] : পৃ. ১৩৪, ১৪২, ৮৫ ।

৬৮. দ্রষ্টবা ৫৬ নং পাদটীকার গ্রন্থ : ১ম খণ্ড [১৯৬৮] : পৃ. ৯৩-৪ ।

৬৯. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘সুন্দরবন’ : তালদি স্মারক পত্র [১৯৬৮] ।

৭০. ‘ইসলামী বাংলা সাহিত্য’ [১৯৭৩] : পৃ. ৯৫ ।

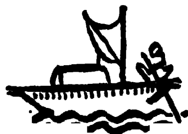
৭১. দ্রষ্টব্য ড. দুলাল চৌধুরীর প্রবন্ধ : ‘দক্ষিণ রায়’ : ‘বাঘ ও সংস্কৃতি’ : পৃ. ৯৬-৭ । সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন : ‘বাংলা দেশেও মুণ্ড পূজার প্রচলন সুদীর্ঘ কালের। দুর্গা, কালী প্রভৃতির মুণ্ডপূজা যথাক্রমে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে, কুচবিহারে ও মালদহ জেলায় পরিলক্ষিত হয়। ঘটে, পটে, মুণ্ডে পূজা মূলত প্রতীকী ভাবনার প্রকাশক।’ বর্দ্ধমান জেলার চৈত্র সংক্রান্তির দিন বোলান ভক্ত্যাদের মড়ার মুণ্ড নিয়ে নৃত্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উৎসাহী পাঠক আমারই লেখা ‘পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠার আলোকচিত্রটি দেখতে পারেন।

৭২. ‘All over the world the earth spirit is regarded as female and the presiding deities of agriculture are mainly goddesses, because the idea of fertility and reproduction is connected with women. When, therefore, a nomadic pastoral clan settled down to an agricultural life in villages, they would naturally worship the earth spirits of the village lands as Goddesses rather than as God.’ Rev. Whitehead : *The Village Gods of South India* [*1921*]

৭৩. দ্রষ্টব্য ৫৯ পাদটীকার প্রবন্ধ। পৃ. ১১৮।

৭৪. ‘বাঘ ও সংস্কৃতি’ : পৃ. উনিশ।

মুদ্রণ প্রমাদের কারণে ২২৫ পৃষ্ঠার ১ম লাইনটি
বাদ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।



পরিশিষ্ট

সংযোজন : বারা প্রসঙ্গ

আমাদের সংকলনে ড. দুলাল চৌধুরী লিখিত 'দক্ষিণরায়' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যটি সংযোজিত হবে। প্রবন্ধটি ছাপা হয়ে যাওয়ার পর ড. চৌধুরী উক্ত তথ্যটির সন্ধান পান। সেই কারণে মূল প্রবন্ধের সঙ্গে এটিকে তখন দেওয়া সম্ভব হয়নি। —সম্পাদক।

প্রাচীন 'অহম্'দের সমাজ-কাঠামো ও প্রশাসন প্রসঙ্গে গ্রীয়রসন সাহেব 'লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে [১৯৬৮ সংস্করণ] লিখেছেন, শুধু ভূমি নয়, যাঁরা ভূমি চাষ করতেন তাঁরাই ছিলেন 'অহম্' রাজার এবং রাজ্যের প্রধান সম্পদ। তখনকার অহম্ রাজার সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রটিই ছিল বাধ্যতামূলক [**bonded**] ব্যক্তিগত কর্ম ও সেবার উপর নির্ভরশীল। এমনকি ষোল বছরের উর্ধ্বের যে কোন যুবক 'পাইক'রূপে গণ্য হতেন এবং বিশাল গণবাহিনীর সদস্য-রূপে নথীভুক্ত হতেন। গণবাহিনীর কাঠামোটি ছিল এই রকম :

বার [**Bāra**]→খেল্→গট্→পাইক

এই ধরণের প্রশাসনিক কাঠামো বোধকরি প্রাচীন বাংলায় বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণবঙ্গের 'বারা' ঠাকুর সম্ভবত এই কাঠামোর একজন প্রশাসক বা অধীশ্বর। কালের স্রোতে সামন্তপ্রভু প্রজারঞ্জনের [**benevolent despot**] জন্য দৈবসত্তায় পরিণত হয়ে আজও সাধারণ কৃষিজীবী ও বনচারীদের পূজা পেয়ে আসছেন। আসামে এখনও বর ঠাকুর, বর গোঁসাই প্রভৃতি পদবী ব্যবহৃত হয়। 'বারা ঠাকুর' ভোটব্রহ্মদের সমাজ-সম্ভব দেবতা কিনা বিচার্য।

উ
প পূ
দ

ব ঙ্গো প সা গ র



দক্ষিণ রায়ের পূজা-অঞ্চল

১. কলকাতা
২. তমলুক
৩. ডায়মণ্ড হারবার
৪. আদিগঙ্গা
৫. বোড়াল
৬. বেড়াচাঁপা
৭. ভাঙড়
৮. মাতলা নদী
৯. বিদ্যাধরী নদী
১০. হুগলী নদী

এই মানচিত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরায়ের পূজা-অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

ক.

বাস্তুপূজা ও বাঘ

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

পৌষ সংক্রান্তিতে কিংবা পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের রবিবার বা বৃহস্পতিবার পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহেই বাস্তুদেবতার পূজা করা হয়।[১] বাসগৃহের দেবতাই বাস্তুদেবতা।

বাস্তুদেবতার উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়। সেখানে তাঁর নাম ছিল 'বাস্তোস্পতি' [ঋ. ৭.৫৫.৭১]। তিনি বহুরূপে বিরাজ করেন। ওষধিরূপে তিনি রোগ নাশ করেন, সখা হয়ে তিনি দুঃখ বিনাশ করে সুখদান করেন।

বেদে 'ক্ষেত্রপতি' দেবতারও উল্লেখ আছে [ঋ. ৪. ৫. ১-২]। তিনিও বাস্তু দেবতা। কিন্তু মনে হয়, তিনি ভূলোকের দেবতা নন, অন্তরীক্ষ-লোকের দেবতা। কারণ, ক্ষেত্রপতি অন্তরীক্ষ-লোক থেকে জলবর্ষণ করে ক্ষেত্র রক্ষা করেন।

পৌষমাসে যে বাস্তুদেবতার পূজা করা হয়, তিনি ভূলোকের দেবতা। বাস্তুদেবতাই এখানে প্রধান। তাঁর সঙ্গে শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল, নাগপালেরও পূজা হয়। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মাটির একটি লম্বা বেদী তৈরী করে তাতে খাগ ইকরের পাঁচটি দণ্ড বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ফুলের মালা দিয়ে খাগ দণ্ডগুলিকে সাজানো হয়। মাটির বেদীর উপর চালের গুঁড়ো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পাঁচটি দণ্ড পঞ্চদেবতার প্রতীক।

বাস্তুদেবতা সর্ববিঘ্ন হর। বাস্তুতে সাপের ভয়, বাঘের ভয়, নানা বিঘ্নকর উপদেবতার ভয় থাকতে পারে। শঙ্খপাল ব্যাঘ্রবাহন, তিনি সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রের দেবতা, নাগপাল নাগের দেবতা ; বঙ্কপাল লোকবিঘ্ন নাশক ; ক্ষেত্রপাল ভয়ঙ্কর, তিনি পিঙ্গলকেশ ও উগ্রদ্রংষ্ট্র ; আর বাস্তুপাল স্বয়ং সৌমমূর্তি সর্বলোকনাথ, তাঁর হস্তে বরাভয়। প্রথমে চার দেবতার ধ্যান-পূজা করে সর্বশেষে বাস্তুদেবতার ধ্যান-পূজা করা হয় এবং সেই সঙ্গে আবরণ দেবতারূপে গ্রামদেবতার পূজা হয়। বাস্তুপূজার প্রধান বলি বা উপায়ন পায়স। পাঁচটি কলার পাতায় খইসহ পায়স থাকে। সেগুলি পঞ্চবাস্তুদেবতাকে নিবেদন করা হয়। পূজা শেষে

প্রত্যেকটি পাত্র থেকে খই পায়স নিয়ে তৈরী একটি পিণ্ড মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়। প্রসাদ বাইরে থেকেই সবাইকে বিতরণ করা হয়।

বাস্তুপূজার সঙ্গে নাগ-বাঘ-বিঘ্নকর জীব-জন্তুর যোগ আছে, বিশেষ করে বাঘের সঙ্গে। এই পূজায় প্রথমেই শঙ্খপালের ধ্যান-পূজা করা হয়। এই এই শঙ্খপাল ব্যাঘ্রবাহন। তাঁর ধ্যান :

'শঙ্খপালং মহাদেবং দ্বিভুজং ব্যাঘ্রবাহনম্।
শূলহস্তং পিঙ্গলাক্ষং পরমং পুরুষং ভজে॥'

শুধু তাই নয়, দেখা গেছে, আমাদের গ্রামের[২] কয়েকটি বাড়ীতে বাস্তুপূজায়, মাটির বেদীটি বাঘের আকারেই তৈরী করা হতো এবং তার ওপর চালের গুঁড়ো ও হলুদ গুঁড়ো এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, তাতে জীবন্ত বাঘের মূর্তিই প্রকট হতো। সেই বেদীর উপর খাগ বা ইকড়ের দণ্ডের বদলে বিন্নী-গাছেব ছোবা দিয়ে মনুষ্যাকৃতি মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হতো। যেন সত্যি ব্যাঘ্র-বাহন কোন দেবতা। কোন কোন বাড়ীতে পায়স বলি তো নিবেদন করা হতোই, উপরন্তু ভেড়াও বলি দেওয়া হতো।

'বাস্তোম্পতি' দেবতার উল্লেখ বৈদিক সংহিতায় থাকলেও মনে হয়, ইনি খুব পুরাতন কালের গ্রাম-দেবতা। বাঘ-নাগ-সঙ্কুল অনূপ বঙ্গভূমিতে একদিন এই দেবতা বিঘ্নহর দেবতারূপেই লোকসমাজে পূজিত হতেন। ব্যাঘ্র-ভীতির সঙ্গে এই দেবতার যোগও তাঁর লৌকিক রূপটিকেই চিনিয়ে দেয়।

---

১. ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গদেশ বিভাগের দরুণ শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার নিজের সাতপুরুষের বাস্তু ত্যাগ করে ভারত-ভূখণ্ডের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেও তাঁর বর্তমান বাস্তু কোলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়াতেও প্রতিবছরেই যথানিয়মে বাস্তুপূজা হয়ে থাকে। গত বৎসরেও [১৩৮৬] ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার [২৭. ১২. ৭৯] অধ্যাপক চক্রবর্তীর বাস্তুর বার উঠানে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। —সম্পাদক।

২ পুটরিয়া, থানা কালিহাটি, টাঙ্গাইল জেলা [অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র]।



ব্রত ঃ ব্যাঘ্রবাহিনী-বিপদনাশিনী

কথক ঃ শ্রীমতী সরলাবালা চক্রবর্তী

পূর্বতন পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রীহট্ট জেলায় ব্যাঘ্রবাহিনী চতুর্ভুজ দেবী বিপদ-নাশিনীর ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। যাঁরা দেশ বিভাগের পর এ-পার বাংলায় চলে এসেছেন তাঁরা এখনও ব্রতটি পালন করে থাকেন। এই ব্রতের কথাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। আমরা সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করলাম: কার্তিক মাসে পালনীয় এই কথাটিতে বলা হয় যে; এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অতি কষ্টে ভিক্ষা করে কালাতিপাত করেন। তাঁরা দরিদ্র হলেও নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে জীবনযাপন করেন দেখে দেবী বিপদনাশিনী তাঁদের দুঃখ দূর করতে মনস্থ করেন। দেবী নানাভাবে ছলনা করে ঐ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর নিষ্ঠা ও ভক্তি পরীক্ষা করেন এবং শেষে তাঁদের ধর্মপ্রাণতায় তুষ্ট হয়ে সম্পদ দান করেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দুঃখ দূরে যায়। দেবী যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণীকে ব্রতের নিয়ম শিক্ষাদান প্রসঙ্গে জানালেন: আম্রপল্লব সহযোগে ঘট-স্থাপন করে; সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা এঁকে পান-সুপারী, তেল সিঁদুর দিয়ে পূজা করতে হয়। যে কোন বিজোড় সংখ্যার পান সংগ্রহ করে দেবীর ব্রত-পূজা করতে, ব্রতকথা বলার পর উলুধ্বনি দিতে হয়। এরপর প্রথম পানখানায় সিঁদুরের টিপ দিয়ে নৈবেদ্যের সব রকম উপকরণ থেকে একটু একটু করে নিয়ে ঘটের মধ্যে দেবীর উদ্দেশ্যে রেখে দিতে হয়। এবং সব শেষে কাক সায়াহ্নে তার বাসায় ফেরার আগে ঐ ঘটখানি জলাশয়ে বিসর্জন দিতে হয়।

ভিক্ষাজীবী ঐ ব্রাহ্মণ দেবীর কৃপায় সম্পদ লাভ করলেও তাঁর ভিক্ষাব্রত ত্যাগ করেন না। এই ভাবে ভিক্ষা করে একদিন বাড়ী ফেরার পথে এক অরণ্য পার হওয়ার সময় এক ভীষণাকৃতি বাঘ তাঁকে আহারের জন্যে পথ আগলে দাঁড়ায়। বিপদে পড়ে ব্রাহ্মণ দেবী বিপদনাশিনীর স্মরণ করলে বাঘ শান্ত হয়ে পড়ে। এমন হওয়ার কারণ বাঘটি ঐ ব্রাহ্মণের কাছে জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ তাকে দেবী বিপদনাশিনীর মহিমা ও তাঁর কৃপার কথা জানান। বাঘ তার হারানো বাঘিনী ও শাবকদের খুঁজে পাওয়ার শর্তে দেবী বিপদনাশিনীর

ব্রত পালন করতে ও ব্রাহ্মণকে তখনকার মতো ছেড়ে দিতে রাজী হয়। এরপর বাঘটি দেবীর ব্রত উদযাপন করে তার ঈপ্সিত ফললাভ করে। এবং দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞ বাঘ ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, সে দেবীর বাহন হতে চায়। দেবী বাঘকে তাঁর বাহন করে নেন এবং সেই থেকে দেবী বিপদনাশিনী ব্যাঘ্রবাহিনী।

এই ব্রতপালনের ফল : অগতির গতি হয়, ব্রতীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়, হৃতবস্তু পুনরুদ্ধার হয়, দরিদ্র ধন লাভ করে।[১]

---

১. অধুনা জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীমতী সরলবালা চক্রবর্তী-র কাছে থেকে আমরা কথাটিকে সংগ্রহ করেছি।



গ.

বাঘাইর বয়াত

সংকলক : যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

"ময়মনসিংহের নানা স্থানে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে একটি উৎসব প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে দল বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 'বাঘাইর বয়াত' নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করে। একজন প্রথমে কবিতা বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে একস্বরে তাহা আবৃত্তি করে। কয়েকদিন এইরূপ ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ ক্রয় করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি করিয়া একখানা কুলা তৈয়ার করা হয়। তাহাতে পিঠা, মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসা হয়। তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করে।

'বাঘাইর' অর্থ সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রের দেবতা। পূর্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাঘ্র বাস করিত। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্র-ভীতি হইতেই এই উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে। গো-মেষাদির রক্ষার্থে ব্যাঘ্রের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে বনের ধারে এইরূপে সিন্নি বা বলি দেওয়া হয়।

নিম্নে উক্ত উৎসবের সময় যে ছড়া-আবৃত্তি করিয়া বালকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।"

১.

আইলামার, আইলামার,
আইলামার ভাই অরণে, লক্ষ্মীদেবীর চরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলাইল বর, চাইল কড়াই বাইর কর।

চাইল আনিয়া দিল কড়ি, তারে করব লড়ি দড়ি,
লড়ি দড়ি শ্যামার সোণার মুটুক বাণীর,
সোনার মুটুক রূপার খিলা,
ঐ ঘরখান দেখতে ভালা।
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটুনী,
মাইয়া বড় টিটুনী।
কেনগো মা বিরস বদন, আমায় দিবি কত ধন ?
আমিত মাগিয়া খাই, 'বাঘাইর বয়াত' গাই।
বাঘাই গেছে নাগাইপুর, আমার বাড়ী মথুরাপুর,
আইতে যাইতে অনেক দূর মধ্যে একটা সুমুদ্দুর।

২.

আইলামরে ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়া
আত্তির স্থুর লড় বড় করে, গাছ থাকিয়া বড়ই পরে।
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে ঝড় ঝড়ি বার টেকা পরে।
একটা টেকা পাইলাম মরে, বানিয়াবাড়ী গেলাম রে।
বানিয়া-গরে উচাটুই, ধান বাইর কর কুলা দুই,
কুলাতত্ ধান কাঠাত গেল, ফাল দিয়া বাড়ী ঘর গেল
আলা বুড়ী শিতলি ! কুলার পিড়া কি করিলি,
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে, শিতলীরে বাঘে খাইছে।

৩.

আলুর পাতা ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই,
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুলমানিকের ভাই।
কুলমানিকের ভাই নারে উড়িল কইতর,
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর।
সোনা আর পিত্তল দিয়া বান্দাইলাম নাও,
সেই নাও চড়িয়া আইরে দুর্গার মাও।
দুর্গার মাও নারে হাঁসিতে হাঁসিতে।
কালা কালী দুইডা ছেঁড়ী নাচিতে নাচিতে।

আয়রে বইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে গি-ই-য়া ছিরফল খাই।
ছিরফল খাইতে খাইতে হাত ফুট্‌লাম কাঁটা,
কাঁটা না কাঁটা না আইড়ু হইতে রইলাম আমি সতিনের খোঁটা।[১]

---

১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৯বর্ষ [১৩১৯ বঙ্গাব্দ] ৩য় সংখ্যার ১৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মন্তব্যসহ এই সংকলনটি প্রকাশ করেন। ভৌমিক মহাশয়ের সংকলনে মোট **ছয়টি** গান ছিল। আমরা তার মধ্যে থেকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে মাত্র তিনটিকে বেছে নিয়েছি। এই বয়াতগুলি সম্পর্কে ভৌমিক মহাশয়ের মন্তব্য অবিকৃত ও অখণ্ডিত আছে।—সম্পাদক।



ঘ.

সিরণি : বাঘের

"ময়মনসিংহের সর্বত্র এক সময় বাঘের সিন্নী বা ব্রত প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ইহা করিতেন। ভাওয়াল পরগণায় গারো পাহাড়ের অতি সন্নিকটে এখনও কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে এই সিন্নী দেখা যায়।

"বৎসরের যে কোন সময়ে বাঘের সিন্নী দেওয়া যায়। এই সিন্নী দিলে বাঘের হাতে মানুষ-গোরুর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে না।

"**নিয়ম :** কতকগুলি বালক ছেঁড়া কাথায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া হাঁটু গাড়িয়া বিন্না গাছের [কাশ জাতীয় ঘাস] তলায় যাইযা বসিয়া থাকে এবং বাঘের মতন গর্জন করে। হলুদ এবং কালির সাহায্যে কাঁথাগুলিকে বাঘের চামড়ার অনুরূপ রঙ করা হয়। সিন্নীকারিণীরা ১৩টি 'চিত-পিঠা' [চাউলের গুঁড়ি গুলিয়া বিনা তৈলের সাহায্যে রুটির ন্যায় গোল করিয়া যে পিঠা করা হয়], দুধ, কলা ও গুড় কুলায় করিয়া সেই বিন্নাতলে দিয়া আসেন এবং সেলাম করেন। ব্যাঘ্রবেশী বালকগণ অমনি লম্ফ দিয়া আসিয়া ঐ সমস্ত কাড়াকাড়ি করিয়া খায় এবং কৃত্রিম ভয় দেখায় [ময়মনসিংহে দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রচলিত নাই। সাধারণ লোকে তাঁহার নাম পর্যন্ত জানে না। 'গাজী সাহেব' এবং 'শালপীন' বাঘের পীর বলিয়া পূর্ব-ময়মনসিংহের সর্বত্র পরিচিত। প্রবাদ আছে, গাজী কিংবা শালপীনের দোহাই দিলে যত বড় বাঘই হউক না কেন, লেজ গুটাইয়া, মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই গাজী, শাহ-সুলতান ও শালপীনের নামে চাউল-পয়সা, দুধ-কলা দিয়া থাকেন]।"[১]

---

১ 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় এই সিরণি-কথাটি সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেন ড. শ্রীকামিনীকুমার রায়। পৃষ্ঠা ২১৮-৯। এটি সেখান থেকে সংগৃহীত। —সম্পাদক।



ঙ.

সুন্দরবনের হিসাব : বাঘ

"নিজস্ব সংবাদদাতা : ক্যানিং টাউন : কোন কোন সংবাদপত্রে [সত্যযুগ নহে] প্রকাশিত হয়েছে, সুন্দরবনে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ২২৫। কিন্তু ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেকটর শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী[১] এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২২৫ নয়, ২০৫টি। পুরুষ বাঘ ৭৭টি, স্ত্রী বাঘ ৯২টি ও শিশু বাঘের [১ বছরের ছোট] সংখ্যা ৩৬টি।

জঙ্গলের অবস্থান হিসাবে সুন্দরবন জঙ্গলকে ১৫টি ব্লকে ভাগ করা আছে। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসের গণনা অনুযায়ী ব্লক ভিত্তিক বাঘের সংখ্যা হলো :

	ব্লকের নাম	পুং বাঘ	স্ত্রী বাঘ	শিশু বাঘ	মোট
১.	পীরখালি	৮	১০	১	১৯
২.	পঞ্চমুখী	৪	৫	৫	১৪
৩.	নেতিধোপানী	৪	৫	৩	১২
৪.	ঝিল্লা	৩	৫	৮	১৬
৫.	আর্বশী	৬	৯	০	১৫
৬.	খাটুয়াঝুড়ি	৪	৫	২	১১
৭.	চাঁদখালি	৫	৫	২	১২
৮.	চামটা	৮	৮	০	১৬
৯.	হাঁড়িভাঙ্গা	৪	৪	০	৮
১০.	মাতলা	৪	৫	২	১১
১১.	ছোটহাড়দি	৪	৪	৩	১১
১২.	গোসাবা	৫	৭	১	১৩
১৩.	মায়াদ্বীপ	৬	৭	৩	১৬
১৪.	বাঘমারা	৯	১০	৩	২২
১৫.	গোনা	৩	৩	৩	৯
		৭৭	৯২	৩৬	২০৫

১৯৭৬ সালের ফেবরুয়ারি-মার্চ মাসের গণনা অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ছিল ১৮১টি। শ্রীচক্রবর্তী বললেন, বাঘ গণনার ব্যাপারে ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রায় ১৫০ জন কর্মচারী সম্পৃক্ত ছিলেন"।[২]

---

১. শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী বর্তমানে এই পদ থেকে বদলী হয়ে বীরভূম জেলার বন-বিভাগের অধিকর্তা পদে আসীন আছেন। এই সংকলনে তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।—সম্পাদক

২. এই হিসাবটি কোলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'সত্যযুগ'-এর ২৭ জুন ১৯৭৯ বুধবার প্রকাশিত হয়।



৮.

বাংলার পুরাতত্ত্ব ও বাঘ

শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে কিছু প্রত্ন-নজীর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে সমকালীন বাঙালীর ব্যাঘ্র-পরিচিতি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত প্রত্ন-নজীরগুলির অধিকাংশই 'হঠাৎ করে পাওয়া' বা 'chance finds'। এ-গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: ক. পোড়ামাটির মূর্তিপুতুল বা ফলকে ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত মোটিফ। খ. ঐতিহাসিক সময়কালে বাংলায় পাওয়া বিভিন্ন শাসকের তাম্রপট্টলেখতে স্থানের নামে বাঘ-শব্দের উল্লেখ। এদের থেকে প্রাচীন বাংলার ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অঞ্চল, লৌকিক ধর্ম-বিশ্বাসে ব্যাঘ্রের স্থান, ব্যাঘ্রের গুণগত পরিচয়ের বিষয় জানতে পারি। এ-গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

১. চব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রধান প্রত্নস্থল বারাসত মহকুমার চন্দ্রকেতু গড়ের লাগোয়া সিংহের আটি গ্রামে প্রাপ্ত ব্যাঘ্রের মোটিফযুক্ত একটি পোড়া-মাটির খেলনা গাড়ী; উচ্চতায় প্রায় ৬ ইঞ্চি, রঙ্ গাঢ় ধূসর। পুরাবস্তুটি অভঙ্গ ও বিচিত্র অলংকারযুক্ত। বাঘটির স্ফীত নাসিকার নীচে তীক্ষ্ণ রেখায় গোঁফের চিহ্ন ও সর্বাঙ্গে ডোরাকাটা দাগ। শিল্প-শৈলীর বিচারে এটি শুঙ্গ-যুগের [খ্রীঃ পূঃ ১।২ শতক]।

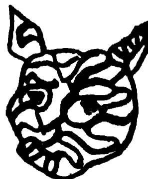
২. চন্দ্রকেতুগড় বা বেড়াচাঁপা থেকে পাওয়া আর একটি পোড়ামাটির খেলনা গাড়িও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এটি প্রায় ৮ ইঞ্চি উঁচু; রঙ উজ্জ্বল লাল। এর মোটিফটি খুবই বিচিত্র: সম্মুখে দৃষ্টিবদ্ধ একটি দণ্ডায়মান ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে এক দম্পতি উপবিষ্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, মূর্তি দুটি কোন দেবদেবীর। কারণ, তাদের পিছনে মন্দিরের অনুকৃতি আছে। এটিও ঐ সময়কালেরই। দম্পতির মূর্তিদ্বয় যদি দেবদেবীর বলেই অনুমিত হয়, তবে দু-হাজার বছর আগেও ব্যাঘ্রের সঙ্গে পূর্ব-ভারতের উচ্চকোটির বা লৌকিক ধর্মচিন্তার এই যোগাযোগের কথা কিছু নতুন ভাবনার অবতারণা করবে নিশ্চয়ই। এ-ধরণের দুটি পুরাবস্তুর সন্ধান চন্দ্রকেতুর গড় থেকে পাওয়া গেছে। একটি রয়েছে বেড়াচাঁপার শ্রীদিলীপ-কুমার মৈত্রের ব্যক্তিগত সংরক্ষণে। অপরটি আছে আশুতোষ সংগ্রহশালায়।

৩. সম্প্রতি হরিনারায়ণপুর [২৪ পরগণা] থেকে একটি বিচিত্র টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলকের আলেখ্যের সঙ্গে হিতোপদেশ

কিংবা ঈশপের গল্পের বিশেষ একটি কাহিনীর যেন গভীর যোগ রয়েছে। চিত্রটি হল, একটি জরাজীর্ণ ব্যাঘ্র প্রলম্বিত দেহে ভূমিতে উপবিষ্ট। তার সম্মুখে মনুষ্যমূর্তি। ব্যাঘ্রের সম্মুখের পদযুগলে ধৃত একটি বলয়াকৃতি বস্তু। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থলেই জাতক-কাহিনীর নানা আলেখ্য-উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি আনুমানিক খ্রীঃ ২য়-৩য় শতকের ; ফলকটি রয়েছে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

৪. কুমিল্লা জেলার ময়নামতী এলাকার শালবন-বিহার ঢিপি থেকে আবিষ্কৃত ফলক গুলিতে জীবজন্তুর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এসব মূর্তির একটি খুব সম্ভবত] ব্যাঘ্রের। শালবন বিহারের সময়কাল খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী।

পোড়ামাটির প্রাচীন মূর্তি পুতুল ও ফলক ছাড়া ব্যাঘ্র-সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন লেখতে। এসবের মধ্যে উল্লেখ্য হলো : ক. ঘুগরাহাটিতে প্রাপ্ত রাজা সমাচারদেবের ফলকে ব্যাঘ্র সমন্বিত একটি স্থানবাচক শব্দের উল্লেখ। লেখটির বিবরণ অনুযায়ী সমাচারদেবের রাজত্ব-কালের চতুর্দশ বৎসরে রাজা, সুপ্রতীকস্বামীন্ নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ব্যাঘ্র-চোরাক স্থানে ভূমি দান করেছেন। এই তাম্রপট্ট লেখটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রয়েছে। খ. রাজা ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে [দ্র. Epigraphika Indica Vol. IV. পৃঃ 243-46], দেবপালের নালন্দা তাম্রপট্ট লেখতে [দ্র. ঐ Vol. XVII. পৃঃ 310], লক্ষণসেনের অনুলিয়া তাম্রলিপিতে 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' ও 'ব্যাঘ্রতটি'-এর উল্লেখ আছে। এসব তাম্রপট্টলেখর বিবরণ-অনুযায়ী 'ব্যাঘ্রতটি' ছিল 'মহান্ত প্রকাশ বিষয়'-এর সংলগ্ন। দেবপালের নালন্দা তাম্রলিপির ৫১-সংখ্যক পংক্তিতে তাঁকে 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলস্থ অধিপতি'-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাবিদ্‌গণের মতে, খ্রীঃ অষ্টম থেকে দশম শতক পর্যন্ত সাগর-কিনারার বাংলার বিস্তৃত অরণ্যাবৃত অঞ্চলই 'ব্যাঘ্রতটি' নামে পরিচিত ছিল। পাল ও সেন আমলে এই বিস্তৃত অঞ্চলটি প্রশাসন-বিভাগ, অর্থাৎ মণ্ডলের, মর্যাদা লাভ করে। তাঁদের মতে, এই অঞ্চল তখন ব্যাঘ্রের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল বলেই এই নামকরণ॥



নির্বাচিত প্রমাণপঞ্জী

গ্রন্থ ঃ

উইলিয়ম, এম. : স্যান্সক্রট-ইংলিশ ডিক্সনারী

এলউইন, ভি. : দি বৈগা ; ফোকটেলস অব মহাকোশল

কনোয়ে, এম. ডি. : ডেমনোলজি অ্যাণ্ড ডেমনলোর [১-২]

কির্লট, জে. ই. : এ ডিক্সনারী অব সিম্বলস

কিপলিং, জে. এল. : বীস্ট অ্যাণ্ড ম্যান ইন ইণ্ডিয়া

ক্যাম্বেল, এ. : সান্থাল টেলস

ক্লোস্টন, এম. : পপুলার টেলস অ্যাণ্ড ফিকশ্চন

ক্রুক, ডব্লু. : দি পপুলার রিলিজিওন অ্যাণ্ড ফোক-লোর অব নর্দার্ন ইণ্ডিয়া [১-২]

খান চৌধুরী, আমানত উল্লাহ : কোচবিহারের ইতিহাস

গুবার্নেতিস, এঞ্জেলো ড্য : জুলজিক্যাল মিথোলজি

গোল্ডস্যাথেড, ডব্লু. : এ মুসলমানী বেঙ্গলী-ইংলিশ ডিক্সনারী

ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত : গৌড়ের ইতিহাস [২]

চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর : দি ইভোলিউশ্চন অব থিঈস্টিক সেক্টস ইন এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : কিরাতজনকৃতি

চট্টোপাধ্যায়, সাধন : গহিন গাঙ

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : লোকায়ত দর্শন

টমাস, এন. ডব্লু. : অ্যানিম্যাল সুপারস্টিশ্চনস অ্যাণ্ড টোটেমিজম্

টড, জেমস : অ্যানালস অ্যাণ্ড অ্যাণ্টিকুইটিজ অব রাজস্থান [১-২]

টনী, সি. এইচ. : কথাসরিৎসাগর

টাইলর, ই. বি. : প্রিমিটিভ কালচার

টেম্পল, আর. সি. : ওয়াইড অ্যাওয়েক স্টোরিজ

ট্রাম্বুল, এইচ. সি. : ব্লাড কভেনাণ্ট

ডালটন, ই. টি. : ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব ইণ্ডিয়া
দত্ত, কালিদাস : প্রিমিটিভ অ্যান্টিকুইটিজ অব সুন্দরবন
দাস, কৃষ্ণরাম : রায়মঙ্গল
দে, লালবিহারী : ফোকটেলস অব বেঙ্গল
ফরসাইথ, জে. : হাইল্যাণ্ডস্ অব সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া
ফেরেরা, জে. ভি. : টোটেমিজম ইন ইণ্ডিয়া
ফ্রেজার, জে. জি. : গোল্ডেন বাউ [২]
বয়েডকার, এল. : ইণ্ডিয়ান অ্যানিম্যাল টেলস
বসু, গোপেন্দ্রনাথ : বাংলার লৌকিক দেবতা
বের্গেন, এফ. ডি. : অ্যানিম্যাল অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্ট লোর
বিদ্যানিধি রায়, যোগেশচন্দ্র : পূজা-পার্বণ
ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; বাংলার লোকসাহিত্য [১-৬]
ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ : কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল
মণ্ডল, পঞ্চানন : সাহিত্য প্রকাশিকা [৪]
মজুমদার, দিব্যজ্যোতি : লোকসমাজ ও পশুকথা
মজুমদার, আর. সি. : হিস্ট্রি অব বেঙ্গল [১]
মিত্র, সতীশচন্দ্র : যশোহর খুলনার ইতিহাস [১-২]
মিত্র-মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন : ঠাকুমার ঝুলি ; ঠাকুরদাদার ঝুলি
মিত্র, অশোক : পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা [১-৪]
মুনশী, বৈয়ুদ্দীন : বনবিবির জহুরানামা
মোডে হাইন্‌শ : ডাস ফ্রুহে ইণ্ডিয়েন
ম্যাকে, ই. : ফারদার এক্সক্যাভেশ্যনস অ্যাট মহেঞ্জোদড়ো
ম্যাকডোনাল, এম. : ভেদিক মিথোলজি
ম্যালি, এল. : পপুলার হিন্দুইজম
র‍্যোনী, এইচ. বি. [শশীচন্দ্র দত্ত] : ওয়াইল্ড ট্রাইবস্ অব ইণ্ডিয়া
রাইট, ড্যানিয়েল : হিসট্রি অব নেপাল
রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর : টুনটুনির বই
রায়, গিরিজাশঙ্কর : উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের পূজাপার্বণ

রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস [১-২]
রায়, কামিনীকুমার : লৌকিক শব্দকোষ [১-২]
রায়, এস. কে. : ইণ্ডাস স্ক্রিপ্‌ট
রেহমানী, এস. কে. : হায়াতে একরাম
লায়াল, এ.[সম্পা.] : এশিয়াটিক স্টাডিজ
লীচ, মারিয়া : স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারী অব ফোকলোর মিথোলজি অ্যাণ্ড লিজেণ্ড [১-২]
শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ : বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান [১-২]
শঙ্করানন্দ, স্বামী : বঙ্গে মহেঞ্জোডারো সভ্যতার বিস্তার
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব
সেন, সুকুমার : ইসলামী বাংলা সাহিত্য
সেন, প্রভাসচন্দ্র : বগুড়ার ইতিহাস
সুর, সুজিত : বনবিবির উৎস সন্ধানে
সান্যাল, চারুচন্দ্র : দি মেচেজ অ্যাণ্ড দি টোটোজ ; দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল
সোয়েঙ্গন, জে. ই. : এ হিস্ট্রি অব ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন
স্কট, ডব্লু. : লেটারস অন ডেমনোলজি অ্যাণ্ড উইচক্র্যাফট
স্পেনসার, ডব্লু. : প্রিনসিপ্‌লস অব অব সোসিওলজি
হেমেল, এফ. : হিউম্যান অ্যানিম্যালস
হোয়াইটহেড, এইচ. : দি ভিলেজ গডস অব সাউথ ইণ্ডিয়া
হপকিন্স্‌, এ. : দি রিলিজিওন অব ইণ্ডিয়া
হাণ্টার, ডব্লু. ডব্লু. : দি স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গল [১-৭]

প্রবন্ধ :

চৌধুরী, পি. ডি. : ইমেজ অব গডেস অন এ টাইগার ['আর্কিওলজি ইন আসাম']
দত্ত, কালিদাস : রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ['সাহিত্য ও সংস্কৃতি', ৪র্থ, ১৯৭৪] ;

দত্ত, কালিদাস : বড় খাঁ গাজির গান ['ভারতীয় লোকযান', ৩।১, ১৯৬৩]

দত্ত, গুরুসদয় : দি টাইগার গড ইন বেঙ্গল আর্ট ['মডার্ন রিভিউ', ৪৫শ, ১৯৩২]

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : চণ্ডীদেবীর স্বরূপ ['ভারতবর্ষ', আশ্বিন, ১৩৬৬]

দ্বিজ ভৃগুরাম : দক্ষিণরায়ের পালাগান ['সমতট', ১৯শ, ১৯৭৫]

পৃৎসীলুজ্‌কি, জে. : তোতেমাইজ এৎ ভেজেতালিজ্‌ম্যা দাঁস ল্য আঁ্যাদ ['রেভু দ্য ল' ইস্তোয়ার দে রিলিজিওঁজ', ৫৬শ, ১৯২৭]

বুরাদকার, এম. পি. : টোটেমিজম অ্যামং দি গোণ্ড্‌স ['ম্যান ইন ইণ্ডিয়া', ১০ম, ১৯৪৩]

বটব্যাল, বিমলাচরণ : দি অরিজিন অব দক্ষিণরায় ইজ অব্‌সকিওর ['জুর্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি', ১ম, ১৯৩৫]

ভেংকটস্বামী, এম. এন. : পুলি রাজা অর দি টাইগার প্রিন্স— এ হিন্দু ফোকটেল ফ্রম সাদার্ন ইণ্ডিয়া ['ফোকলোর', ১৩শ, ১৯০২]

মিত্র, শরৎচন্দ্র : দি কাল্ট অব দক্ষিণরায় ইন সাদার্ন বেঙ্গল ['হিন্দুস্থান রিভিউ', জানুয়ারী, ১৯২৩]; অন এ মুসলিম লিজেণ্ড ['জুর্নাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটারস', ১০ম]

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল ['সাহিত্য', ১৩০০]

সংকলন : শ্রীমতী রীতা বসু

